বুদ্ধদেব গুহ

পামরি

পামরি

পামরি

বুদ্ধদেব গুহ

সাহিত্যম্ ॥ কলকাতা
www.nirmalsahityam.com

রীণা ও প্রদীপ সাহাকে

লেখকের কথা

উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে নর্দার্ন কোলফিল্ডস-এর কয়লা খাদানের পটভূমিতে লেখা এই উপন্যাস। সেখানে কোল ইন্ডিয়া যে বিশাল কর্মকাণ্ড করছেন সে সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের ধারণা নেইই বলতে গেলে।

অতি রায়, তার বন্ধু অনিশ এবং বহুবছর আগে অনিশের হাজারীবাগের মামাবাড়ির প্রতিবেশী বিজিতেন মামার মেয়ে পামরি এর মূল চরিত্র। সিংগ্রাউলিরই একটি অল্পবয়সী সপ্রতিভ এবং নিমকিন মেয়ে ঝিমলিও একটি মুখ্য চরিত্র।

OPEN CAST খাদানের আরও অনেক চরিত্রর সমাবেশ ঘটেছে এই উপন্যাসে। পাঠক পাঠিকারা এই অঞ্চল সম্বন্ধে এবং ওখানের নানা বাসিন্দা সম্বন্ধে অবহিত হবেন। নর্দার্ন কোলফিল্ডস এর বার্ষিক নেট প্রফিট হাজার কোটি টাকারও বেশি। যাঁরা এই পরিমাণ জাতীয় আয় উৎপন্ন করেন তাঁদের সম্বন্ধে অনবহিত মানুষকে অবহিত করাও এই উপন্যাস লেখার পেছনের একটি মূল কারণ।

বুদ্ধদেব গুহ

অনিশদের ভবানীপুরের বাড়িতে বসে, অতি বলল, ওর কলেজের বন্ধু অনিশকে, এবারে সিরিয়াসলি বল, সিঙ্গরাউলিতে তুই কবে আসছিস?

আরে ছুটি তো জমে আছে কতই। আই হ্যাড বীন টয়িং উইথ দি আইডিয়া সিন্স সিক্স ইয়ারস্। কিন্তু আমার হতভাগা বস ছুটি দিলে তো। জানে, ব্যাচেলর, ঝুট-ঝামেলা নেই, তাই আমারই ওপরে যত অত্যাচার। এবারে না দিলে চাকরিই ছেড়ে দেব। তোদের কয়লা খাদানে কুলির কাজ তো দিতে পারবি একটা, না কি? যাঃ, শালা! বাকি জীবনটা তোদের ওই ঝিঙ্গরাউলি না ছিঙ্গরাউলিতে কুলি হয়েই কাটিয়ে দেব।

ঝিঙ্গরাউলিও নয়, ছিঙ্গরাউলিও নয়, সিঙ্গরাউলি। এস. আই. এন. আর. এ. এল. ইউ. এল. আই. বুঝলি। অশিক্ষিতর মতো কথা বলিস না। ভারতবর্ষের কয়লাখনির সবচেয়ে বড় ঘাঁটি বিলাসপুরে, সাউথ ইস্টার্ন কোলফিল্ডস। ভারতের সবচেয়ে বড় তামার খনি যেমন মালাঞ্জখণ্ড। দুইই মধ্যপ্রদেশে। আর তারই পরে ইম্পর্ট্যান্স-ওয়াইজ আমাদের সিঙ্গরাউলির নর্দার্ন কোলফিল্ডস্। তবে প্রফিটের ব্যাপারে পাবলিক সেক্টর কোম্পানিদের মধ্যে নর্দার্ন কোলফিল্ডস আর ও. এন. জি. সিই সবচেয়ে উপরে।

দাঁড়া। দাঁড়া, ক্যালেন্ডারটা দেখি।

অনিশ দেওয়ালের বারো মাসের ক্যালেন্ডারটার দিকে চেয়ে বলল, বর্ষাকালে যাওয়া ঠিক হবে কি?

বললামই তো। গরমের এই দু'টো মাস ছাড়া যে-কোনও সময়েই আসতে পারিস।

তোর পক্ষে অসময় হবে না তো?

বললাম তো। তুই যখনই আসবি তখনই আমার সুসময়।

তবে নে। তারিখ টুকে নে। জুলাইয়ের আট তারিখে রওয়ানা হয়ে ন' তারিখ রবিবারে পৌঁছব।

তারপরে বলল, ওই একটাই ট্রেন?

হ্যাঁ। শক্তিপুঞ্জ এক্সপ্রেস। সবচেয়ে কনভিনিয়েন্ট, যদি সোজা রেনকুটে এসেই নামিস। বেনারস হয়েও আসতে পারিস। ওদিক দিয়ে এলে তো ট্রেনের লেখাজোখা নেই। কিন্তু বেনারসে নামার পরে অনেকখানি পথ বেয়ে সিঙ্গরাউলিতে আসতে হবে, রবার্টসগঞ্জ হয়ে। অবশ্য আমার কোনও অসুবিধে নেই। তোর জন্যে গাড়ির বন্দোবস্ত করা যাবে। আমাকেও যেতে হবে বেনারসে তোকে রিসিভ করতে। তুই তো শাহরুখ খান নোস যে, তোকে সকলেই চিনবে!

আর রেনুকুটে তুই আসবি না? স্টেশনে?

নিশ্চয়ই। বাই অল মীনস। সেখানেও আসতে হবে বৈকি। আমি গাড়ি নিয়ে না গেলে স্টেশন থেকে আসবি কী করে। সেখান থেকেও তো বেশ কয়েকমাইল পথ। যদিও বেনারসের থেকে যতখানি, ততখানি নয়।

তুই কি গাড়ি কিনেছিস নাকি?

ভ্যাট। আরে কোম্পানির গাড়ি নিয়ে যাব। কী ভাবিস তুই আমাকে বল তো?

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, আমার আছে একটা গাড়ি। তবে দু'চাকার। কাওয়াসাকি। ইচ্ছে আছে, একটা মারুতি এইট হান্ড্রেড অথবা গাঁট্টা-গোঁট্টা বেঁটে-নাটা ওয়াগন-আর কিনব। সেকেন্ড হ্যান্ড। অবশ্য যদি কখনও বিয়ে-টিয়ে করি। আমার একার জন্যে এই ঠিক আছে। চলতা হ্যায়।

অনেক টাকা জমাচ্ছিস বুঝি বিয়ের জন্যে?

তা জমে গেছে কিছু। আমার অবস্থাতে যেমন জমানো যায়। চুরি-টুরি তো করি না। তাছাড়া, খরচ তো বেশি নয়, বিশেষ করে সিঙ্গরাউলির মতো জায়গাতে। কলকাতার মতো খরচ করার জায়গা আর অবকাশ তো

ওখানে নেই। তাছাড়া বুঝলি না। "আই অ্যাম কনটেন্ট উইথ হোয়াট আই হ্যাভ, বি ইট লিটল অর মোর" ছেলেবেলাতে পড়া কবিতাটাকেই জীবনের ধ্রুবতারা করেছি। এ তারার আলো থেকে যেদিন বঞ্চিত হব সেদিন মানুষ হয়তো আর থাকব না, মনুষ্যেতর জীবেই পর্যবসিত হয়ে যাব। চারদিকে বড় বেশি লোভ, বড় বেশি বিজ্ঞাপন, বড় বেশি চাহিদা আজকাল। নষ্ট হয়ে-যাওয়া মানুষের ভিড়ের মধ্যেই বাস আমাদের। আজকে মানুষ হয়ে বেঁচে থাকাটাই বড় মুশকিল।

অনিশ অভিভূত হয়ে গেল অতির কথা শুনে। ও একটুও বদলায়নি। এই জন্যেই ওকে এত ভাল লাগত অনিশের। সর্বগ্রাসী লোভের রৌরবের মধ্যে বাস করেও অতি নিজের নিজস্ব স্বর্গ রচনা করে বেঁচে আছে। আজকের পরিবেশে, প্রতিবেশে এ তো কম কঠিন কাজ নয়।

তারপর অতি বলল, আমার মায়ের জন্যে টাকা পাঠাতাম কলকাতাতে এত বছর। মাও গত শীতে চলে গিয়ে সেই খরচের দায়িত্ব থেকেও ছুটি দিয়ে গেছেন।

তবে? বিয়েটা করতে তোর আটকাচ্ছে কীসে?

ওসব কথা না হয় থাক। তা তোরই বা বিয়ে করতে আটকাচ্ছে কীসে?

তারপর অতি বলল, আমার কথাটা অন্য। তুই তো জানিস।

তা জানি। মানে, শুনেছি। তবে চোখে তো আর দেখিনি। তুই আর দেখালি কোথায়? তুই আচ্ছা ইডিয়ট, যাই হোক। দেশে কি রাজকন্যার অভাব পড়েছিল?

এখন তো সে পরস্ত্রী। পরবাসে। ঠিক কোথায় যে থাকে, তাও জানি না। আমি দেখাব কী করে। বুঝলি অনিশ, প্রেম যদি খাঁটি হয়, তবে তা বড়ই দুঃখময় অনুভূতি।

প্রেম বলিস না, বল ব্যর্থ প্রেম। তবে প্রেম বলে আজকের দুনিয়াতে কিছু আছে নাকি? প্রেম এক প্রাগৈতিহাসিক অনুভূতি। যাই হোক, দেখালি বটে তুই অতি রায়। মিলেনিয়ামের দেবদাস। শাল্লা।

আমার প্রশ্নটার কিন্তু জবাব দিলি না তুই। তুই বিয়ে করছিস না কেন? অতি বলল।

বললাম তো! আজকাল বিয়ে-ফিয়ে উঠে গেছে। মানে, যাবে। তাছাড়া, মেয়ে কোথায়? বিয়ে করব কাকে?

মেয়ের অভাব দেশে?

শ্রী-অঙ্গ আছে বলেই যদি মেয়ে বলে মেনে নিতে হয় তবে মেয়ের সত্যিই কোনও অভাব নেই। তাছাড়া, আমি তো মেয়ে খুঁজছি না, বউ খুঁজছি।

চাকরি-করা মেয়ে?

না। আমার বউকে আমি চাকরি করতেই দেব না। সে আমার ঘরের লক্ষ্মী হবে। আমার সন্তানদের মানুষ করে তুলবে।

নক্কী। বাঃ। তা রান্না করবে না?

করবে বই কী! কখনও কখনও। যদি ইচ্ছে হয়। যদি ইচ্ছে হয় তো রোজও করতে পারে।

বুঝেছি। ঝি বানাবার মতলব? মুখে বড় বড় বাতেল্লা।

মোটেই নয়।

স্ত্রীর নিজস্ব রোজগার না থাকলে তার মনের জিনিস-টিনিস কিনবে কী করে।

আমি আছি কী করতে। তার সব স্বপ্ন আমিই পুরিয়ে দেব। তাছাড়া, তাকে, মোটা টাকা হাতখরচও দেব। প্রত্যেক মাসে।

বাঃ। বাঃ ঘরে ঘরে এমন স্বামী হোক। মেয়েরা যদি পুরুষদের গন্ধমাদনের মধ্যে তোর মতো বিশল্যকরণীর অস্তিত্ব একবার জানতে পারে, তবে তো তোর বাড়ির সামনে ভিড় সামলাতে মাউন্টেড পুলিশ ডাকতে হবে।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, তবে হ্যাঁ! তোর কপালে শেষমেশ কী আছে তা জানি না। শেষের দিন ভয়ঙ্করও হতে পারে। তারপর বলল, আমার ঠাক্‌মা মেয়েদের সম্পর্কে একটা প্রবচন উল্লেখ করতেন প্রায়ই।

সেটা কী?

"অতি বড় ঘরণী না পায় ঘর, অতি বড় বরণী না পায় বর।" ওই প্রবচনটা একটু পাল্টে দিয়ে তোর মতো পুরুষের ওপরেও প্রয়োগ করা চলে।

এই তো তোদের দোষ। এত হাজার বছর মেয়েদের দাসী-বাঁদী করে রাখলি তারপরেও আমার মতো ব্যতিক্রমী পুরুষ যদি বা দু-একটি জন্মাল তো তোর মতো পুরুষেরা, লজ্জাহীন প্যাট্রিয়ার্করা, তার পেছনে লেগে গেলি। দাঁড়া না। হবে তোদের। আগামী প্রজন্মের মেয়েরা তোদের নাকে ঝামা ঘষে দেবে ভাল করে।

তোর মতো বামা-ভক্ত পুরুষ, বামা-ক্ষ্যাপাও বলা চলে, দু'চার ডজন এসে গেলেই পুরুষদের নাকই হাপিস হয়ে যাবে। নাকে থাকলে তবেই না ঘষবে ঝামা।

ইসস্। এগারোটা বেজে গেল। অতি বলল, আমাকে এবার উঠতেই হবে। তোদের কলকাতাতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখাটা ভারি কঠিন কাজ। একটু আগেই বেরোই। পৌনে বারোটাতে পৌঁছতে হবে ডালহাউসিতে।

সত্যি। সিঙ্গরাউলিতে গেছিস বছর পাঁচেক হল। এরই মধ্যে কলকাতা তোদের কলকাতা হয়ে গেল। একেই বলে, "দু'দিনের বৈরাগী ভাতরে কয় অন্ন।"

অনিশ বলল।

উঠে পড়ে, অতি বলল, শক্তিপুঞ্জ এক্সপ্রেসের টিকিটটা কেটেই আমাকে একটা চিঠি ফেলে দিস। ফোনও করতে পারিস, বা ফ্যাক্সও পাঠাতে পারিস। নাম্বার তো আছেই তোর কাছে।

তা আছে।

ওক্কে। তোর সঙ্গে দেখা হবে কাল রাত আটটাতে পার্ক স্ট্রিটের ওয়ালডর্ফ-এ। যেমন কথা আছে। তারপরে একেবারে হবে ন' তারিখে, জুলাই-এর সকালে, রেনকুট স্টেশনে। ঠিক তো?

ঠিক।

অনিশ বলল, ওক্কে। চল তোকে পৌঁছে দিই।

থাক্ থাক্। ফর্ম্যালিটি করিস না। একটা ট্যাক্সি ধরে নেব। ট্যাক্সি তো তোদের বাড়ির মোড়েই পাব।

তা পাবি। আজকাল অটোও পাবি।

না না, অটো-ফটো চড়ব না?

কেন?

ভয় করে। দিল্লিতে অটো থেকে একবার পড়ে গেছিলাম।

এই নইলে পুরুষসিংহ।

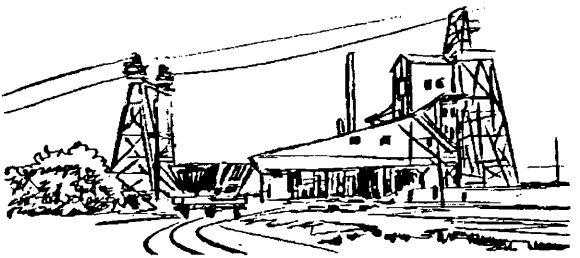

সামনেই একটা বেশ উঁচু চড়াই। একটু আগেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। বৃষ্টির পরে রোদ ওঠাতে লাল মাটির নির্জন পথটাকে দু'পাশের নতুন লাগানো সবুজ গাছ-গাছালির মতো ভারি নরম, সুন্দর, বিভাময় দেখাচ্ছে। তবে এই বনে স্বাভাবিক বনের মতো সুগন্ধ নেই। এ এখনও নবীন-কিশোরী। গন্ধবতী যুবতী হতে এ আরও অনেক সময় নেবে। যোজনগন্ধা হতে তো আরওই সময় নেবে।'

মিঠা আসবে বলেছিল সাড়ে চারটেতে। এখন পৌনে পাঁচটা বাজে। সময়ের জ্ঞান তার কোনওদিনই ছিল না। তাই উদ্বিগ্ন হল না অতি। সে আসবে গর্বী থেকে। যেমন কথা ছিল, তেমন পথপাশের সেই বড় পাথরটার ওপরে বসে তাই পথে চেয়ে ছিল অতি রায়।

একটু আগেই নর্দার্ন কোলফিল্ডসের ফিনান্স ডিরেক্টর এ. কে. দাস সাহেবের সাদা এয়ার-কন্ডিশনড অ্যাম্বাসাডর গাড়িটা চলে গেল। কালো কাচের কারণে দেখা গেল না ভিতরে বসা তাঁকে। ইচ্ছে করলে তিনি অথবা সিএমডি সেন সাহেব মার্সিডিজেও চড়তে পারতেন। কিন্তু সরকারি এবং আধা-সরকারি দপ্তরে সাদা অ্যাম্বাসাডর চড়াই রেওয়াজ। গভর্নর, চিফ জাস্টিস, চিফ মিনিস্টাররা অবশ্য সাদা কন্টেসাতে চড়েন। এখন নতুন সব গাড়ির আমলে কী হবে জানা নেই।

হয়ত মিসেস দাসও গাড়িতে ছিলেন। ওঁরা সম্ভবত জয়ন্ত্-এ যাচ্ছেন। ওঁদের এক আত্মীয় থাকেন সেখানে। ছুটি বলতে তো কিছু নেই এই সব খাদানে। সাত দিনই কাজ।

যেখানেই ওপেন-কাস্ট মাইন আছে কয়লার, সেখানেই সমস্ত গাছ-পালা তো কেটে ফেলতেই হয়। তারপর ওপরের মাটির স্তরও সরিয়ে ফেলতে হয়। এই প্রক্রিয়াকে খাদানের টার্মিনোলজিতে বলে রিমুভ্যাল অফ ওভার-বারডেন। সংক্ষেপে, আর. ও. বি.। প্রকাণ্ড এলাকা জুড়েই মাটিও সরিয়ে নিতে হয় পরতের পর পরত। অনেক সময় বেশি গভীরেও যেতে হয়। মাটি সরালে, কয়লার স্তর দেখা যায়। তাও পরতের পর পরত। ইংরাজিতে যাকে বলে SEAMS.

বড় বড়, অতিকায় সব দৈত্যর মতো দেখতে, ডায়নোসরদের চেয়েও অনেক বড় বড় ডাম্পার, ড্রেজার, শোভেলার সব প্রচণ্ড শব্দ করে যার যার কাজ করে যায়। ড্র্যাগ-লাইনের চার-পাঁচতলা বাড়ির সমান উঁচু ড্রাইভিং-কেবিনে বসে নীচের মানুষজনকে ছোট ছোট দেখায়। অতি ড্রাগলাইন চালায়, সেই জন্যে তার সহকর্মীরা তার নামটাকেও বড় করে দিয়েছে। তারা অতিকে ডাকে "অতিকায় রায়" বলে। তার ছোটখাট চেহারার সঙ্গে ওই বড়-সড় নামও ড্রাগলাইনের আয়তনেরই মতো মানায় না একেবারেই।

মাইনে-টাইনে ভালই। কোয়ার্টারও ভাল। খনি এলাকা হলেও কোয়ার্টারের দিকে বায়ু বা শব্দদূষণ নেই। যাদবপুর থেকে মেকানিকাল ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে দু'বছর বসেছিল। এখানে ইঞ্জিনীয়র হিসেবেই জয়েন করেছিল। ড্রাগলাইনেরই মতো, মাঝে মধ্যে ডাম্পারও চালায়, ভাল লাগে বলে। হেভি ভেইকেলের লাইসেন্সও আছে বলে। তার চাকরিটা ইঞ্জিনীয়রেরই, ড্রাগ লাইন-ড্রাইভারের নয়।

তবুও যে ডাম্পারগুলো এখানে চলে তাদের একটি টায়ারের দামই দশ লাখ টাকা। এমনিতে অনুমান করার অসুবিধে হলেও টায়ারের দাম জানলেই অনধিকারীদের পক্ষে ডাম্পারদের বিরাটত্বর একটা অনুমান করা সহজ হয়। ড্রাগলাইন বহু টন কয়লা খাবলা খাবলা করে তুলে ডাম্পারে ডাম্প করে দেয় আর ডাম্পারেরা কয়লা নিয়ে গিয়ে কনভেয়র বেল্টে ফেলে। সেইখান থেকে কনভেয়র বেল্ট কয়লা বয়ে নিয়ে গিয়ে প্রকাণ্ড SILO-তে জমা করে। সাইলো থেকে সরাসরি ট্রেনের ইয়ার্ডে

দাঁড়িয়ে-থাকা মালগাড়ির "রেক"-এ কয়লা ভর্তি করা হয়। তারপর খাদান থেকে সেই কয়লা চলে যায় রেনুকুটের পথে ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টে, যেখানে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। সংক্ষেপে বলে এন. টি. পি. সি। কয়লা অন্যান্য নানা শিল্পের বয়লারের জন্যেও চলে যায় নানা গন্তব্যে। ডিজেল ও বিদ্যুতের যুগ হলেও এই যুগেও কয়লার বয়লার এখনও অগণ্য কারখানাতে আছে। নানা জায়গাতে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হলেও এখনও পুরো দেশের বিদ্যুতের জোগানের বড় অংশই কয়লা থেকে উৎপাদিত। "অলটারনেট পাওয়ার" কয়লাকে হটাতে এখনও অনেকই সময় নেবে।

এখন যে পথ দিয়ে "শক্তিপুঞ্জ এক্সপ্রেস" যাত্রীবাহী ট্রেন চলে, সে পথেই আগে যেত অতি মন্থর গতির চোপান এক্সপ্রেস। এই রেলপথ দিয়েই পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ আর মধ্যপ্রদেশের কয়লা যায় উত্তর ভারতের নানা জায়গাতে। এই পথে কয়লা ও বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী নানা খনি ও প্ল্যান্ট আছে বলেই যাত্রীবাহী গাড়িটির নাম হয়েছে "শক্তিপুঞ্জ এক্সপ্রেস"। তা না হয়ে, উষ্ণতা এক্সপ্রেসও হতে পারত। "একটু উষ্ণতার জন্যে" উপন্যাসের পটভূমি ম্যাকলাস্কিগঞ্জের ওপর দিয়েও যায় শক্তিপুঞ্জ। "বাসনাকুসুম"-এর পটভূমি মহুয়া-মিলনের ওপর দিয়েও য়ায়। যায় "কোয়েলের কাছের," "কোজাগরের" "ডালটনগঞ্জের" ওপর দিয়েও। সব শক্তির উৎসই তো হচ্ছে উষ্ণতাই। ভাবে, অতি।

লাল মাটির কাঁচা পথের দু'পাশে এই গাছগুলো লাগিয়েছে, অতি যে কোম্পানিতে কাজ করে সেই নর্দার্ন কোল্ডফিল্ডসই। বাধ্যতামূলকভাবে গাছ লাগাতে হয় সমস্ত ওপেন-কাস্ট কয়লা খাদানেই।

ওপেন-কাস্ট খাদান ছাড়াও অন্যরকম কয়লা খাদানও আছে। সেখানে, আধুনিক শল্যবিদরা যেমন বাট্ন-হোল ইনসারশন করে অ্যাপেনডিসাইটিস অপারেশন করেন, তেমনই করে পৃথিবীমায়ের পেট ফুটো করে লিফটে করে নীচে শ্রমিকদের নামিয়ে দেওয়া হয়। শ্রমিকরা গাঁইতি-কোদাল দিয়ে এবং অন্য নানা আধুনিক যন্ত্র দিয়েও পিলার সিস্টেমে কয়লা কেটে বড় ভূগর্ভ থেকে তুলে এনে লিফটে করে তা

ভূতলের ওপরে পাঠিয়ে দেন। সেই সব খাদানকে বলে, ইনক্লাইন মাইনস। ভূগর্ভে রেললাইনও পাতা থাকে। তার ওপর দিয়ে ট্রলি করে কয়লা নিয়ে আসা হয় লিফটের কাছাকাছি।

যতখানি জঙ্গল ওপেন-কাস্ট খাদানের জন্যে কেটে ফেলা হয় তার বহুগুণ বেশি এলাকাতে গাছ লাগাতে হয় খাদান কর্তৃপক্ষকে বাধ্যতামূলকভাবে। এবং লাগাতে হয় বন-বিভাগেরই তত্ত্বাবধানে। প্রত্যেক খাদান এলাকার জন্যে একজন করে কনসার্ভেটর অফ ফরেস্টস থাকেন। তাঁর নীচে থাকেন অনেক ডিএফও বা অ্যাডিশন্যাল কনসার্ভেটর। তাদের নীচে আরও অনেক রেঞ্জার বা অ্যাডিশনাল ডিএফও। তাঁদেরও নীচে ফরেস্ট গার্ড, যাঁদের নাম হয়েছে ইদানীং অ্যাডিশনাল রেঞ্জার।

স্বাধীন ভারতবর্ষে সরকারি কর্মচারী মাত্রই বড়ই লেজুড়লোভী হয়ে উঠেছেন। কী রাজ্য সরকারের, কী কেন্দ্রীয় সরকারের। কাজে দক্ষতা, আন্তরিকতা, আর সততা বেড়েছে কী বাড়েনি তা যাঁরা জানেন তাঁরাই বলতে পারবেন, কিন্তু তাঁরা পদভারী ও লেজভারী যে হয়েছেনই তাতে কোনওই সন্দেহ নেই।

লো-গিয়ারে মোপেডের এঞ্জিনের চড়াই-ওঠার ফট-ফট-ফট-ফট শব্দটা যেন দূর থেকে শুনতে পেল এবারে অতি। বর্ষণসিক্ত প্রকৃতির শব্দগ্রহণ ও শব্দপ্রেরণ ক্ষমতা স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে যায় অনেক। সে কারণেই বৃষ্টির পরে শব্দটার জোরও বেড়েছে। আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে কাওয়াসাকি বা হিরো-হণ্ডার মতো ভারী কোনো মোটর সাইকেল। মিঠাই যদি হয়, তবে ওরটা বাজাজের স্কুটার। হালকা। তেল লাগেই না বলতে গেলে চলতে। মনে হয়, ভালবাসাতেই চলে। স্কুটারে এত শব্দ হওয়ার কথা নয়।

ভাবছিল, অতি।

চড়াইটার ওপরে যখন উঠে এল আওয়াজটা, তখন অতি দেখতে পেল যে, মিঠা নয়। আমলোরীর মদের দোকানের মালিক জটাধারী সিং। জটাধারী ঋজু পেটা সুপুরুষ। পাঞ্জাব-পুত্তর। তার তার শরীরের তাঁবে

অত ভারী মোটর সাইকেলটাকেও মনে হচ্ছে যেন একটা খেলনা আর্মিতে ছিল এক সময়ে। জাঠ রেজিমেন্টে। সেখানে কর্নেল সাহেবের মেমসাহেবের সঙ্গে তার লটরপটর হওয়াতে তাকে কোর্ট-মার্শল করা হয়েছিল। টাকা-পয়সা যা পেয়েছিল তা নিয়েই চার-পাঁচটা ট্রাকের মালিক, তার জীজাজী সুখবিন্দার সিং-এর কাছেই চলে এসেছিল বছর দশেক আগে। তারপর ভালমতো খরচাপাতি করে ভোপাল থেকে মদের দোকানের লাইসেন্সও বের করে নিয়ে এসে সে নিজেও বড়লোক হয়েছে তার শিখ ভগ্নীপতিরই মতো। বাঙালি নয় বলেই ওদের মধ্যে ঈর্ষাটা প্রায় অনুপস্থিত। কাঁকড়ার জাত তো নয় ওরা! তবে হ্যাঁ! পরিশ্রমও করে দু'জনেই। কঠিন পরিশ্রম করে যে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই কোনও।

এই সর্দারজীদের সম্বন্ধে অতির নানাকারণে বিশেষ দুর্বলতা আছে। ওর বাবার কাছে শুনেছিল যে, দেশভাগের পর কনট-সার্কাসের ফুটপাথে একটি বাচ্চা ছেলে পকেট-চিরুনি বিক্রি করছিল ঘুরে ঘুরে। চিরুনির দাম ছিল দু'আনা। অতির বাবা ইচ্ছে করে একটা টাকা দিয়ে চেঞ্জ না নিয়ে চলে আসাতে বাচ্চা ছেলেটি ভিড়ের মধ্যেও দৌড়তে দৌড়তে এসে তাঁকে খুঁজে বের করে বলেছিল, "আপকি চেঞ্জ লিজিয়ে বাবুজী। ম্যায় কাঙ্গি বিক রহা হুঁ, ভিখ নেহি মাঙ্গ রহা হুঁ।"

অতির বাবা অভিভূত হয়ে গেছিলেন।

শিখরা ওরকম অথচ আমরা বাঙালিরা এখনও ভিখিরিই রয়ে গেলাম কম-বেশি। ভাবলেও লজ্জা করে। অবশ্য এর পেছনে নেহরু সাহেব ও গোল্লা সাহেবদের চক্রান্তও ছিল।

মদের দোকানটা সিখাসী কর্মচারীরাই চালায়। জটাধারী ট্রাক ও গাড়ির ইঞ্জিন মেরামতির বিরাট কারখানা করে ফেলেছে আমলোরীতেই। সেখানেই বেশি সময় দেয়। লেদ-ফেদ তো আছেই, নানা সফিস্টিকেটেড মেশিনও এনে ফেলেছে। সিঙ্গরাউলি তো বটেই, জয়ন্ত, নীগাঁহি, আমলোরী এলাকার মধ্যে তার কারখানাই সবচেয়ে বড়। তাছাড়া, তার হাতের কাজের এমনই সুনাম যে, আদিত্য বিড়লা গ্রুপের হিন্ডালকোর জনপদ রেনুকুট থেকেও ট্রাক ও গাড়ির ইঞ্জিন আসে মেরামতির জন্যে।

আষাঢ়ের বিকেলের রোদ নরম হয়ে এল। আরও আধঘণ্টা হা-পিত্যেশে থাকল অতি সেদিকে চেয়ে, যেদিকে লাল পথের চড়াইটা বৃষ্টি-থামা নীলাকাশের রামধনুর তোরণের মতো কিছুক্ষণ স্থির থেকে তারপরে হঠাৎই মুছে গেল। একটা তক্ষক ডাকতে লাগল পাশের জঙ্গল থেকে। বলল, ঠিক। ঠিক। ঠিক।

অতি বুঝল যে, তার মন যা বলছে তাই ঠিক। আজ আর মিঠা আসবে না।

পরক্ষণেই তার মনে দুশ্চিন্তার মেঘ ঘনিয়ে এল। কে জানে। ঠিক এই সময়েই হ্যা হ্যা করে হাসা সবজান্তা লাহিড়ীটা গিয়ে পৌঁছেছে হয়ত মিঠার বাড়িতে। নিশ্চয়ই বলেছে, কী ছাতার গান শুনতে যাবি মোটর সাইকেলে চড়ে। চল আমার সঙ্গে, কবিতা পাঠের আসর বসবে আজ গোদা গাঙ্গুলির বাড়িতে। আমি তো জীপ নিয়েই এসেছি। জীপেই যাব। বৃষ্টির মধ্যে ভিজতে ভিজতে তোর মোপেডে যেতে হবে না অত দূরে।

কবিতা পাঠের পর খাওয়া-দাওয়াও নিশ্চয়ই আছে। ভাবল, অতি। কবিদের জমায়েত যখন, তখন রাম এবং ঠাররাও থাকবে অবশ্যই। তারা যে সব রাম্-ভক্ত হনুমান। চল। চল। কী ক্ল্যাসিকাল গান শুনতে যাবি অগ্নিভ চ্যাটার্জির বাড়ি! এই ইন্টারনেটের যুগে যেখানে চাবি টিপে বলে দেওয়া যায় যে, "আই লাভ য়ু।" অথবা "ইওর ফাদার পাসড অ্যাওয়ে ফাইভ মিনিটস্ এগো", সে যুগে আলাপ-তান-বিস্তার-তানকারী শোনার কী যে মানে হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় নষ্ট করে, তা ভেবেই পাই না আমি।

এসব কথা নিশ্চয়ই বলেছে লাহিড়ী, মিঠাকে। কে জানে! রূপাকেও হয়ত নিয়ে যাবে ওদের ওই আড্ডায়।

তারপরই নিজেকে বলল, না, না, তা যাবে না। ওরা কাজিনস হতে পারে কিন্তু মিঠার সঙ্গে রূপার কোনওদিক দিয়েই মিল নেই। না চেহারার, না রুচির। এইটাই ভরসার কথা। মিঠাটা এতো বোকা যে, লাহিড়ী কেন যে ওকে এত তেল লাগায় সে কথাটাই ও বুঝতে পারে না। ওর নিজের জন্যে থোড়ি লাগায় তেল। আসলে ওর বোন রূপার

জন্যেই লাগায়। রূপারই জন্যে। এটুকু বোঝার মতোও মাল নেই মিঠার মাথায়।

এই সব ভাবতে ভাবতে পাথরটা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল অতি। তারপর ধীরে ধীরে একটা কেসিয়া গাছের গায়ে হেলান দেওয়ানো তার মোটর সাইকেলটা নিয়ে ঠেলে রাস্তায় উঠল।

ভাবছিল, সেদিন ওর ছোট বোন ইতি চিঠি লিখেছে কলকাতা থেকে যে, নবকেতা বলে কে একজন জীবনমুখী গানের গায়ক নাকি সেদিন কোনও অনুষ্ঠানে বলেছেন, "আজকাল আর 'যমুনা কি তীর' শোনার দিন নেই। যমুনা কবে শুকিয়ে গেছে। আজও যমুনা কি তীরের কোনও মানে হয়!"

এবারে কলকাতা গেলে ওই চিজটিকে একবার নিজের চোখে দেখে আসতে হবে। কোনও ভারতীয় গাইয়ে এমন কথা বলতে পারেন এ কথা ভাবা পর্যন্ত যায় না। জ্ঞানের সীমা চিরদিনই ছিল, অজ্ঞতার সীমা ছিল না কোনও দিনই। ঔদ্ধত্যকে যারা সপ্রতিভতা বলে মনে করে তারা রামছাগল।

এমন কিন্তু নয় যে, কবিতা ভালবাসে না অতি, বা কখনও কখনও লেখেও না কবিতা। কিন্তু ওর মনে হয়, কবিতা নিভৃতে লেখবার ও নিভৃতে পড়বারই জিনিস। বাংলা ভাষার কবিতা-পাঠের সঙ্গে মুশায়রার চিরদিনই তফাত ছিল। এবং থাকবে। সাম্প্রতিক অতীত থেকে কবিতা ব্যাপারটাই যেন যূথবদ্ধ জীবেদের সংস্কৃতি হয়ে উঠেছে। দলে দলে কবিরা কবিতা নিয়ে সভা করে কবিতাকে অনুক্ষণ দলামচড়া করছে। এঁরা কেমন কবি, কে জানে! এই দলবদ্ধতার দিনে কবিদের মধ্যেও এই দলবদ্ধতা ব্যাপারটা একেবারেই ভাল লাগে না অতির। জীবনের সব ক্ষেত্রেই "জনগণায়ন" আদৌ অভিপ্রেত কি না তা নিয়ে গবেষণার সময় বোধহয় হয়েছে। তাই একাধিক কারণে লাহিড়ীদের কবিতা পাঠের আসর অথবা মদ খাওয়া নিয়ে বেলেল্লাপনাকে যতখানি সম্ভব এড়িয়ে যায় ও।

মদ যে ও নিজেও খায় না এমন নয়। কিন্তু মদ খাওয়া যে একটা বাহাদুরির ব্যাপার এবং পুরুষশক্তির একমাত্র প্রকাশ এ কথা কখনওই

মনে হয়নি ওর। তাছাড়া, যেহেতু মদ খেলে জিভ আলগা হয়ে যায়, যার-তার সঙ্গে মদ খাওয়া ওর পছন্দও নয় আদৌ। ঠেকে শিখেছে এ কথা। শুধুমাত্র লাহিড়ীদের মতো পালের গোদা শয়তানেরাই মদ খেয়ে চুপ করে থাকে। যখন অন্য সকলেই কথা কয়।

ওর মনটা চিরদিনই বেশ নিচুগ্রামেই বাঁধা। তবে তাতে কোমল সুরের প্রাধান্য আছে। কবিতার এই জনগণায়ন ও সমর্থন করে না। করবে না।

যদিও ওর একার মতামতের কোনোই দাম নেই যে, সে কথা ও জানে।

মিঠার রুচিটা যে অতি, ভাল গান শুনিয়ে একটু ভাল করবে, সে সুযোগটাও মিঠা তাকে দিল না। রূপাকে যদি নিয়ে যেতে পারত! তা কি হবে কখনও? যা-কিছুই সহজে হয় না, তা কিছুই হওয়াবার জন্য মন বড় আকুলি-বিকুলি করে।

কে জানে! মিঠা বুঝতে পারে কি না অতির এই দুর্বলতা, তার বোনের প্রতি। রূপা যে বোঝে, সে বিষয়ে ওর নিজের কোনওই সন্দেহ নেই। আর নেই বলেই, লজ্জায় মরে যায়, নিজের কাছেই। ভয়েও মরে। এই ভয়ের স্বরূপ যারা জানে, তারাই জানে শুধু....।

তবে নানা কারণে এবং বিশেষ করে রূপার এই "জনপ্রিয়" হয়ে ওঠার কদর্য উদ্যমে রূপার উপরেও একটু বিরক্তই হয়েছে। সাম্প্রতিক অতীত থেকে ঝিমলি বলে একটি অতি অল্পবয়সী মেয়ের প্রতি ওর এক তীব্র দুর্বলতা জন্মেছে। মেয়েটি সবে স্কুলের গণ্ডি পেরিয়েছে। নবীনা কিশোরীই বলা চলে।

অতি হাতঘড়ির দিকে দেখল একবার।

নাঃ। মিঠা সত্যিই এলো না।

এলো না তো এলো না! সে জানে না, কী আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবে।

লাহিড়ীর ওখানে রূপাকে নিয়ে গেল কি সঙ্গে করে? যেতে পারে। রূপা মেয়েটাও তেমনই। রূপই আছে, মাথায় গোবর।

ভাল গান-বাজনা তাদেরই ভাল লাগে, যারা একা থাকতে জানে। নির্জনতা তাদের কাছে বন্ধন নয়, শাস্তি নয়; মুক্তি। এবং পুরস্কারও। এই

সব গভীরতার কথা না বোঝে মিঠা, না রূপা। গান শুনতে যাবে কেন? লাহিড়ীর মতো কতগুলো সর্বজ্ঞ, আকণ্ঠ ঠার্‌রা আর খিচুড়ি গেলা তথাকথিত আঁতেলদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে বুড়োখোকাদের গবিতা-গবিতা খেলার বাহানা-মত্ত পরিবেশে প্রবেশ করে কিছু অ-কবি বদখত পুরুষের মক্ষীরানি হয়ে গুমোরে মরে যাবে।

নাঃ। অতি মনে মনে বলল, রূপাকে ও বড় বেশি ইম্পার্ট্যান্স দিয়ে ফেলেছে। মিঠাকেও ইম্পর্ট্যান্স দেয়। কিন্তু তার আশিভাগই রূপার জন্যে। এবারে দু'জনকেই ত্যাগ করতে হবে। ওরা ঠিক জানে না অতিকে। তেমন করে জানলে, ওরা জানত যে, অতি রায় যাকে জড়িয়ে ধরে তাকে অজগরের মতোই জড়িয়ে ধরে কিন্তু আবার যাকে দূরে সরায় তাকে ছিঁড়ে-যাওয়া অন্তর্বাসের বা বাথরুম স্লিপারের মতোই ফেলে দেয়, ভুলেও কখনও তার দিকে আর পেছন ফিরে তাকায় না। যা ওরা জানে না, তা জানাবে অতি রায় ওদের, বিশেষ করে রূপাকে। শী হ্যাজ টেকেন হিম ফর গ্রান্টেড।

হাঃ। সি. জি. এম-এর বাড়িতে মিঠা একা একা যেতে চায়ওনি। অত বড় অফিসার—। মিঠার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তাই অতি বলেছিল যে, পথেই অপেক্ষা করবে। মনে মনে খুবই আশা ছিল মিঠা রূপাকে নিয়ে আসবে। এই বনের নির্জনতায় বর্ষার বিকেলে পাশাপাশি বসে রূপার সঙ্গে একটু গল্প করার লোভও ছিল। সেটাই কারণ, ওদের নির্জনে আসতে বলার।

আশরাফ আলি ভোপাল থেকে অগ্নিভদার বাড়ি গাইতে এসেছিলেন। উঠেছেন অগ্নিভদার বাংলোতেই। এখান থেকে রেণুকুটে যাবেন কাল। কুমারমঙ্গলম বিড়লা এই প্রথমবার আসছেন রেনুকুটে, হিন্দালকোর কারখানাতে। তাঁর বাবা আদিত্য বিড়লার মৃত্যুর পরে। সেই জন্যেই বন্দোবস্ত। উনি নাকি উচ্চাঙ্গসঙ্গীত খুবই পছন্দ করেন।

অগ্নিভ চ্যাটার্জি নর্দার্ন কোলফিল্ডসের একজন চিফ জেনারেল ম্যানেজার। লোকে বলে, এবং নিন্দুকেরা তো বটেই যে, সি. জি. এম মানেই কোটিপতি। অনেকে আবার এও বলে যে, নর্দার্ন কোলফিল্ডস এবং মহানদী কোলফিল্ডসে চুরি বা ঘুষঘাষ নাকি অন্যান্য জায়গা থেকে

কম। এস. ই. সি. এল-ও ভাল। নর্দার্ন কোলফিল্ডস এবং মহানদী কোলফিল্ডস এই দু'টি সাবসিডিয়ারই তো কোল ইন্ডিয়াকে বাঁচিয়ে রেখেছে। অন্যগুলির মধ্যে অনেকগুলিই গাধাবোট। তাও আবার তাদের মধ্যে কিছু তলা-ফুটো গাধাবোট। যেমন ইস্টার্ন কোলফিল্ডস বা ভারত কোকিং কোল লিমিটেড। সাউথ-ইস্টার্ন কোলফিল্ডস, বর্তমানে, শুনেছে অতি যে, একজন দক্ষ প্রশাসক গৌতম ঝায়ের রক্ষণাবেক্ষণে আছে। এস. ই. সি. এল-এর হেড কোয়ার্টার্স বিলাসপুরে।

নর্দার্ন কোলফিল্ডস বছরে কোটি কোটি টাকা আয়কর দেয়। মহানদী কোলফিল্ডস অত লাভ করে না। তবু ভালই করে। আধা-সরকারি সংস্থা মাত্রই যে সরকারের ঘাড়ের বোঝা এমন ধারণা উল্টে দিয়েছে নর্দার্ন কোলফিল্ডস এবং মহানদী কোলফিল্ডস। মহানদী কোলফিল্ডস লিমিটেডের সি. এম. ডি. মানে চেয়ারম্যান-কাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর শর্মা সাহেব করিৎকর্মা মানুষ। কোল ইন্ডিয়ার ফ্ল্যাগশিপ নর্দার্ন কোলফিল্ডসের সি. এম. ডি এবং এফ. ডি. অর্থাৎ চেয়ারম্যান-কাম-ম্যানেজিং ডিরেক্টর এস কে সেন এবং ফিনান্স ডিরেক্টর এ কে দাস দু'জনেই বাঙালি। এখন কোল ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যানও তো এক বাঙালিই, পার্থ ভট্টাচার্য সাহেব। এস কে সেন সাহেব কোল ইন্ডিয়ার বোর্ডেও হয়ত যেতে পারতেন, যদি বয়স থাকত। তবে ইতিমধ্যে যদি অবসরের বয়স ছিটেল কেন্দ্রীয় সরকার আবারও বাড়িয়ে দেন তাহলে অবশ্য অন্য কথা।

মনে মনে হেঁটে যাওয়ার এই এক বিপদ। যেহেতু সে পথে হোঁচট খেতে হয় না, বাঁক নিতে হয় না, গাড়ি-ঘোড়াও থাকে না, বেশ গড়গড়িয়ে এদিকে ওদিকে চলে যায় মন। বাধাহীন ভাবনার শুরু হয়েছিল মিঠা আর রূপার না-আসা নিয়ে, তারপরে আশরাফ আলির গান নিয়ে। কিন্তু চলে গেল কত দূরে এবং কত না দিকে দিকে।

ভাবছিল, অতি।

আসলে গতকাল সকালে আশরাফ আলির একটু ছেড়ছাড় শুনেছিল অগ্নিভদার বাড়িতে। অতটুকুতেই নেশা হয়েছে। ভাটিয়ার গেয়েছিলেন কাল। আজ কী গাইবেন কে জানে।

অগ্নিভ চ্যাটার্জির বাংলোর হাতাতে মোটর সাইকেলটাকে পার্ক করিয়ে যখন ড্রইং রুমে ঢুকল, দেখল গান সবে শুরু হয়েছে। জোড়া তানপুরার, নানা ফুলের আর ধূপের গন্ধে পরিবেশ একেবারে তৈরি।

আশরাফ আলির ঘরানা রামপুর সাসওয়ানের। যে ঘরানার উস্তাদ নিসার হুসেন খাঁ অল্প ক'বছর আগে দেহ রেখেছেন। শেষ বয়সে তিনি কলকাতার সঙ্গীত রিসার্চ অ্যাকাডেমির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পণ্ডিত বিজয় কিচলু সাহেব যার কর্তা।

কলকাতার টালিগঞ্জের 'দ্যা অ্যালডীন'-এ আই. টি. সি-র সঙ্গীত রিসার্চ অ্যাকাডেমিতে অবশ্য অনেকেই আছেন। পণ্ডিত আর্কাট কান্নান, মালবিকা কান্নান, অজয় চক্রবর্তী, উলহাস কাশালকার, অরুণ ভাদুড়ি, শুভ্রা গুহ আরও অনেকে। তবে অজয় চক্রবর্তীর তরুণী ও সুন্দরী কন্যা কৌশিকীর গান একবার শুনেছিল অতি, ডঃ উৎপল রায়ের বাড়িতে। কৌশিকীর রূপে ও গুণে একেবারে মরে গেছে সে। প্রেমে পড়ে গেছে হেড ওভার হিলস। অতির বয়সটা যদি একটু কম হতো তবে কৌশিকীর জন্যে জান লড়িয়ে দিত। সঙ্গীত রিসার্চ অ্যাকাডেমির আরেকটা তারকা উঠছে, এখন্য কিশোর সে, খুরাম্। মাথা যদি বিগড়ে না যায়, তবে ও বহত আচ্ছা উস্তাদ হয়ে উঠবে।

উস্তাদ নাসির হুসেন খাঁ দেহ রাখার আগে তাঁর শিষ্য রাশিদ খাঁকে তৈরি করে দিয়ে গেছেন গুরু-শিষ্য পরম্পরায়। কোনও গুরুই অবশ্য কোনও শিষ্যকে, দর্জি যেমন করে জামা তৈরি করেন, তেমন করে তৈরি করতে পারেন না। করতে চানও না। যিনি তৈরি হওয়ার, তিনি শুরু এবং ঈশ্বরের কৃপাতে সুধন্য হয়েও তাঁর নিজের তাগিদেই তৈরি হন। বড় হওয়ার তাগিদ এবং অদম্য জেদ শিষ্যর নিজের মধ্যে না থাকলে কারোকেই কোনও গুরু শত চেষ্টাতেও বড় করে দিতে পারেন না।

জীবনের কোনও ক্ষেত্রের কোনও শিক্ষাই গুরুর বা গুরুকুলের বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সম্ভবত পুরোপুরিই আসতে পারে না কখনও। পরম্পরাতে যদি আসে তিরিশ ভাগ, তাহলে বাকি সত্তর ভাগ শিষ্যকে বা ছাত্রকে নিজের সেল্ফ-জেনারেটরে ভিতরে ভিতরে তৈরি

করে নিতে হয়। গুরু বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জ্ঞানের বা সুরের প্রেম জাগিয়েই দিতে পারেন বা পারে শুধু, সেই প্রেমকে উজ্জ্বল করার সব দায়িত্ব শিক্ষার্থীরই। তা নইলে কী এমন বলা হতো কখনোই যে "দ্য পারপাস অব এ ইউনিভার্সিটি ইজ টু ব্রিং দ্য হর্স নিয়ার দ্য ওয়াটার অ্যান্ড টু মেক ইট থারস্টি।" কখনওই তা বলা হতো না। এই সব কারণেই হয়ত কহবৎও আছে হিন্দিতে : "গুরু মিলে লাখ লাখ, চেলা মিলে এক।"

আবার ঈশ্বর সুপ্রসন্ন হলে এমন ঘটনাও ঘটতে পারে, যখন সকলে বলেন, "গুরু গুড়, চেলা চিনি।" অর্থাৎ গুরু গুড়ই থেকে গেলেন আর চেলা চিনি হয়ে উঠলেন, অর্থাৎ গুরুকে ছাড়িয়ে গেলেন। যে-কোনও যথার্থ গুরুরই তো তাতে খুশি হওয়ারই কথা। পিতা যেমন পুত্রের কাছে, তেমনই গুরুরও শিষ্যর কাছে হার তো পরমানন্দের কথা, যদি পিতা বা গুরু সেই পরম সুখের হারকে দুঃখের পরাজয় বলে না মনে করেন। পিতা বা গুরুর হৃদয়ে ঔদার্যের খামতি থাকলে তা আদৌ তাঁর পক্ষে সম্মানের হয় না।

অগ্নিভদা গতকাল সকালে বলছিলেন যে, 'ঘরানা' শব্দটার ব্যবহার সঙ্গীত জগতে আকছার হয়, কিন্তু অতি অল্পজনেই জানেন সেই শব্দটির মানে। অগ্নিভদার কাছেই অতি জেনেছিল যে, তিন পিঁড়িতে এক ঘরানা হয়। মানে, একই পরিবারের অথবা গুরু-শিষ্য-পরম্পরার গায়ক-গায়িকারা যখন একই চলন, বলন ও তালিমে গায়ক বা বাদক হয়ে ওঠেন তবে সেই 'ঘরের' ঐতিহ্যমণ্ডিত কমপক্ষে তিন প্রজন্মের প্রথা-সিদ্ধ একটি বিশেষ গায়ন বা বাদনরীতিকেই ঘরানা বলে। এক এক ঘরানার গায়ক-গায়িকা বা বাদকের গলাতে বা বাজনাতে একই রাগের বন্দিশ, আলাপ, তান, বিস্তার, লয়কারী, তানকারী, বহলাওবা, ঠাহরান, মিজাজ সব কিছু নিয়ে এক এক রকমভাবে চর্চিত হয়। এই কারণেই এক ঘরানার সঙ্গে অন্য ঘরানার বৈশিষ্ট্যর তফাত এমনি করেই একাধিক প্রজন্মর গান-বাজনার মাধ্যমে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জগতে গড়ে উঠেছে।

আশরাফ আলি নাকি কলকাতায় কুমারপ্রসাদ মুখার্জি, যিনি কি না বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ধূর্জটিপ্রসাদের পুত্র এবং নিদানবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কাছেও তালিম নিয়েছিলেন। রাশিদ খাঁয়েরই সমবয়সী আশরাফ। তালিম যদিও রামপুর সায়সাওয়ান ঘরানার দুই বাঙালি গুরুর কাছে নিয়েছিলেন কিন্তু রাশিদের সঙ্গেও ওঁর নিশ্চয়ই যোগাযোগ হয়েছিল নইলে রাশিদ খাঁয়ের গায়কীর এত প্রভাব পড়ে কী করে।

এ কথা, অতি ঠিক করল, পরে অগ্নিভদার কাছ থেকে জেনে নিতে হবে।

রাশিদ খাঁয়ের বয়স চল্লিশ হতে এখনও অনেক দেরি কিন্তু গলা শুনলে মনে হয় বাঘ ডাকছে। বড়ে গুলাম আলি খাঁ সাহেব এবং আমীর খাঁ সাহেবের গলার স্বরের পরে এরকম জলদগম্ভীর স্বর অতি বিশেষ শোনেনি। প্রেমেই পড়ে গেছে রাশিদ খাঁয়ের। যদিও মধ্যপ্রদেশের এই প্রত্যন্ত প্রদেশে বসে ক্যাসেট আর সিডির মাধ্যমেই গান-বাজানার সঙ্গে যোগাযোগ অতির। সামনাসামনি মাত্র একবারই শুনেছে কলকাতাতে, বিড়লা সভাগৃহে। সেই স্মৃতিকেই আঁকড়ে ধরে একা বসে শ্রাবণের বৃষ্টিঝরা বা জ্যৈষ্ঠের ছমছম-করা জ্যোৎস্নাভরা রাতে ঘরের বাতি নিভিয়ে ফুলদানিতে ফুল সাজিয়ে, ধূপ জ্বালিয়ে ও রাশিদ খাঁকে শোনে।

বিকেলবেলা গাইবার এই শুধ-সারং রাগটির ধৈবতে যদি বেশিক্ষণ লীন হওয়া যায় তবে এই রাগ শ্যাম কল্যাণের চেহারা নেয়। এই রাগের মূল দু'টি স্বর হল মধ্যম আর শুদ্ধ নিষাদ। সে কারণে এ দু'টি স্বরই এই রাগে বেশি প্রাধান্য পায়। মধ্যম আর শুদ্ধ নিষাদের পরই সে স্বর এই রাগে প্রাধান্য পায়, তাহল 'রে'। কারণ এ রাগ সারং।

সারং শুনলেই অতির ছেলেবেলায় পড়া সুকুমার রায়ের

"গুরুজী চিতং,
মেরা সারং মে বাজিছে
নয়া নয়া রঙ"

মনে পড়ে যায়। কেন? তা জানে না।

হিন্দুস্তানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিভিন্ন রাগগুলি এমনই যে, এক একটি রাগে এক একটি স্বর প্রাধান্য পেয়ে থাকে। আর একটি বিশেষ স্বর যেখানে প্রাধান্য পায়, স্বাভাবিক কারণেই, তার দু'পাশের স্বর দু'টির

প্রাধান্য কমে যায়। এই নিয়ম সমস্ত স্বরের বেলাতেই খাটে। ব্যতিক্রম শুধু 'সা' আর 'পা'।

আশরাফ আলি সেই বিকেলে ধৈবতের স্পষ্ট গন্ধমাখা নি-ধা-সা-নি-রে-গা স্বরগমটিকে একটি সুগন্ধি ফুলের তোড়ার মতো শ্রোতাদের উপহার দিয়ে গেলেন। মা-পা-সা নি-রে-সা এবং রে-মা তীব্র মধ্যমের সব তীব্রতার স্ফূরণ করে শুদ্ধ সারং যে অন্য সব সারং থেকে পুরোপুরিই আলাদা, তা বুঝিয়ে দিলেন।

বিলম্বিত মুখড়াটি আস্তে আস্তে, রাগটিকে সুগন্ধি বালাপোষের মতো পরতে পরতে খুলে দিচ্ছিল যখন, তখন মনে হচ্ছিল মধ্যপ্রদেশের গভীর সব জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে মাইকাল, বিন্ধ্য আর সাতপুরা পর্বতমালা থেকে নেমে আসা স্বচ্ছতোয়া কোনও নির্ঝরিণীই যেন নুড়ি-পাথরের ওপর দিয়ে এঁকে বেঁকে বয়ে যাচ্ছে কোনও সুন্দর বিকেলের নরম আলো মেখে।

তারপরে উস্তাদ আশরাফ আলি রাগটিকে যখন কোনও তন্বীর শরীরের বালুচরী শাড়ির আঁচলার মতো বিস্তার করতে লাগলেন এবং মধ্যলয়তানে পৌঁছে গেলেন তখন তা, অতি রায় তো বটেই সেই আসরে উপস্থিত অন্য প্রত্যেক রসিক শ্রোতাকেই পুরোপুরি মোহাবিষ্ট করে ফেলল। গমক তান আর স্বরগমের পিছু ধাওয়া করল ঋজু এবং স্বচ্ছ তানকারী।

আশরাফ আলির সঙ্গে সঙ্গতে ছিলেন পুনে থেকে আসা গিরিশ ওয়ালালকার এবং পরম ইদুরকার। তবলা আর হারমোনিয়মে।

ওই দুজনের সঙ্গত শুনে অতির মনে হয়েছিল মারাঠী সঙ্গতকারেরা গায়কের সঙ্গে যেমন করে সঙ্গত করেন, গায়কের অনুসারী হয়ে, প্রতিযোগী হয়ে নয়, তা দেখে অন্য অনেক জায়গার সাথ-সঙ্গতীয়াদের শেখা উচিত। গানকেই এঁরা মুখ্য করেন তাঁদের বাদ্যযন্ত্রকে গৌণ রেখে। কখনও গায়ককে ছাপিয়ে গিয়ে নিজেদের কেরামতি দেখাতে যান না। তার ফলে, গান-তবলা-হারমোনিয়ম এবং যখন সারেঙ্গী থাকে, সারেঙ্গীও মিলেমিশে একটি তীব্রগন্ধী সুষম গুলদস্তাঁ হয়ে ওঠে, ফুলের তোড়া। জোড়া তানপুরার ঝিনিঝিনি পেছন থেকে সুরের বাতাবরণ তৈরি

করে দেয়, রুপোর ঝালরের মতো। সেই তোড়ার কোনও ফুলই চিৎকার করে বলে না যে, আমাকে দেখো। এই যে, আমাকে দেখো।

আশরাফের গলার জাদুতে, তার গভীরতা, গাম্ভীর্য এবং মাধুর্য সেই বিকেলে শুদ্ধ কল্যাণ রাগটিকে শুধুমাত্র ভালত্বই নয়, এক চাকচিক্যময় গভীরতামণ্ডিত চমৎকারিত্বে উত্তীর্ণ করেছিল। গান যারা ভালবাসে, অতিরই মতো, তারাই জানে, চন্দ্রাহত হওয়ারই মতো, সঙ্গীতাহত হওয়াও কী মধুর এক মরণ।

রাগ তো এই জন্যই ধরে মিঠার ওপরে। রূপার ওপরে আরও বেশি ধরে। যে মেয়ে নিজে গাইয়ে, সে কী করে ওই ধড়িবাজ গান-ভালো না-বাসা "গোবিতা" আওড়ানো মানুষ এস. জে লাহিড়ীর খপ্পরে গিয়ে পড়ল। সংসারে বোধহয় এই রকমই হয়। নইলে কী আর বলে, বিউটি অ্যান্ড দ্য বিস্ট। লাহিড়ীর যেমন চেহারা। তেমনই হাব-ভাব।

এ কথা মনে হতেই অতি হেসে ফেলল মনে মনে। বলল, "যারে দেখতে নারি, তার চরণ বাঁকা।"

গোটা পাঁচ-ছয় রয়্যাল চ্যালেঞ্জ খেয়েছিল অতি। এর জন্য আশরাফ আলির গানের জাদুই দায়ী। আনন্দ যখন সীমাহীন হয়, তখন অনিয়মই নিয়ম হয়ে ওঠে। এবং তাতে দোষও হয় না কোনও।

বউদি বলেছিলেন, বৃষ্টি-ভেজা পথে মোটরসাইকেল চালিয়ে যাওয়ার দরকার নেই। যতীন মুখার্জিদের গাড়িতে চলে যাও।

অতি রাজি হয়নি। তুরীয় অবশ্যই হয়েছিল। কিন্তু মাতাল হয়নি। হয় না কখনওই। তাছাড়া, তুরীয় যতখানি গান শুনে হয়েছিল ততখানি মদ খেয়ে নয়। ভাল গান যখন তখন সর্বোত্তম মদকেও নেশাতে হারিয়ে দিতে পারে। আর রয়্যাল চ্যালেঞ্জ তো দিশি হুইস্কি, স্কচও নয়।

বউদিকে বলেছিল যে, একদিন রূপাকে আর মিঠাকে নিয়ে আসবে গান শুনতে। মনে মনে একটু ইচ্ছেও ছিল মিঠাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার যে, মিঠার সবচেয়ে বড় সাহেবের সঙ্গে আর তাঁর মেমসাহেবের সঙ্গে, অতির ঠিক কী ধরনের ঘনিষ্ঠতা।

আসলে, অগ্নিভদা মানুষটাই অমন। অফিসে একরকম, অফিসের বাইরে আর একরকম। পদাধিকার, অর্থ, ক্ষমতা এসবের কিছুই মানুষটাকে অমানুষ করে তুলতে পারেনি। তাই যদি পারত তবে কি আর গান বা সাহিত্যকে এমন করে ভালবাসতে পারে কেউ? তাছাড়া সব দোর্দণ্ডপ্রতাপ চাকুরেকেই যে, একদিন অবসর নিতেই হয়, আর অবসর নেওয়ার পরে তাঁর চাপরাশ আর কেউই বইতে রাজি থাকে না, শুধু মানুষের সম্মানটুকুই দিতে রাজি থাকে, এই সরল সত্যটা গদিতে আসীন থাকার সময়ে অনেক বড় চাকুরেই বোঝেন না। কিন্তু অগ্নিভদা বোঝেন। তাই তাঁর পদমর্যাদা তাঁর মনুষ্যত্বকে কখনও ছাপিয়ে যেতে পারেনি।

টিপটিপে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে নীগাহীতে তার কোয়ার্টারের দিকে মোটর-বাইক চালিয়ে যেতে যেতে, শুধ-সারংয়ের অনুষঙ্গে সুগন্ধি কোনও পরিযায়ী সারসের মতোই উড়ে যেতে যেতে অতি রায় দাঁতে দাঁত চেপে বলল, নাঃ, একটা হেস্ত-নেস্ত করতেই হবে।

ভাবে, প্রায়ই ভাবে যে, রূপাকে একেবারেই ভুলে যাবে। কিন্তু যেই তার সঙ্গে দেখা হয়, সে ভুলে যাওয়ার কথাটাই একেবারেই ভুলে যায়। তার মন কেবলি বলে যে, রূপাকে নইলে সে বাঁচবে না। তার জীবন বৃথা হয়ে যাবে। তার শয়নে-স্বপনে-জাগরণে রূপার মুখটি, রূপার ভাবনাটিই তাকে ঘিরে থাকে।

কী যে করবে, জানে না অতি।

অতির মনে পড়ে যায় দাগ সাহেবের সেই বিখ্যাত শায়রীটির কথা :

"এতো নহি কি তুমসা জাঁহামে হাসিন নহি
ইস দিলকা কেয়া করু কি বহলতা নেহি।"

অর্থাৎ তোমার চেয়ে সুন্দরী এ দুনিয়াতে আর কেউ নেই এমন তো নয়! কিন্তু করি কী? আমার হৃদয় যে অন্য কোথাওই নড়তে চায় না।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে জামা-কাপড় পরতে পরতে ঘড়ির দিকে তাকাল একবার অতি। ট্রান্সপোর্ট ম্যানেজারকে বলে রেখেছে, গাড়ি এসে যাবে ঠিক সময়েই। ট্রেন যদিও লেট করবে হয়তো, কিন্তু অনিশ রেনুকুটে আসেনি কখনও আগে। প্রথমবার আসছে, দেরী করে গেলে নার্ভাস হয়ে পড়বে হয়তো। তাছাড়া, অতির চোদ্দপুরুষের শ্রাদ্ধও সম্পন্ন করবে।

রেডিওতে সুবিনয় রায়ের রবীন্দ্রসঙ্গীত হচ্ছিল। অতি শুনেছে যে, ওঁর শরীর ভাল নেই। হয়ত আর্কাইভের রেকর্ড বাজছে।

জিনসের ওপরে রিবকের হালকা হলুদ গেঞ্জিটা গলাতে গলাতে ভাবছিল, কলকাতাতে সেই রাতে ওয়ালডর্ফে চাইনিজ খেতে খেতে অনিশ যা বলছিল তাই হয়তো সত্যি হবে একদিন।

কলকাতাতে অনিশ বলছিল যে, ছেলেমেয়েরা আর রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখবে না, ভাল কবিতা পড়বে না, লাহিড়ী অ্যান্ড কোম্পানির "গোবিতা" নয়, আবৃত্তিও করবে না এমন একটা সময় শিগগিরি আসছে। রবীন্দ্রসঙ্গীত যে সব শিক্ষায়তনে শেখানো হয় সেই সব সংস্কৃতিসম্পন্নতার ভেক-ধরা ব্যবসাদার মালিকরা সেই সব শিক্ষায়তন তুলে দিয়ে কম্প্যুটার সেন্টার খুলে ফেলবেন হয়ত। কুইক-মানির জন্যে মুরগির ঠ্যাং বা ব্যাঙের ঠ্যাঙের ব্যবসায়ীর মতো দেশে দেশে ফ্র্যাঞ্চাইজি নিয়োগ করবেন যাতে তেলকল সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। রবীন্দ্র-সংস্কৃতি বা রবীন্দ্র-মনস্কতা তাঁদের থাক আর নাই থাক, আরও টাকা, ঘন ঘন "ফোরেন" ট্যুর তো নিশ্চিত হবে। টাকাই এখন সব, সমস্ত। ভাল খাওয়া, ভাল পরা, ভাল ফ্ল্যাটে থাকা, নতুন মডেলের ঝিং-চ্যাক গাড়ি

চড়াই এখন বেঁচে থাকার চরম ও পরম উৎকর্ষ হয়ে উঠেছে। কম্প্যুটার সায়ান্স, ইনফরমেশন টেকনোলজি, সায়েন্সের নানা শাখার ছটায় পৃথিবী এখন রীতিমতো ছটফট করছে। টাকা, কে, কীভাবে রোজগার করছে, কোন মানুষের intrinsic value কতটুকু, তা নিয়ে কারওই মাথাব্যথা নেই। ট্যাক্স দেওয়া টাকা আর ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া টাকার মধ্যেও কোনোরকম তফাত নেই। টাকার রং যাই হোক, টাকা আসলেই হল। আর্টস, ক্রিয়েটিভিটি, সাহিত্য, সঙ্গীত, কাব্য এস্যব কিছুই অবান্তর হয়ে যাবে অচিরে। ছবিও আঁকবে কম্প্যুটার। কম্প্যুটারাইজড মানুষ খাবে, পরবে, ইলেকট্রিক টুথব্রাশে দাঁত মাজবে, শেভারে দাড়ি কামাবে, একদিন হয়ত কম্প্যুটারাইজড শৃঙ্গারও করবে মানুষের চেহারার মানুষ-মানুষী রমণ করার আগে। "সময় কোথা সময়, নষ্ট করবার?" ধনঞ্জয় বৈরাগীদের দিন শেষ। এখন বিভূতিদের জয় জয়কার—নমঃ যন্ত্র, নমঃ যন্ত্র নমঃ। এত সময় যে বাঁচিয়ে ফেলবে মানুষ, সেই উদ্‌বৃত্ত সময় নিয়ে সে করবেটা কী? আরও টাকা রোজগার করবে? আরও আরামে থাকবে? হায়! হায়! হতভাগা মানুষেরা আরামকে আনন্দর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছে।

বাইরে হর্ন শোনা গেল গাড়ির। চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল অতির মাথার মধ্যে। মিনারেল ওয়াটারের খালি বোতলে জল থাকে ফ্রিজে। একটা বোতল বের করে নিয়ে উঠে বসল গিয়ে গাড়িতে। এই ড্রাইভারকে চেনে না অতি। নতুন এসেছে হয়ত। অথবা বদলির কাজ করছে। সবাইকেই যে চিনতে হবে তারই বা কী মানে আছে।

শক্তিপুঞ্জ এক্সপ্রেস আজ সময় মতোই এসে গেল। সেকেন্ড ক্লাস টু-টায়ার এসি কোচ আছে একটি মাত্র। তার বদলে ফার্স্ট ক্লাস এসি-র চার বার্থের একটি কামরা আর বাকি জায়গাতে থ্রিটায়ার করে দিলে রেনুকুট এবং সিঙ্গরাউলির সকলেরই উপকার হয়। দু জায়গার সকলে মিলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে একটি দরখাস্ত মুসাবিদা করছে।

অতি ভাবছিল, অনিশ ঠিক করেই রেখেছিল যে অনিশ এলে দরখাস্তটা একবার দেখিয়ে নেবে।

ট্রেন থেকে নেমেই অনিশকে জড়িয়ে ধরে অতি বলল, এলি তাহলে। অ্যাট লাস্ট।

বেটার লেট দ্যান নেভার।

বলল, অনিশ।

শক্তিপুঞ্জ অ্যাটেন্ড করতে লাহিড়ীও গেছিল। কলকাতা থেকে তার এক বন্ধু এলেন। স্ট্যাটুটরি অডিটরের অফিসের লোক। অবভিয়াসলি চার্টার্ড অ্যাকউন্ট্যান্ট। ডিপার্টমেন্টের লোকজন এবং ফিন্যান্স ডিপার্টমেন্টের গাড়িও এসেছিল। লাহিড়ী তো মেকানিক্যাল ডিভিশনের লোক। অডিটরদের সবজায়গাতেই খাতির প্রতিপত্তি থাকেই। হিন্দালকোর অডিটরদেরও প্রতাপ কিছু কম না, দেখেছে অতি, রেনুকুটে। তবে নর্দার্ন কোলফিল্ডস যে-সে পাবলিক সেক্টর কোম্পানি তো নয়। মিলেনিয়ামের মার্চ-এ যে ফিনান্সিয়াল ইয়ার শেষ হল তাতে নর্দার্ন কোলফিল্ডস প্রফিট করেছে ন'শো তিরাশি কোটি টাকা। সে কোম্পানির অডিটরের তো কিঞ্চিৎ খাতির-প্রতিপত্তি থাকবেই।

লাহিড়ী আলাপ করিয়ে দিল চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট প্রযত পালের সঙ্গে। অধিকাংশ অ্যাকাউন্ট্যান্টরাই যেমন হন, তেমনই আর কী। মাথা ভর্তি ফিগার কচকচ করছে। এঁদের মাথা চিবিয়ে খেয়ে দেখতে পারলে বুঝতে পারত অতি, মাথার স্বাদ কী প্রকার। যদিও ইদানীং অন্যরকম অনেক অ্যাকাউন্ট্যান্টও দেখা যাচ্ছে। আজকাল অবশ্য কম্প্যুটারই মুখস্তবিদ্যার ভার নিয়েছে, মানুষ শুধুই ফোপরদালালি করে বেড়ায়। মানুষ ক্রমশই এতটাই যন্ত্রনির্ভর হয়ে যাচ্ছে সব ব্যাপারেই, শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তার ভাবনা-চিন্তা এখনই শুরু করা উচিত।

এসব চিন্তা মনে এলেই হাসি পায় অতির নিজেরই। যে অতি নয়, অতিকায় এবং যে ড্র্যাগ লাইন অপারেটর পুরোপুরি যন্ত্রনির্ভর, মেঘের রাজ্যে বসে বোতাম টিপে টিপে সে হাজার হাজার টন কয়লা ডাম্পারের গহ্বরে লাদাই করে তার এই রকম যন্ত্রবিদ্বেষ বা বিজ্ঞান বিরোধিতার কথা যে-কেউই শুনবে, হাসবে অবশ্যই।

যেহেতু লাহিড়ীকে পছন্দ করে না অতি, তার বন্ধুকেও করল না। যদিও আনিশের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল ওদের দুজনেরই। তারপর বলল, সেদিন কবিতা পাঠের আসর কেমন হল আপনাদের?

যেমন হয়। দারুণ।

দু'দিকে দু'হাত তুলে মহা মাতব্বরের মতো বলল লাহিড়ী।

আপনি তো এলেন না মশাই। বড় ঘরকুনো আছেন আপনি।

অতি ভাবছিল, আজকালকার অনেক মানুষেরই সপ্রতিভতা বগলতলিতে জমে থাকে সম্ভবত। কথা বলার সময়ে সমানে দু'হাত নাড়িয়ে কথা না বললে তবেই সেই সপ্রতিভতা গলগল করে লিউপোসাকশন করা চর্বির মতো গলে বেরোতে থাকে।

আবার বলল লাহিড়ী, না গিয়ে খুবই মিস করলেন।

আমি তো অগ্নিভদার বাড়ি গান শুনতে গেছিলাম। মিঠারও যাওয়ার কথা ছিল। পাক্কা একটি ঘণ্টা পথে দাঁড় করিয়ে রেখে আমাকে ঢপ দিল। আপনি সেখানে গেলে বুঝতে পারতেন আপনিই বেশি মিস করলেন না, আমি।

লাহিড়ী বলল, ও হ্যাঁ, বলছিল বটে। কোন আলি না খান যেন গান গাইতে এসেছেন ভোপাল থেকে। তা মিঠাকে তো আমিই তুলে নিয়ে গেলাম। রূপাও তো গেছিল। গানও গাইল।

কে?

রূপা, আবার কে? মিঠা গান গায় বলে তো আমি শুনিনি কখনও।

তাই? রূপা গেছিল?

অতি, মিঠার প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে বলল।

অবশ্যই গেছিল।

ঈর্ষাতে বুক জ্বলে গেলেও অদৃশ্য অ্যান্ট্যাসিড খেয়ে জ্বলন নিভিয়ে অতি ছদ্ম-উদাসীনতার সঙ্গে বলল, গানটা রূপা বেশ ভালই গায়।

লাহিড়ী আবার কাটা ঘায়ে নুন ছিটিয়ে বলল, আগে আমার কখনও রূপার গান শোনার সৌভাগ্য হয়নি। সকলের সামনে তো গায়ও না। গানের ব্যাপারে খুবই চুজি রূপা। খুবই।

কী জানি! যে অতজন কবিতা-লেখা মোদো-মাতালদের জমায়েতেও অবলীলাতে গান গাইতে পারে তার যে খুব বাছ-বিচার আছে, তা বলি কী করে।

অতি বলল।

লাহিড়ী রেনুকুট স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম থেকে বাইরে যাওয়ার মন্দিরের সিঁড়ির মতো উঁচু সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে অতির বাক্যবন্ধতে বারে বারে বন্দুকের চার-নম্বর ছর্‌রা গুলি খাওয়া খ্যাঁকশেয়ালের মতো আহত হল। কিন্তু মুখে কিছু বলল না। একজন ড্র্যাগ-লাইন অপারেটর সুপারেনটেনডিং ইঞ্জিনিয়ার কাম স্থানীয় প্রথম সারির কবি লাহিড়ীকে অমন করে পাঁচজনের সামনে যে শান্টিং করতে পারে তা সে সম্ভবত ভাবতেও পারেনি।

অতি মনে মনে বলল, সুপারেনটেনডিং ইঞ্জিনিয়ার তো কী, আমি ওভার টাইম ইত্যাদি নিয়ে যা পাই তা তো প্রায় সিএমডি'র বেসিক পে-র সমান। খাতির কীসের মশাই তোমাকে।

অনিশ বলল, বাবাঃ! এ যে দেখছি স্বর্গের সিঁড়ি রে একেবারে। তোদের এখানে বুঝি খারাপ মানুষ একজনও নেই?

অতি উত্তর দিল না, অনিশের কথার। সাতসকালে লাহিড়ীর সঙ্গে এনকাউন্টার হওয়াতে মনটা বিগড়ে গেছিল। আজেবাজে মানুষের সঙ্গে সকালে দেখা হলে দিনটাই খারাপ হয়ে যায়। শুধু মুখে বলল, অনি, তুই পাঁঠার মাংস খাস তো? এখানে ইন্টেলিজেন্ট মুরগি অঢেল কিন্তু বোকা পাঁঠা পাওয়া দুষ্কর। আজকে জয়ন্ত্‌-এর হাটে পাঁঠা কেটেছিল। তাই তোর জন্যে নিজে গিয়ে নিয়ে এলাম সকালে। স্বাদ কিন্তু ভালই, আমাদের কয়লা খাদানের পাঁঠাদের।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে অনিশ বলল, এ যে দেখছি বিহারের গোমো-বারকাকানা লাইনে চিপাদোহর বলে একটা স্টেশন আছে, দু'পাশের কাটা পাহাড়ের মধ্যে, তারই মতো সিঁড়ি। গেছিস কখনও?

আরে এই শক্তিপুঞ্জ এক্সপ্রেস তো ওই পথ দিয়েই আসে। রাতের বেলা বলে খেয়াল করিসনি হয়ত। তাছাড়া, এ. সি. কোচের কালো

কাঁচের জানালা দিয়ে বাইরেটা ভাল করে তো দেখাও যায় না। গোমো থেকে বারকাকানার পথেই তো আসে ওই ট্রেন। তারপর বলল, বোকারো, গুমিয়া, ম্যাকলাস্কিগঞ্জ, চৈটর, রিচুঘুটা, মহুয়ামিলন, চাঁন্দেয়া-টোড়ি, লাতেহার, চিপাদোহর, ডালটনগঞ্জ হয়ে চলে যায় চোপান। এমনি এমনি কি এর নাম শক্তিপুঞ্জ এক্সপ্রেস? কয়লা খাদান, এক্সপ্লোসিভস-এর ফ্যাক্টরি, লাইমস্টোন কোলিয়ারি, তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, এ সবের বুকের ওপর দিয়েই তো এর যাতায়াত।

অতি বলল, তাই বুঝি। তা এসব তো বাইরেরই উত্তাপ। হৃদয়ের উত্তাপ বুঝি উত্তাপের মধ্যে গণ্য নয়?

মানে?

একটু অবাক হয়েই বলল অতি।

'একটু উষ্ণতার জন্যে' এবং 'কোয়েলের কাছে'র পটভূমির ওপর দিয়েও তো আসে তাহলে এই ট্রেন?

এবারে বুঝতে পেরে অতি বলল, শুধু তাই বা কেন? 'মহুয়ামিলন'? 'বাসনাকুসুম' উপন্যাসের পটভূমির ওপর দিয়েও আসে।

'বাসনাকুসুম' তো আমি পড়িনি।

দুঃখ নেই। আমার বাড়িতেই আছে। আজই ইচ্ছে করলে পড়তে পারিস।

সিঁড়ির পর সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে অ্যাম্ব্যাসাডর গাড়ির বুটে ওর ব্যাগ দু'টো রেখে পেছনের সীটে যখন ওরা উঠে বসল, দাড়িওয়ালা সাদা উর্দিপরা ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট করে অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিল। প্রথমেই বেশ জোরে। স্বল্পক্ষণ পরেই জঙ্গলেঘেরা পাহাড়ী এলাকার মধ্যে দিয়ে জোরে ছুটতে লাগল গাড়ি। পথের বাঁদিকে সাঁ করে একটি জলাভূমি সরে গেল।

একি! এতো জোরে গাড়ি চালালে কিছু দেখা তো যায়ই না নতুন জায়গার, উপরন্তু টেনসানও হয়, অথচ অন্যর গাড়ির ড্রাইভারকে কিছু বলাও যায় না। নেহরু সাহেব যে 'তুম' নেহি 'আপ' সংস্কৃতি চালু করে দিয়ে গেছেন তারপর থেকে সরকারি আধাসরকারি সংস্থাতে সকলেই

'আপ'। অথচ আপ সম্বোধন করলেই যে সম্মানজ্ঞাপন হয় না, আপ-এর সঙ্গে হারামজাদাও যে সহজে সহাবস্থান করতে পারে এটা কেন যে ওঁর মাথাতে আসেনি তা কে জানে! 'তুই' বলেও যে অনেক ভালবাসা যায় কারোকে এসব সোজা অঙ্ক বড় বড় মানুষের মাথায় ঢোকে না। ইংরেজিতে 'তুমি' বা 'তুইয়ের বলাই নেই। সকলেই আপনি। অন্যদের অনুসরণ করতে গিয়ে আমাদের ভারতীয়ত্বর নানা রকমকে নষ্ট করার কোনও মানে ছিল বলে মনে হয় না।

ভাবছিল অনিশ।

অতি ভাবছিল, অনিশের ঔৎসুক্য অপরিসীম। প্রায় কিন্ডারগার্টেনে-পড়া কোনও শিশুরই মতো। এটা কোন জায়গা? ওই কারখানাটা ক্বীসের? বাঁদিকের পথটা কোথায় চলে গেল? এ গাছটা কী গাছ? ওই নালাটার কী নাম? ইত্যাদি নানা প্রশ্ন ক্রমান্বয়ে করে অতিকে ও ব্যতিব্যস্তই করে তুলল।

অনিশ বলল, মধ্যপ্রদেশের সঙ্গে বিহার আর উত্তরপ্রদেশের খুব একটা তফাত নেই রে দেখছি। আমি এই প্রথমবার এলাম তো মধ্যপ্রদেশে। বুঝলি অতি।

অতি হেসে বলল, আমরা কিন্তু এখনও উত্তরপ্রদেশেই আছি। আরও কিছুটা গিয়ে তবেই পড়ব মধ্যপ্রদেশে। আমাদের সিঙ্গরাউলি বলতে গেলে, উত্তরপ্রদেশ আর মধ্যপ্রদেশের সীমানাতেই। তবে তফাত যে একবারেই নেই তা নয়। ভাল করে এই সবক'টি প্রদেশই যাঁরা ঘুরেছেন তাঁদের চোখে তফাত ঠিকই ধরা পড়ে। আমাদের চোখে হয়ত পড়ে না। তারপরই বলল, উত্তরপ্রদেশ সরকারের একটা থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট আছে রেনুকুটের কাছেই। আর সিঙ্গরাউলির কাছেও আছে একটা, শক্তিনগরে।

রিহান্ড ড্যাম কি শুধু সেচেরই জন্যে। এখানে জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় না?

ব্ল্যাক-ডায়মন্ডের সিংহাসনে বসে জল-বিদ্যুতের কথা ভাবে কে বল? অতি বলল।

রিহান্ড ড্যামের রিসার্ভারের নাম কি? দেখাবি না একদিন?

দেখাবো দেখাবো। সেই ড্যামের নামই তো রেনুসাগর। আমার মনে হয়, আগেও হ্রদ মতো ছিল হয়তো একটা, এখন বাঁধের জল জমে সাগর হয়েছে। অবশ্য যা মনে হয়, তা ভুলও হতে পারে।

মাছ পাওয়া যায় নিশ্চয়ই বড় বড়, রেনুসাগরে?

তা তো যায়ই। শুধু মাছই কেন? ছোট বড় কচ্ছপ, পূর্ববঙ্গীয়রা যাকে বলেন কাউঠ্যা বা কাছিম তাও পাওয়া যায়। খাস তুই? কাউঠ্যা?

খাই না আবার! কিন্তু মানেকা গান্ধী জানলে তো জেলে পুরে দেবে।

তা দেবে। বজ্র আঁটুনি, ফস্কা গেরো। আরে একি অলিভ রিডলি? খাওয়ার জিনিস খাবনি? কাউঠ্যার পিঠ কচকচ করে খেতে যা ভাল লাগে না। ভাল করে প্যাঁজ রসুন তেল ঝাল দিয়ে রাঁধলে এক থালা ভাত খেতে পারি তা দিয়ে।

তুই শালা বাঙাল মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে একেবারে বাঙালই হয়ে গেছিস। যাই বলিস আর তাই বলিস, বাঙালদের খুব প্রাণ আছে। প্যাঁজ রসুন তেল-ঝালের একটু আধিক্য আছে বটে কিন্তু রান্না কিছু জানে ওরা।

ভাগ। অনিশ বলল।

বড় অপচয় করে বাঙালরা। বড় বেশি চেঁচিয়ে কথা বলে।

তা আর কী করবে! ফাঁকা জায়গাতে থাকা অভ্যেস ছিল, নদীর এপারে দাঁড়িয়ে ওপারে কথা বলত। অভ্যেসই ওরকম হয়ে গেছে। আমি শুনেছি, বরিশালে কেউ গন্ধরাজ লেবু চিপে খেতো না। কাঠের বারকোষে পঞ্চাশটা লেবু কেটে রেখে দেওয়া হতো, যেখানে মেঝেতে বসে সকলে পংক্তিভোজন করছেন। আর সেই গন্ধে গন্ধে ভাত খেতেন সকলে। প্রাচুর্য ছিল, তাই অপচয় করেছেন। হ্যাবিটস ডাই হার্ড।

হ্যাবিটস কত পুরুষ পর্যন্ত চলে?

কে বলতে পারে তা? জিনের কারবার। ইট রানস ইন দ্য ব্লাড।

নেহরু সাহেব আর জিন্নাসাহেব তড়িঘড়ি রাজা হবেন বলে যে পূর্ববঙ্গ আর পশ্চিম পঞ্জাবের ও সিন্ধের লক্ষ লক্ষ মন্যুষকে ভিটেমাটি থেকে উৎপাটিত করলেন তার জন্যে সেই হতভাগ্যদের দোষ কী? যারা দেশ

ভাগ করল তাদের শূলে চড়ানো উচিত ছিল। সব চেয়ে অবাক লাগে দেখে যে, নাথুরাম গডসে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে মারল, কেউ মারল না নেহরু আর জিন্নাকে। সত্যই সেলুকাস। বিচিত্র এই দেশ।

কী যে বলিস তুই, শালা! বাঙাল মেয়ের ব্যর্থ প্রেমিক। শ্যামাপ্রসাদ মুখুজ্যে পর্যন্ত অপাংক্তেয় এখন পশ্চিমবঙ্গের 'শিক্ষিত' বাঙালিদের কাছে। সেই 'বিকৃত মানসিকতা'র মানুষের স্মরণ-সভায় যেতে বাঙালির 'সুরুচি'তে বাধে। সেই বিদ্বান, মেধাবী, দেশপ্রেমী মানুষটির, নেহরুর কৃপাধন্য, ফারুক আবদুল্লার বাবা শেখ আবদুল্লার জমানায় নেহরুর ষড়যন্ত্রে কাশ্মীরের জেলে রহস্যজনক মৃত্যু হল, তাকে তাঁর শতবার্ষিকীতে স্মরণ করতেও 'শিক্ষিত', 'আঁতেল' বাঙালির লজ্জা হল। শাল্লা। "লজ্জা" শব্দটাই এই ভেকধারী, আত্মমর্যাদাহীন অতিচালাক নপুংসক হিন্দু বাঙালিদের অভিধান থেকেই মুছে দিতে ইচ্ছে করে আমার। যেদিন ভারতবর্ষ থেকেও পেছনে লাথি খেয়ে আমাদের উদ্বাস্তু হতে হবে সেদিনের কি দেরি আছে খুব?

ঠিক আছে। প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া যাক। তুই এত সহজে যে এরকম উত্তেজিত হয়ে পড়িস, তা তো আগে জানতাম না!

উদ্বাস্তু হয়ে যাবিটাই বা কোথায়? হিন্দুদের যাবার জায়গা তো আর একটাও নেই। যাবি কোন চুলোয়? অনেক দৌড়াদৌড়ি হয়েছে। মরার চেয়ে বাঁচা তো ভাল। তার চেয়ে পরভীন সুলতানার স্বামী, সরোদীয়া বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর অনুজের মতো, অথবা জীবনমুখী সুমন চট্টোপাধ্যায়ের মতো মুসলমান হয়ে, নাম বদলে মুসলমান মেয়ে বিয়ে করে সুখে থাকবি। এই পৃথিবীতে যশ, চরিত্র অভিজাত্য সব বোগাস। সুখে থাকাটাই এখন মুখ্য ব্যাপার, যেন-তেন-প্রকারেণ। আর টাকা, অঢেল টাকা। টাকার চেয়ে বড় বন্ধু, বড় উকিল, বড় বিচারক আর দ্বিতীয় নেই।

মানুষ কি চিরদিনই একই রকম থাকে? না থাকা উচিত? পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি, মানুষের অশেষ স্বার্থপরতা, দূরদৃষ্টিহীনতা, অপার উদাসীনতা মানুষকে বদলে দেয়ই।

তুই একটা উদো।

অতি বলল, এই দ্যাখ, বাঁদিকে শক্তিনগর। ওই যে থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট।

তাই?

কিছুক্ষণ পরে একটা মোড়ে এসে পৌঁছল গাড়ি। পথের মধ্যে এবং দু'পাশে বাজার বসেছে। বেশিই সব্জি।

এই বাজারের নাম কী?

বাজার তো নয়। পথের মোড়ে নানা তরি-তরকারি, আণ্ডা-মোরগা সব নিয়ে বাজার বসায় সকলের সুবিধার জন্যে।

এই মোড়টার নাম কী?

এর নাম ওড়ি মোড়। শক্তিনগর থেকে তিন কিমি। আর বেশি দূর নেই। প্রায় এসে গেছি।

তোর বাড়ি?

আরে না রে। আমার বাড়ি এখান থেকে আরও মিনিট পঁয়ত্রিশের ড্রাইভ। এসে যাব এবারে সিঙ্গরাউলিতে। নর্দার্ন কোলফিল্ডসের হেড কোয়ার্টার। খাদান এখানে নেই। এখানে সি. এম. ডি-র অফিস, ডিরেক্টরদের অফিস, গেস্ট হাউস, সি. এম. ডি. আর ডিরেক্টরদের বাংলো। এই সিঙ্গরাউলিই হচ্ছে নর্দার্ন কোলফিল্ডসের হৃৎপিণ্ড।

তা কোলিয়ারি সব কোথায়?

কাছাকাছিই। কোলিয়ারির পাশে পাশেই এক একটা জনপদ। বাজার, কো-অপ, স্কুল, ক্লাব, মহিলা সমিতি, স্টাফ-কোয়ার্টার, ওয়ার্কাস কোয়ার্টার। সিএমডি-র স্ত্রীই মহিলা সমিতির চেয়ারম্যান।

সিএমডি এখন কে?

ফর আ চেঞ্জ, বাঙালি, শ্রী এস কে সেন। ফিন্যান্স ডিরেক্টরও বাঙালি, শ্রী এ. কে. দাস। এখন কোল ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যানও একজন বাঙালি শ্রী এস. কে. সেনগুপ্ত। তোকে সম্ভবত বলেও ছিলাম কলকাতাতে। এর পরে হবেন পার্থ ভট্টাচার্য।

বলিস কীরে! কোন শালা বলে যে, বাঙালির কিসসু হবে না।

হ্যাঁ। নিজচোখে দ্যাখো, হয়েছে।

ক'টা কোলিয়ারি আছে তোদের?

আটটা।

আটটা? তাই? কী? কী?

হ্যাঁ। বীণা, কাকড়ি, খেদিয়া, দুধিচুয়া, নীগাহিঁ, জয়ন্ত, আমলোরি, ঝিঙ্গুরদা। তারপর বলল, নেহরু সাহেবের পেয়ারের মন্ত্রী ছিলেন জয়ন্ত কুমারমঙ্গলম্। তিনি যখন কয়লামন্ত্রী ছিলেন তখনই পত্তন হয় নর্দার্ন কোলফিল্ডসের।

আগে তো এন. সি. ডি. সি নাম ছিল না? ন্যাশনাল কোল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন?

সে তো স্বাধীনতার পর পর। তারপর হল কোল ইন্ডিয়া। নর্দার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড কোল ইন্ডিয়ারই হান্ড্রেড পার্সেন্ট সাবসিডিয়ারি। যেমন সেন্ট্রাল কোলফিল্ডস লিমিটেড, সাউথ ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড, মহানদী কোলফিল্ডস লিমিটেড, তারপর ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড, ভারত কোকিং কোল লিমিটেড আরও কত আছে।

তারপর বলল, ইসস্। যে গল্প তোকে বলতে বসেছিলাম তাই সব গোলমাল হয়ে গেল। কুমারমঙ্গলম্ যেহেতু কেন্দ্রীয় কয়লামন্ত্রী ছিলেন সেহেতু নর্দার্ন কোলফিল্ডসের খাদানের একটির নাম রাখলেন তাঁর নিজের নামে, জয়ন্ত। স্ত্রীর নামেও নাম রাখলেন আরেকটার। বীণা।

বাঃ দাম্পত্য প্রেমের কী দারুণ প্রকাশ। একেই তো বলে গণতন্ত্র।

তা রাখবেন বইকী। রাজা-মহারাজা-রাজন্যদের উৎখাত করার পরে ওঁরাই তো তারপরে রাজা মহারাজা হলেন। অটলবিহারী বাজপেয়ীর রকম সকম গোড়া থেকেই একটু অন্যরকম মনে হচ্ছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি যদি বজায় থাকে, তবে হয়ত অবস্থা কিছু পাল্টাবে।

তোদের নীগাহিঁ আর কতদূর?

সামনে যে পথটা দেখছিস সেটা চলে গেছে আনপাড়ার দিকে। আনপাড়া ছাড়িয়ে কাকড়ি, বীণা, খেদিয়া, জয়ন্ত হয়ে একটা পথ চলে

গেছে নীগাহিঁ। তাতে গেলে ঘুর পড়বে বলে আমরা সিঙ্গরাউলি থেকে যে একটা শর্টকার্ট আছে জয়ন্ত্-এ যাবার, সেটা ধরেই নীগাহিঁতে পৌঁছব।

নীগাহিঁ। ভারি চমৎকার নাম তো।

নীগাহিঁ শব্দটার মানে জানিস?

কী?

চোখ। 'নীগাহিঁ যায়ে কাঁহা সীনেসে উঠকর?

হুঁয়াই তো হুসনকি দৌলত গড়ি হ্যায়।'

শায়রীটা শুনেই ড্রাইভার একবার মুখ ফিরিয়ে পিছনে তাকাল।

মানে কী?

অনিশ জিজ্ঞেস করল।

মানে হল, সুন্দরীদের বুক ছেড়ে চোখ আর অন্য কোথাওই যেতে চায় না। খুদা তাদের সব সৌন্দর্য তো ওইখানেই গড়ে রেখেছেন।

তুই একটা আস্ত...

বলেই, ড্রাইভারকে দেখাল তর্জনী তুলে।

অতি বলল, চল্তা হ্যায়।

চল। যেখানে নিয়ে যাবি যেতে হবে। পড়েছি যবনের হাতে খানা খেতে হবে সাথে।

বলেই বলল, তা তোর প্রাণের বন্ধু লাহিড়ীর বাড়ি কোথায়?

আমলোরিতে।

আর তোর হার্টথ্রব? রূপা না কে?

অতি বলল, ইয়ার্কি করিস না।

ঠিক আছে। হার্টথ্রব নয়, হার্ট-বার্ন। সে কোথায় থাকে বল না?

নীগাহিঁতেই।

বাঃ। কেসটা জমিয়ে দিয়ে যাব আমি। দেখিস।

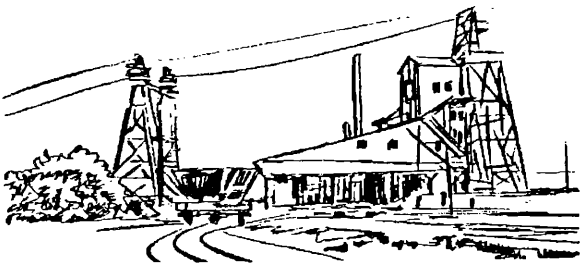

বছর পনেরো-ষোলো বয়সের একটি সপ্রতিভ ছেলে দেখাশোনা করে অতির। রান্না-বান্না, ঘরদোর পরিষ্কার, কাপড়-কাচা, ইস্ত্রি করা সব কিছু। নাম ছুটকু।

দুপুরে খেতে বসে অতি বলল, পরশু তোর জন্যে গ্র্যান্ড পিকনিক-এর আয়োজন করেছি। একটা জিপ আর দু'টো গাড়ি যাবে। বিশ্বজিৎদা দারুণ অর্গানাইজার। উনিও সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার। উনিও যদি কবিতা-টবিতা লেখেন, তবে সবজান্তা লাহিড়ীর মতো নন।

সবজান্তা লাহিড়ীর নামই কি সবজান্তা?

না, তা নয়। তার ইনিশিয়ালস এস. জে। অর্থাৎ সর্বজয়। আমরা কেউ কেউ তার পিতৃ-মাতৃ দত্ত নামটি বদলে দিয়ে সবজান্তা করে দিয়েছি।

তারপর বলল, কেন তাকে স্টেশনে দেখে মনে হলো না কি যে, নামটা যথার্থ হয়েছে?

তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে, কবিতা-চবিতা লেখা যেন পাপ কর্ম বিশেষ।

কবিতা যদি কবিতা হয় তবে পাপ কর্ম নয়, কিন্তু কবিতার নামে যা-কিছুই লিখলে তা তো সহ্য করা যায় না। এদের এই সব তথাকথিত কবিতা, না শ্রুতিমধুর, না মর্মস্পর্শী না অর্থবাহী। সৈয়দ মুজতবা সাহেবের পণ্ডিতমশায়ের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় 'এসব গর্ভস্রাব'।

ছিঃ। কী ভাষা।

তা কী করব। কবিতা যেমন, তার অ্যাপ্রিসিয়েশনও তো তেমনই হবে।

কোথায়? তোদের পিকনিক এই গরমে?

গরম কোথায়? বৃষ্টি তো হয়েই যাচ্ছে। তা ঠাণ্ডাতে পিকনিকে যেতে হলে থেকে যা মাস ছয়েক। ডিসেম্বরে তোকে ব্যয়রান ঘুরিয়ে দেখাব ভাল করে।

ব্যয়রান মানে?

ব্যয়রান একটা অঞ্চলের নাম। আন্দামানকে যেমন কালাপানি বলে, ব্যয়রান হচ্ছে, অন্তত ছিল, এই অঞ্চলের কালাপানি। রেওয়ার রাজা যেসব আসামীদের ভালমতো "টাইট" করতে চাইতেন, তাদের পেয়াদাদের সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়ে দিতেন এই ব্যয়রান অঞ্চলে। ওই অঞ্চলে শুধু দুর্গম, নিবিড় জঙ্গল। সুউচ্চ পাহাড়শ্রেণির বলয়ের পর বলয়। মাইলের পর মাইল। না আছে ওই অঞ্চলে পথঘাট, না মানুষের বাসযোগ্য অন্য কোনও সুখ-সুবিধা। ভয়ানক খতরনাক সব বন্যজন্তুর বাসভূমি। এখানে মানুষের পানীয় জল পর্যন্ত নেই। যেসব পাহাড়ী নালা আছে, তার জল জন্তু-জানোয়ারে খেতে পারে বটে, মানুষে খেলে আর দেখতে হবে না। ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর ইত্যাদি যত প্রাণঘাতী রোগ আছে সবেই আক্রান্ত হতে হবে।

তাই?

ইয়েস।

এইখানেই এনে আসামীদের মুক্ত করে ছেড়ে দিয়ে চলে যেত রাজার পেয়াদারা। তারপর সেই সব আসামীরা প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে যতদিন বাঁচতে পারে বাঁচত। এখানে বাঁচতে পারত না কেউই। যদি কেউ বাঁচত, তবে হয় পঙ্গু হয়ে থাকত, নয় দুর্ধর্ষ ডাকাত। যারা বাঁচত তাদের জীবনীশক্তি, সাহস এবং বাঁচার অদম্য জেদের কাছে রাজাকেও মাথা নোয়াতে হতো মনে মনে। রাজারা অবশ্য প্রকাশ্যে কারও কাছেই মাথা নোয়ান না, কোনওরকম রাজারাই নন।

এই ব্যয়রানওতো প্রকৃতি, এই না নানা লেখকের লেখাতে পড়ি যে, প্রকৃতি আমাদের মা, দ্বিতীয় মা।

হ্যাঁ তা পড়ি। কিন্তু ব্যয়রানের "প্রকৃতি" মানুষের সৎ-মা। সতীনের ছেলের মতো ব্যবহার তাঁর সব মানুষেরই সঙ্গে।

বলিশ কী রে অতি! এতো অদ্ভুত মায়ের কথা শোনালি তুই।

তারপরই বলল, আচ্ছা রেওয়া, না কি জায়গাটার কথা তুই বললি, নামটা যেন চেনা চেনা লাগছে।

লাগবেই তো!

যে রেওয়া মধ্যপ্রদেশের এক নাম করা করদ রাজ্য ছিল। সেই রেওয়ার রাজার কথাই তো বলছি। সাদা বাঘ পালন করে তিনি পৃথিবী বিখ্যাত হয়েছেন না!

ও তাই তো! মনে পড়েছে।

আচ্ছা এই সাদা বাঘ আর অ্যালবিনো বাঘ কি এক?

এই রে! আমি কি বাঘ বিশারদ? এখানে, মানে নীগাহিঁতেই অ্যাডিশনাল ডি. এফ. ও আছেন সুরিবালি সিং সাহেব। তাঁর সঙ্গে তোর আলাপ করিয়ে দেব। উনি বললেও বলতে পারেন। তবে ইংরেজি 'Albino' তো জানি শরীরের Pigmentation-এর গোলমালে হয়। শুধু বাঘই নয়, Albino পাখি, যেমন কাক এবং অন্য প্রাণীও হয়, মানুষের মধ্যে যেমন শ্বেতী হয় না? তেমনই। এ কোনও রোগ ঠিক নয়, ভয়াবহ রোগ তো নয়ই; একধরনের Disorder. Pigmentation-এর।

অনিশ বলল, মুড়িঘন্ট দিয়ে ভাত মেখে খেতে খেতে, ভয়াবহ হতে যাবে কোন্ দুঃখে। বরং সুখকরই বলতে পারিস। এই কালোদের দেশে ফর্সা হওয়াটা কি সুখের নয়? আমার হলে তো শালা আনন্দে মরেই যেতাম। পার্টি দিতাম। আমার গায়ের রঙ এমন কেলে-ভুচুং না হলে কি যাদবপুর ইউনিভার্সিটির মণিদীপা আমাকে বাতিল করত? কী বুদ্ধি বলতো মাইরি। গায়ের রঙ ধুয়ে কি জল খেতো ও। আমার মতো ছেলে কি পাবে আরও? রঙ থাকলেই তো আর পুরুষ হয় না। মেয়েদের বুদ্ধিই ওরকম। সব সময় উল্টো করবে। আমার ঠাকুমা ওই জন্যে বলতেন, মেয়েদের বুদ্ধি তো নয়, হাতির বুদ্ধি।

যাঃ। হাতির বুদ্ধি কি কম নাকি। হাতির বুদ্ধি, নিয়ে কত গল্প পড়ে আসছি ছোটবেলা থেকে।

থাম তো। হাতির যদি অতোই বুদ্ধি তাহলে তো হাতি ডি.এফ.ও-ই হতো।

অতি বলল। এ কথা তো একবার বলেছিলেন প্রমথেশ বড়ুয়ার ছোট ভাই লালজী। যাঁর ভাল নাম ছিল প্রকৃতীশচন্দ্র বড়ুয়া।

তোকে কে বলল?

আমি পড়েছিলাম একটা বইয়ে।

কী বই?

'বনজ্যোৎস্নায়, সবুজ অন্ধকারে।'

তাই?

তারপরই বলল, কে জানে! মধ্যপ্রদেশে এমন সব জঙ্গল অথচ এখানে হাতি নেই কেন?

হাতি নেই? ব্যয়রানেও নেই? বলিস কি রে।

নেই তো বলেন সুরিবালী সিং সাহেব। সত্যিই অবাক হওয়ার মতো কথা। বিন্ধ্যপর্বতমালা, সাতপুরা, মাইকাল পর্বতমালা সবই মধ্যপ্রদেশে অথচ হাতি নেই এখানে। অথচ চারদিকেই আছে। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ওড়িশা কেউই হাতি বঞ্চিত নয়।

হয়ত জলাভাবের জন্যেই হাতি নেই। হাতিরাও তো বুনো মোষ, গণ্ডার ইত্যাদিদের মতো জলে কেলি এবং Wallowing করতে ভীষণই ভালবাসে। তেমন জোলো জায়গার অভাব আছে বোধহয় রুখু মধ্যপ্রদেশে।

যাকগে। রাখ এখন তোর অ্যালবিনো আর হাতির আলোচনা। ভাল করে খা। রান্না কেমন করেছে ছুটকু?

ফার্স্ট ক্লাস। তবে কতটা রান্নার গুণে ভাল লাগছে রান্না আর কতটা খিদের গুণে, তা বলতে পারছি না। কারণ গত রাতে তো খাইনি কিছুই।

এই হচ্ছে শক্তিপুঞ্জের ব্যারাম। অথচ এত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে, ট্রেনে রানিং-কার থাকা অবশ্যই উচিত ছিল। তবে পথে এক জায়গাতে

মোটামুটি ভাল খাবার, ঘিয়ে রান্না করা, নিয়ে ওঠে একজন। আমরা যারা প্রায়ই যাতায়াত করি, তাই জানি। তুই জানিস না, তাই বোধহয় সাহস করে খাসনি। চলেবেল্। আমরা তো সবাই-ই খাই।

রানিং-কার যদি থাকতও তবেও তো সেই খাদ্য তো সুখাদ্যর মধ্যে গণ্য হতো না কোনও দিনও। এখন দ্যাখ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি কিছু করতে পারেন।

মমতা কি মা দশভুজা। যদি কেন্দ্রের দায়িত্ব নিয়ে পড়ে থাকত তাও হতো। কিন্তু রাজ্যের জন্যেই সব সময় যাচ্ছে।

সাউথ ইস্টার্ন, ইস্টার্ন, নর্দার্ন, সেন্ট্রাল সব রেলের সব খাওয়াই জঘন্য। বাবার কাছে শুনেছিলাম, সাহেবি আমলে 'কেলনার' এবং তারপরেও কী একটা গুজরাটি প্রাইভেট ক্যাটারার, বল্লভদাস না কী যেন নাম ছিল, রেলে কেটারিং করত। তখন ভাল খাওয়া-দাওয়ার জন্যে রেলে করে কোথাও যাওয়াটাই আনন্দের ছিল। তাদের ব্যবহারও ছিল চমৎকার।

সেই রেলেরও জাতীয়তাকরণ হলো, সঙ্গে সঙ্গে সবকিছুরই অধঃপতন হলো। সব কিছুকেই নয়-ছয় করে দেওয়াই এখন আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য।

কিন্তু আমাদের দেশে এত মানুষ, এতো গন্তব্য, সমাজের যে অংশের দেয় ট্যাক্সের টাকাতে দেশ চলে, যাদের সামর্থ্য আছে, যারা এ সি ফারস্ট বা সেকেন্ডে যাতায়াত করেন, তাঁদের জন্যেও তো প্রাইভেট কেটারিং বা রেইলওয়েজ চালু করা যায়, জনগণের কোনওরকম অসুবিধা না ঘটিয়ে। সেইসব প্রাইভেট রেল কোম্পানি যা কর দেবে তাতে দেশেরও উপকার হবে। কেন যে করা হয় না, কে জানে। হয়ত হবে কোনওদিন। আসলে সরকারি ব্যাপার মানেই গয়ং গচ্ছ, হচ্ছে হবে। হাতে ডান্ডা না থাকলে, আর চাকরি খাওয়ার ক্ষমতা না থাকলে আমরা যে মালিককে মালিক বলে মানি না। যে রোগের যে টোটকা। এ কথা স্বীকার করতে লজ্জাবোধ অবশ্যই করি একজন ভারতীয় হিসাবে কিন্তু অস্বীকারই বা করি কী করে।

তা ঠিক। কিন্তু স্বাধীনতার পরে কিছুই কি হয়নি? কিছুই কি করিনি

আমরা? অমন বলাটা দেশোদ্রোহিতা। তুই আমাদের 'নর্দার্ন কোলফিল্ডসই' দ্যাখ। কাল সকালে তোকে জয়ন্ত্-এর খোলা-মুখ খাদান দেখাতে নিয়ে যাব। কী হচ্ছে না হচ্ছে নিজ চোখে দ্যাখ। তারপরে বল।

তুই না বললি নীগাহিঁতে কাজ করিস।

তা করি। কিন্তু ওই আটটি কোলিয়ারিই তো নর্দার্ন কোলফিল্ডস-এর অধীনে এবং কোল ইন্ডিয়ারও অধীনে। জয়ন্ত্ দেখাতে নিয়ে যাব এই জন্যে যে, জয়ন্ত্ ই নর্দার্ন' কোলফিল্ডস-এর সবচেয়ে বড় কোলিয়ারি। তাছাড়া, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের প্রশংসাও পেয়েছে বহুবার। জয়ন্ত্র কোল-হ্যান্ডলিং প্ল্যান্টটিও বিরাট। বিরাট বললেই সব বলা হয় না। ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বড়। প্রায় ২০০ লক্ষ টন কয়লা গত বছরেই পাঠানো হয়েছে এই জয়ন্ত্ খাদান থেকে। তাছাড়া, পরিবেশের দিকেও সব সময় নজর রাখা হচ্ছে। একুশ লক্ষেরও বেশি গাছ লাগানো হয়েছে, এখানে ভূ-স্তর সরাতে গিয়ে খাদানের জন্যে যেসব গাছ অনেকই নষ্ট করা হয়েছে তার বিকল্প হিসাবে। এই একুশ লক্ষ গাছ লাগানোর কারণে প্রায় নব্বই শতাংশ সবুজায়ন ঘটেছে। শুনলি। নব্বই শতাংশ।

আহা। শুনেও আনন্দ হচ্ছে। দোলের সময়ে একবার এসে বসন্তোৎসব করব এখানে।

আয় না। জমে যাবে। হোলি ব্যাপারটাই আলাদা।

নেমন্তন্ন না করলে আসি কী করে।

আহা। পরশু তোকে সকলে কাছ থেকে দেখুকই না। তারপর আমার রঙই চটে যাবে।

অনিশ বলল, ফাজিল।

অতি বলল, আচ্ছা, তোর এতোই খিদে পেয়েছিল তো ব্রেকফাস্টটা খেলি না কেন ভাল করে?

লাঞ্চটা কব্জি ডুবিয়ে খাব বলে। অনিশ বলল।

হাসল অতি।

এই সব গাছ-গাছালির তদারকির জন্যেই কি তোদের সুরিবালী সিংকে দরকার?

ঠিক বলেছিস। তদারকি তো পরের ব্যাপার। কোন্ কোন্ গাছ লাগানো হবে, কী পরিমাণ লাগানো হবে, সবই বন-বিভাগের সঙ্গে পরামর্শ করা হয়।

বাঃ!

জয়ন্ত্-এর এই সব কয়লা যায় কোথায়?

মূলত যায় সিঙ্গরাউলি সুপার থার্মাল পাওয়ার স্টেশনে। ওই প্ল্যান্ট প্রায় দু'হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। গত বছরে এই জয়ন্ত্ প্রজেক্টই প্রায় তিন শো ষাট কোটি টাকা প্রফিট করেছে। নর্দার্ন' কোলফিল্ডস-এর প্রফিট প্রায় হাজার কোটি টাকা।

বলিস কী রে! এই যে লোকে বলে পাবলিক সেক্টরে লাভই হয় না।

মিথ্যে বলে। তবে কোল ইন্ডিয়ার অন্যান্য অনেক ইউনিট আছে, যারা নর্দার্ন' কোলফিল্ডস বা মহানদী কোলফিল্ডস-এর কৃতিত্বর মুখে চুন-কালির পোচ লাগিয়ে দেয়।

তারা কারা?

ইস্টার্ন কোলফিল্ডস। ভারত কোকিং কোল ইত্যাদি ইত্যাদি।

তাই?

ইয়েস। তুই কোনওদিন ওদিকে ট্রান্সফার হলে সি.এম.ডি তোকে বসন্তের হাট-এর বগারি-পাখির মতো জ্যান্ত ভেজে খাবেন।

তারপর দু'জনেই অনেকক্ষণ চুপচাপ। আমড়ার চাটনির পর।

দই কি বাড়িতে পাতা?

পাতবে ছুটকু কাল থেকে। আজ সাঁচা ছিল না। তবে এখানের দুধ তো ভাল নয় তেমন, দই ভাল হবে কোত্থেকে। এই দই নীগাহিঁর দোকান থেকে নিয়ে আসা হয়েছে।

দুধ ভাল নয় কেন?

জঙ্গল সব সাবড়ে দিয়েই না কয়লা খাদান হয়। গরু খাবে কী? আর নাই যদি ভাল খেতে পায়, তবে ভাল দুধই বা দেবে কী করে।

এখানে গরম কিন্তু নেই-ই বলতে গেলে।

মাংস দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে বলল, অনিশ।

বৃষ্টি নেমে গেছে যে। বর্ষাকালটা এখানে রীতিমতো প্লেজেন্ট। রোম্যান্টিকও বটে।

বলেই বলল, তোকে বলা হয়নি, গাছ লাগানোর কারণে জয়ন্ত্-এর তাপমাত্রা অন্যান্য জায়গা থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। তা জানিস? তাই আবহাওয়া আর প্রকৃতিবিদেরা হায় 'অরণ্য অরণ্য' করে যে চেঁচান তা নিছকই মুখের বুলি নয় যে তা তো বুঝতেই পারছিস। অরণ্যর যে আবহাওয়ার ওপর সত্যিই মস্ত প্রভাব আছে তার হাতেনাতে প্রমাণ নর্দার্ন কোলফিল্ডস-এর জয়ন্ত্।

খেয়ে উঠে, পাখার নিচে একটা সিগারেট ধরিয়ে বসে অনিশ বলল, রবিবারে, মানে পরশুদিন কোথায় নিয়ে যাবি পিকনিক-এ?

মারা।

সেকি রে! শেষে কি মারবার জন্যে নিয়ে এলি ওখানে? দুসস্ শালা। আর জায়গা পেলিনে, মারা!

নারে। দেখিস তোর খুবই ভাল লাগবে। প্রাচীন সব গুম্ফা আছে ওখানে।

তারপর বলল, তুই নালন্দাতে গেছিস কখনও?

গেছিলাম, ছেলেবেলাতে, মা-বাবার সঙ্গে। মনে নেই ভাল।

'মারা কেভস' দেখে আমার নালন্দার কোনও "বিহারের" Epitom বলে মনে হয়। তবে এই সব গুম্ফা সম্বন্ধে ঠিকমতো জানতে পারার মতো কোনও উৎসও তো নেই। আন্দাজেই অনুমান করতে হয়। বৌদ্ধ গুম্ফা যখন, তখন ইংরেজ আর মুসলমান আমলও ছাড়িয়ে আরও পেছনে যেতে হবে। অনুমান, কত বছর হবে?

অতি জিজ্ঞেস করল।

আমি ইতিহাসের ছাত্র ছিলাম থোড়ি। আমি কী করে বলব?

তুই তো আশ্চর্য মানুষ। ইতিহাস-ভূগোল আর সামান্য অঙ্ক, অশিক্ষিতদেরও জানার কথা। এইটুকু ইতিহাস জানতে ইতিহাসের ছাত্র হতে লাগে না। সাধারণ জ্ঞান থাকলেই চলে।

ঠিক এই সময়েই বাইরে একটা জিপের ইঞ্জিনের ধুকপুকানি শোনা গেল।

অতি লাফিয়ে উঠে বলল, এবারে আমাকে যেতে হবে বন্ধু। তোর জন্যে একবেলা ছুটি নিয়েছিলাম। তুই ভাল করে ঘুমো। রাতে তো নিশ্চয়ই ভাল ঘুম হয়নি। যখন ঘুম ভাঙবে তখনই না উঠে, কোলবালিশ জড়িয়ে তোর না-হওয়া বউয়ের কল্পনাতে এক পট্‌কান দিয়ে আরও ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে নিস এই আইডিয়াল আবহাওয়াতে।

বলেই বলল, দ্যাখ, ঝিরিঝিরি বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। পৌঁছে, জয়ন্ত্ থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস ঠাণ্ডা তোকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

তুই ভিজে ভিজে কাজ করবি?

ধ্যাৎ। আমার কাজ অফিসে বসে। বাইরে বেরোতে যে হয় না তা নয়, আজ বেরোব না। তারপর বলল, শোন, ঘুম থেকে উঠে ছুটকুকে বলিস চায়ের কথা। চায়ের সঙ্গে তোকে কালাজামুন আর কুচো নিমকি দেবে।

সে কীরে! সে তো বিজয়া-দশমীতে খায় মানুষে।

মনে করে নে যে, আজ বিজয়া দশমী। মনে করতে ঠেকাচ্ছে কে?

সত্যি। তুই বদলাসনি একটুও।

বদলাতে চাই না আমি। বদলানো মানেই মরে যাওয়া।

অতি সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। অনিশ এসে দোতলার বারান্দাতে দাঁড়াল বন্ধুকে সী-অফ্ করতে। যে ভদ্রলোক জিপ চালাচ্ছিলেন, তিনি নেমে হাত জোড় করে নমস্কার করলেন অনিশকে। ভদ্রলোকের ডান হাতটা স্লিং-এ ঝোলানো, বাঁ হাত দিয়েই স্টিয়ারিং ঘোরাচ্ছেন। সিগারেট ধরা বাঁ হাতটি উঁচু করে বললেন, নমস্কার। আমার নাম বিশ্বজিৎ বাগচী। বাঁ-দিকে বসা ছোটখাটো ভদ্রলোকের পাজামা পরা পায়ের দিকে নির্দেশ করে বললেন, আমার ভায়রাভাই। কলকাতা থেকে এসেছেন। মিহির ভট্টাচার্য। পরশু উনিও সস্ত্রীক পিকনিকে যাচ্ছেন আমাদের সঙ্গে। অবশ্য শালীদের সঙ্গে বেশি ভাব।

ওঁর এক ভায়রাভাই খুব ভাল লিখছেন আজকাল।

অতি বলল।

লিখছেন? কী লিখছেন? কবিতা?

না, না কবিতা তো লেখেন বিশ্বজিৎদা। উনি গদ্য লেখেন। মানে, ভায়রা ভাই।

কী নাম?

স্বপ্নময় চক্রবর্তী। পেশাতে ইঞ্জিনিয়ার। অল ইন্ডিয়া রেডিওতে চাকরি করেন। এবং লেখার জগতেও অল্পদিনের মধ্যেই এক বিশেষ জায়গা করে নিয়েছেন।

স্বপ্নময়ের একটি লেখা আমি পড়েছি।

কী নাম?

চতুষ্পাঠী।

ও হ্যাঁ। কোন্ পুজো সংখ্যাতে বেরিয়েছিল। 'বর্তমান' বা 'প্রতিদিন'-এ ঠিক মনে নেই। 'আজকাল'-এও হতে পারে।

অনিশ বলল, বরেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা গুণীই হন। তাছাড়া উন্নতনাসা, প্রশস্ত-ললাট।

বিশ্বজিৎ বাগচী বললেন, তা ঠিক। তবে Exception Proves the rule. আমার বেলাও তাই। আমি তো কেলে ভুচুং। বরেন্দ্র ভূমিতে একটা কথা চালু ছিল।

ছিল মানে?

অতি বলল।

ছিল মানে, এখন তো সবই পূর্ব পাকিস্তানে, থুড়ি, বাংলাদেশে।

কথাটা কি?

"কালা বরেন্দ্র ডেঞ্জারাস।"

বলে, নিজেই হাসতে লাগলেন।

অতি গিয়ে জিপের সামনেই বিশ্বজিৎবাবুর ভায়রাভাইয়ের পাশে বসল। ভাঙা হাতখানাই তুলে 'চলি' বলে বাঁ-হাতেই স্টিয়ারিং কাটিয়ে জিপের ধুলোতে লাল ধুলো উড়িয়ে চলে গেলেন প্রাণময় বিশ্বজিৎ বাগচী।

জিপের শব্দ মরে গেলে অনিশ ঘরে গেল। ডাবল বেডরুম কোয়ার্টার। একতলাতে একটি দক্ষিণ ভারতীয় পরিবার থাকেন। অতি বলেছে, পরে আলাপ করিয়ে দেবে। দু'জনেই ডাক্তার। জয়ন্ত্-এর হাসপাতালে কাজ করেন। নীগাহিঁর কোয়ার্টার পছন্দ তাই এখানে আছেন। গ্যারাজে ওদেরই মারুতি গাড়িটি থাকে।

ওরা যখন রেনুকুট স্টেশন থেকে এল, তখন দেখেছিল, সাদা মারুতিতে স্বামী-স্ত্রী চলে যাচ্ছেন। স্ত্রী চালাচ্ছেন, স্বামী পাশে বসে।

পথের ওপাশে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ। বর্ষার জল পেয়ে কেশভার বিস্তার করেছে। এ পাশে একটা কদমগাছ। মস্তবড়। ফুল এসেছে গাছে। আকাশে মেঘ সাজছে। ঝিরিঝিরি হাওয়া দিচ্ছে। এদিকে গাড়ি-ঘোড়া খুবই কম। মাঝে মাঝে কাঁকুরে মাটির ওপর কিরকির আওয়াজ তুলে সাইকেল যাওয়া-আসা করছে। কখনও পনেরো কুড়ি মিনিট বাদে বাদে একটা স্কুটার বা মোটর সাইকেল। কলকাতার তুলনাতে খুবই নিরিবিলি। কলকাতাতে যে কী আওয়াজ তা সেখানে থাকাকালীন বোঝা যায় না। এখানে বৃষ্টির আগে ঘুঘুর ডাক, বৃষ্টির পরে শালিখের ডাক, এক স্কোয়াড্রন সবুজরঙা ক্ষুদে মিগ প্লেনের মতো টিয়ার ঝাঁককে উড়ে যেতে দেখা যায়। টারেটের মুখ খুলে ট্যা—ট্যা— ট্যা—ট্যা করে মেসিন গান-এর গুলির মতো তাদের ডাকে দুপুরের নিরীহ নিরুপদ্রব শান্তি বিঘ্নিত করে যায় তারা।

একটা হাই তুলল অনিশ। তারপর ঠিক করল ঘুমোনোই যাক। ছুটকু প্যান্ট্রিতে কী টুকুস-টাকুস করছিল। ওকে ডেকে বলল, আমি ঘুমুচ্ছি ছুটকু।

জী সাব। চায়ে কিতনা বাজে লানা?

আমি ঘুম থেকে উঠে চেয়ে নেব। তুমি ঘুমোবে না?

না সাহেব। আমি কাজ শেষ করে একটু টিভি দেখব আস্তে করে। আপনার অসুবিধে হবে সাহেব?

আরে। বাড়ি তোমার, তুমিই তো মালিক। অসুবিধে আমার হবে কেন? অবশ্যই দেখবে। তবে বিজ্ঞাপন এলে কমিয়ে দেবে।

জী সাব।

তারপর বলল, তোমার দেশ কোথায় ছুটকু?

সিধি।

সেটা কোথায়?

সিধি জেলার সদরে।

বাড়িতে কে কে আছে?

মা আর ছোট বোন।

জমিজামা নেই?

না সাহেব। থাকলে তো চাষই করতাম।

বাবা কবে মারা গেছেন?

সে অনেকদিন হলো।

কী হয়েছিল, মানে কী রোগ।

অ্যাইসেহি।

অ্যাইসেহি মানে?

মানে যার যখন ডাক আসে যে তখন যায় হুজৌর। এতে আর 'এখন তখন' কী?

তবে মরার আগে বাবা মরতে মরতে একবার জোর বেঁচে গেছিল।

কী হয়েছিল?

হয়নি কিছুই। 'মারা'তে গেছিল আমার চাচার কাছে। বাঘে ধরে ছিল ঝিঙ্গিঝারিয়া নালার কাছে।

কী নালা?

ঝিঙ্গিঝারিয়া নালা। একটা বাঘ সে সময়ে বহত মানুষকে মেরেছিল।

উসবাদ কলকাত্তাসেই কোই শিকারী আয়াথা, ঋজু বোস সাহাব। উনোনে ঔর উনকি চেলা রুদ্দর বাবুনে উ বাঘোয়াকো পটকা দিয়ে থে।

বাঘের মুখে পড়েও কি কেউ বাঁচে।

বাঁচে সাহেব। ইয়ে সব কুদরত কি বাতেঁ। যিসকা বাঁচনা হ্যায় উও বাঁচ যাতা, যিসকা মরনা উও তো খাটিয়ামে বৈঠে হুয়ে মর যাতা। হর ইনসানকি তো মরনা হ্যায়হি হ্যায়।

অনিশ দেখল, কথোপকথন আরও চালালে বিপদ আছে। ছুটকু ফিলসফিকাল হয়ে যাচ্ছে। তাই বলল, ঠিক্কে হ্যায়। ম্যায় দরওয়াজা লাগাকর শো রহা হ্যায়।

জী সাব।

চান করে উঠে পায়জামা পাঞ্জাবিই পরে ছিল। তাই পরেই শুয়ে পড়ল খাটে। এ ঘরেও ডাবল বেড খাট। অতিথি-টতিথি আসে হয়ত প্রায়ই। বেশ সুন্দর করে সাজানো এ ঘরটিও। দেওয়ালে শরৎচন্দ্রর ছবি। একটু আশ্চর্য হলো। যে যুগের বুদ্ধিজীবীরা শরৎচন্দ্রকে লেখক বলেই মানতে রাজি নন সেই যুগে তাঁর ছবি ঘরে টাঙাতে কম মানুষকেই দেখেছে। অতি চিরদিনই ওরিজিনাল। অন্য দেওয়ালে ছত্রপতি শিবাজীর ছবি।

অনিশ ভাবল, অতি কি তলে তলে আর এস এস টার এস এস হয়ে গেল নাকি? কলকাতাতে ফিল্ম-ক্লাব আর আর্ট-সোসাইটি করত। অনিল সাহা এবং শ্যামল দত্তরায়দের, প্রণবরঞ্জন রায়েদের সঙ্গে রাসবিহারীর মোড়ের সুতৃপ্তিতে আড্ডা মারত ছুটির দিনে। সোসাইটি অফ কনটেমপোরারি আর্টিস্টস-এরও সভ্যও ছিল। যতদূর মনে পরে। ছবি আঁকত টেম্পেরাতে। তখন সবে যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে বেরিয়েছে। দক্ষিণীর একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেম ছিল তখন। সেই কি তার মানসী? মেয়েটিকে পরমাসুন্দরী বলা চলে না, তবে সুশ্রী। লম্বা, সুন্দর ফিগার। মেয়েটি আর্ট কলেজেও পড়ত। সম্ভবত থার্ড ইয়ারে পড়ত। তার ক্লাস শেষ হলেই সে যখন গুটি গুটি পায়ে হেঁটে পি মজুমদারের শাড়ির দোকানের সামনে এসে দাঁড়াত। অনিশরা আওয়াজ দিত অতিকে, ওই যে রে। তোর পিসিমা ডাকছে তোকে।

অতি ঠাট্টা অগ্রাহ্য করে আড্ডা ছেড়ে উঠে চলে যেত। যদিও ওদের বিয়ে হয়নি। মেয়েটির নাম ছিল শ্রী না শ্রীলা কী যেন। কে এক মস্ত বড়লোকের ছেলে বড়লোক, সুদর্শন, ব্যারিস্টারকে বিয়ে করে রাসবিহারী অ্যাভিন্যু, দক্ষিণী, পি. মজুমদারের দোকানের সামনের ফুটপাথ, আর্ট স্কুল সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে কলকাতার তথাকথিত হাই

সোসাইটি নামক হাস্যোদ্দীপক ঘূর্ণাবর্তে তলিয়ে গিয়েছিল। তাকে নাকি মাঝে মধ্যে ক্যালকাটা ক্লাবে, টলীতে, বা বেঙ্গল ক্লাবের জমায়েতে দেখা যায়।

অনিশ শুয়ে শুয়ে সেই সব দিনের কথা ভাবছিল। অতি দুঃখ পেয়েছিল খুবই কিন্তু মনে হয়, অবশ্যই বেঁচে গেছিল একটা বাজে মেয়ের হাত থেকে। ছেলে হিসেবে অতি চমৎকার ছিল। সেই মেয়েটির চেহারার মধ্যেই এক ধরনের হ্যাংলামি ও কাঙালপনা প্রচ্ছন্ন ছিল। সে কারণেই অতি তার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও তার বান্ধবীর সঙ্গে কোনওদিনও আলাপিত হবার ইচ্ছাও প্রকাশ করেনি ও। যা হয়েছে, ভালই হয়েছে। ওই মেয়েকে নিয়ে অতি কখনও সুখী হতো না।

তারপর ভাবল, বিয়ে করে সুখী হওয়া-না-হওয়াটা একটা দৈবী ব্যাপার। বিয়ে থেকে অনেক কিছু প্রত্যাশা করলে হতাশাই বাড়ে শুধু। যারা 'যানে দো কনডাক্টার' অ্যাটিচুড নিয়ে বিয়ে করে, তারাই দেখেছে সুখী হয়। অনিশের বন্ধু-বান্ধবের অভিজ্ঞতা তাই বলে।

হঠাৎই একটা মস্ত দীর্ঘশ্বাস পড়ল অনিশের। দেবারতির কথা মনে পড়ল তার। কোথায় হারিয়ে গেল সে। মধ্যরাতের তারার মতো তার মধ্যযৌবনে সে এসেছিল, শেষ রাতের আগেই হারিয়ে গেল। দেবারতির নাম দিয়েছিল অনিশ শতভিষা। ওরা দু'জনেই শুধু জানত সেই নামের কথা। সেই তারার কথা জানত ওদের দু'জনের আকাশ। শতভিষা তার জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়ার পর আর কোনও মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট তো হয়ইনি অনিশ, উল্টে মেয়ে জাতটার উপরেই এক গভীর অসূয়া তৈরি হয়ে গেছিল ওর মনে। আর এ জীবনে ও সব কমপ্লিকেশনের মধ্যে যাবে না ও। অনেকদিন হয় ঠিকই করে ফেলেছিল। আরও একজন ছিল তার জীবনে, তার নাম পামরি। সেও ভাল করে আসার আগেই হারিয়ে গেছিল।

ওর কাজ আছে, বই পড়ার নেশা আছে, নেশা আছে গান শোনার, ইন্টারনেট-ফোবিয়া আছে, বেশ আছে। অন্য নিরানব্বইজন মানুষের মতো নয় ও। ও একশোজনের মধ্যে একজন। একাই থাকতে চায়।

এইটুকুই ওর গর্ব। ও নিজেকে নিয়েই সম্পূর্ণ নিজে। ওকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্যে আর দ্বিতীয় কারোই, সে পুরুষই হোক, কী নারী, বিন্দুমাত্রও প্রয়োজন নেই।

সব জায়গাতেই আমরা নাক কুঁচকে বলি 'আই ক্যান স্মেল আ র‍্যাট।' আর এই মনোভঙ্গির কারণেই কিছুমাত্রও করতে পারি না, পারিনি আমরা। দ্যাখ, তোদের দুগ্ধফেননিভ ধুতি-পাঞ্জাবি পরা পশ্চিমবঙ্গীয় নেতারা, যাঁরা নাকি সকলেই সৎ বলে নিজেদের প্রচার করে থাকেন, তাঁরা রাজ্যটার কী হাল করেছেন? শুনেছি, পাঞ্জাবের প্রতাপ সিং কাঁয়রোর মতো নাম্বারি চোর নাকি আর হয়নি এ পর্যন্ত। কিন্তু তুই কি চণ্ডীগড়ে গেছিস? শহরটা দেখেছিস? পাঞ্জাবের কৃষি-খামারগুলো দেখেছিস?

না। তবে আর কী?

আমি তো বলব, পশ্চিমবঙ্গে যদি একজন প্রতাপ সিং কাঁয়রোও থাকতেন, তবে আজ পশ্চিমবঙ্গের চেহারা অন্যরকম হয়ে যেতো। আরে বাবা। যে গরু দুধ দেয়, তার লাথিও সহ্য হয়। কাজও করব না আর কেউ বা কারা করলে ট্যাঁস্ ট্যাঁস্ করে কথা শোনাব, যৌথ-পরিবারের ননদের মতো, তা কি চলে! আজও এই অ্যাটিচুড সত্যিই হাস্যকর। প্রাগম্যাটিক হতে হবে আমদের, প্র্যাকটিক্যাল। জাপানের প্রাইম মিনিস্টার চুরি করছে, আমাদের বড় বড় মন্ত্রীদের ঘরে স্যুটকেস ঢুকে যাচ্ছে, প্রণব মুখার্জির মতো গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়লেরা, যাঁদের নিজস্ব কোনও কনস্টিটুয়েন্সি পর্যন্ত নেই, এতদিন ধরে ইন্দিরা-রাজীব এমন কি সোনিয়া গান্ধীরও পায়ে তেল মালিশ করে করে ঊর্ধ্বে চড়ে রয়েছেন। এইসব বাতেল্লা মারা নেতা দিয়ে কি আমরা ধুয়ে জল খাব। কাজের লোক চাই, কাজের লোক। সর্বক্ষেত্রে।

তারপর বলল, অনেক বেশি কথা বললাম বটে, তা'বলে ভাবিস না কালাম সাহেব অসৎ। ওঁর ট্র্যাক রেকর্ড চমৎকার। যেমন চমৎকার আমাদের ফিন্যান্স ডিরেক্টর এ কে দাস বা সি এম ডি সুবোধ সেন সাহেবের। বাঙালি হিসেবে, উই আর প্রউড ফর দেম। আরও আছেন।

এস ই সি এল-এর গৌতম ঝা সাহেব অত্যন্ত কমপিটেন্ট এবং সৎ মানুষ বলে শুনেছি, যেমন শুনেছি মহানদী কোলফিল্ডস-এর শর্মা সাহেবও। কথায় বলে না, The test of the Pudding is in its eating. কোথায় কী কাজ হচ্ছে তা দেখো। তা না, খালি ফুট কাটা। Pettitogging.

তুই কি ঠিক জানিস যে, কোথাওই চুরি নেই এতো কোটি কোটি টাকা যেখানে খরচ হচ্ছে?

অনিশ বলল।

শোন। আমার বড় পিসেমশাইয়ের মস্তবড় অডিট ফার্ম ছিল। ওঁর মৃত্যুর পরে সেই ফার্ম হয়ত উঠেই যাবে। এখন উনি অশক্ত, দেখতেও পারেন না। কিছু পার্টনার আছেন, তাঁরা প্রতাপ সিং কাঁয়রোর মতো নন, প্রণব মুখার্জির মতো। সততাই একমাত্র গুণ নয় মানুষের। যে সততা, রাঙা মুলো ঘর জামাইয়ের সততা তাকে আমাদের দরকারও নেই।

তোর পিসেমশায়ের ছেলে নেই?

না। চার্টার্ড অ্যাকউন্ট্যান্টদের ছেলে হয় না। যদি বা হয়ও, তারা প্রায়শই ঘরজামাই হয়ে শ্বশুরের ফার্ম দেখে বাবার ফার্ম ডুবিয়ে দেয়।

এ তো আশ্চর্য ফেনোমেনান।

তা বটে। অ্যামেরিকায় হলে এ নিয়ে কেউ থিসিস সাবমিট করে ডক্টরেট হতো নিশ্চিত।

ওই ডাম্পারগুলোর খোঁড়াখুঁড়িতে যে পরিমাণ ধুলো উড়ছে তুইও ফালতু কথাতে সেই পরিমাণ ধুলো ওড়াচ্ছিস। তোর অডিটর পিসেমশাইয়ের কথা বলছিলি। তাই বল? কিসে উঠল অডিটরের ফার্মের কথা?

হ্যাঁ, বহতই কোলিয়ারি ছিল ওঁর ক্লায়েন্ট। তুই হয়ত জানিস না অতি, যে আমি স্কুল-ফাইনাল, পরীক্ষা পাস করে সেই ফার্মে ঢুকেছিলাম। বাবার খুব ইচ্ছে ছিল যে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হই।

তুই সি. এ. পড়তে গেছিলি? কী দুর্ভাগ্য সি. এ-দের।

হ্যাঁরে। গেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য কেন সি.এ-দের?

কেন? সি.এ. হলে আজ হয়ত আমাদের কোম্পানির ফিন্যান্স ডিরেক্টর হতে পারতি।

দুসস্। ও পরীক্ষা তো নয়, শালা রেসের মাঠ। শেষ করতে গিয়ে বহুত মাস্তান নিজেরাই শেষ হয়ে যায়। তাছাড়া বড্ডই ধুলো ঘাঁটতে হয়। যত্ত মাথামোটাদের কারবার ওখানে। মাথা-ফাটাদেরও। তারও ওপর ধুতি আর শার্ট পরা বাঙালি মুহুরীরা যে পরিমাণ নস্যি নিতেন, উরিঃ ফাদার! আমার একেবারেই পোষাল না। তার ওপরে 'জার্নাল' বলে একটা সাপলুডো খেলার খাতা আছে। সে মালের স্বরূপ বোঝার চেয়ে ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস বোঝা অনেকই সোজা। 'একটা ডেবিট হলে, একটা ক্রেডিট হবে' শুনতে সোজা হলেও ব্যাপারটা ডেঞ্জারাস। পড়িনি বেশ করেছি। কিন্তু যে ক'দিন ছিলাম সেই ফার্মে, সে অভিজ্ঞতা বৃথা যায়নি। খাদান তখন সব ন্যাশানালইজড হয়নি। কোলিয়ারির মালিকেরা চুরি করে ফাঁক করে দিত। 'ট্রাক-লোডিং সেল' বলে একটা হেড ছিল। প্রধান চুরিটা হতো সেখানে। অ্যাপ্রুভড ক্যাপাসিটি অনেক কম দেখানো থাকত। তৎকালীন মাইনিং অথরিটিদের সঙ্গে যোগসাজশে। আর কয়লা পাচার হয়ে যেতো ওপরে ওপরে। সব দু'নম্বর হয়ে যেতো। তবে ব্যক্তিগত মালিকানাতে থাকাকালীন একটা ভাল জিনিস হতো—দু'নম্বর প্রফিটের একটা সাইজেবল অংশ, যন্ত্রপাতি হয়ে ফিরে আসত এবং খাতার বাইরে ইনক্লাইন মাইনস-এর গহ্বরে আবার ঢুকে যেত। ইস্টার্ন সেক্টরে অধিকাংশ মাইনই ছিল ইনক্লাইন। এখন যেমন চুরির টাকা কোল-মাফিয়া আর আমলারা মিলে খাচ্ছে, মদ মেয়ে মানুষেই বেশি উড়ছে, মানে কনস্ট্রাকটিভ নয়, ডেসট্রাকটিভ খরচে যাচ্ছে, তখন তেমন ছিল না।

তুই বলতে চাচ্ছিস কী?

বলছি, চুরি সবসময়েই ছিল। আকবরের আমলেও ছিল, শিবাজীর আমলেও ছিল। এখন দেখতে হবে—কাজের সঙ্গে চুরির অনুপাতটা কীরকম? সিমেন্টের সঙ্গে কাদার অনুপাতের মতো আর কী। বুঝলি না?

স্বাধীন ভারতে সব কিছুরই দাম বেড়েছে, কমেছে শুধু মনুষ্যত্বের দাম। তা আমাদের কোম্পানি তো ভারতের বাইরে নয়।

এই তো তোর দোষ। সব কিছুই বড় পার্সোনালি নিয়ে ফেলিস। আমার কিন্তু এখানে এসে ছেলেবেলাতে দেখা একটা বাংলা সিনেমার কথা খুব মনে পড়ে যাচ্ছে।

কী সিনেমা?

পঞ্চতপা। সাহিত্যিক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের গল্প। ডিরেক্টর কে ছিলেন বলত? অসিত সেন? মনে পড়ছে না। ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে তখন মাইথন, পাঞ্চেৎ, তিলাইয়া সব ড্যাম হচ্ছে। সেই ড্যাম বানানোর ক্রিয়াকাণ্ডের পটভূমিতে একটা চমৎকার রোম্যান্টিক গল্প উনি বুনে দিয়েছিলেন। সত্যি! আজ কেবলই সেই ছবিটির কথা মনে হচ্ছে। আজকালকার সাহিত্যিকরা, এই সব নিয়ে কেন লেখেন না বলত?

ছাড়তো! সাহিত্যিক আবার আছে নাকি? আনন্দবাজার, ক্যালকাটা কর্পোরেশনের মতো যেসব লোকের পেছনে স্ট্যাম্প মেরে দিচ্ছে, বাজারের মাংসর দোকানের পাঁঠার মতো, শুধুমাত্র তারাই 'আগমার্কা' সাহিত্যিক বলে গণ্য হচ্ছে। আর কলকাতার বাইরে যেহেতু আনন্দবাজার গোষ্ঠীর কাগজই সবচেয়ে বেশি যায়, পত্র-পত্রিকাও, তাই সেই মার্কা-মারারাই ছড়ি ঘোরাচ্ছে, পুরো বঙ্গীয় সাহিত্য ক্ষেত্রে।

আনন্দবাজার লোকে পড়ে কেন? বলতে পারিস? কী থাকে ও কাগজে, বিজ্ঞাপন ছাড়া? পুড়ো বাঙালি জাতটার রুচি ও সংস্কৃতিরও তো বারোটা বাজিয়ে ছেড়ে দিলে এরা। তার ওপরে কী মনোপলিস্টিক অ্যাটিচুড। আমরাই থাকব একমাত্র, আর আমাদের আগমার্ক দাগমারা কবি-সাহিত্যিকেরা, বাকিটা ভ্যাকুয়াম। আর সকলে আঙুল চুষবে।

লোকে ইসাবগুল খেলেই পারে।

হঠাৎ এ কথা। ইসাবগুল! অতি বলল। মানে বুঝলাম না তোর কথার।

আরে ইসাবগুলই যে আনন্দবাজারের একমাত্র বিকল্প এবং তা নিয়মিত ইস্তেমাল করলে আনন্দবাজারের চেয়ে মাসিক খরচও যে

অনেকেই কম অনেক বেশি এফেক্টের জন্যে, এই কথাটাই বাঙালি জনগণের মাথাতে ঢুকিয়ে দেওয়ার মতো একজনও অ্যাডভার্টাইজমেন্ট জিনিয়াস দেশে পাওয়া গেল না। এটা দুর্ভাগ্য।

সব মণিশঙ্কর মুকুজ্যে? উনি তো আনন্দবাজারের নন, রমাপ্রসাদ গোয়েঙ্কার চাকরি করেন।

আর. পি. জি তো অ্যাস্ট্রনমিকাল ফিগারে মাইনে দেন। ওঁর এসব করার প্রয়োজনই বা কী?

কী?

এই সাহিত্য-ফাহিত্য। উনি তো ব্যাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরি আর আর. পি. জি নিয়ে থাকলেই দিব্যি পারেন।

কিন্তু একটা কথা। উনি 'নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরি', 'আশা-আকাঙ্ক্ষা' ইত্যাদি কিছু দুর্দান্ত বই লিখেছিলেন সাম্প্রতিক অতীতে। সত্যজিৎ রায়ের মতো মহান ডিরেক্টরও তো ওঁর মতো মহান সাহিত্যিকের শরণাপন্ন হয়েছেন।

তা ঠিক। কিন্তু লিখলে কী হবে? সোনার শিকল পরে রয়েছেন যে! উনিও তো আনন্দবাজারের গোষ্ঠীর নবরত্নর একজন।

যদি থাকো বাজারে, সদা মান্য করো রাজারে।

আমার এক আনন্দবাজারী বন্ধু বলে, বুদ্ধিমান মানুষই এই সংসারে বেশি। বোকাদের সংখ্যা বড় দ্রুত কমে আসছে। সকলেই তাই। সেই বন্ধু বলে,

"হিজ হিজ হুজ হুজ থাকি মোরা বাজারে, বাপ ভাবি রাজারে" এই Maxim মান্য করেন। পাঁচ লাখ টাকার পুরস্কার দেনেওয়ালা আর কেউ তো নেই! এই পোড়া বঙ্গভূমে। আর পাঁচ লাখ টাকার লোভ সংবরণ করা তো বাঙালির চরিত্রে নেই।

আমার খিদে পেয়ে গেল রে অতি। ধুলো খেয়ে আর তোর কথা খেয়ে। আর তোর কথা খেয়ে। এবারে চল কনভেয়র বেল্ট, সাইলো, ওয়াগন-রেক এসব দেখি। থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টে নিয়ে যাবি না একদিন?

আর দেখে কী করবি। এই কয়লা ভবিষ্যতে অন্য কাজে লাগবে। কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে সোলার পাওয়ারে। সৌরশক্তি। বুঝেছ এঞ্জিনিয়র? অনেক সস্তা, পল্যুশান নেই। যুগ বদলাচ্ছে।

তবে তোদের চাকরির কী হবে?

আরে ওসব হতে হতে আমাদের জীবন শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু সি.ই.এস.সি-র শেয়ার কেনার সময় এখন। বাজার এখন তো শুয়ে আছে। ওরা নির্ঘাৎ সোলার-এ যাবে। মানে, সৌরশক্তিতে। গ্রামোফোন কোম্পানি নিয়ে কি 'খেল'টা দেখাল দেখলি না। আমার এক হাড়-কেপ্পন তিলে খচ্চর-বন্ধু ত্রিশ টাকা করে গ্রামোফোনের শেয়ার তুলে রেখেছিল চারশো। স্রেফ ইনটুইশানে। আর সেই শেয়ার দু'হাজার টাকা দামে বিক্রি করল। একেই বলে বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়া।

ওসবের কপাল চাইরে ভাই। টাইগার লাক-এর মতো।

যা বলেছিস। তবে কলকাতা ফিরে কিনব কি সি.ই.এস.সি.-র শেয়ার? বল? তুই তো আমাকে ধন্ধে ফেলে দিলি।

চোখ বন্ধ করে কিনে ফেল। শেয়ারে প্রফিট করে পুষিয়ে নে। ইলেকট্রিক বিলে আমাদের ধুয়ে নিচ্ছে সি.ই.এস.সি। আর.পি.জি. গ্রুপের বড় ধান্দা আছে সি.ই.এস.সি. নিয়ে। জলের দামে যাচ্ছে শেয়ার এখন। এই সময়েই বললাম তো কিনে ফেল। আমরা পুতুপুতু বাঙালিরা রিস্ক নিতে জানি না, ভয় পাই, তাই গেইন করব কী করে বল? "No risk, no gain" Maxim-ই আছে। আরে জীবনটাই যখন একটা গ্যাম্বল, বিয়েটা একটা গ্যাম্বল, তাহলে সি.ই.এস.সি-র শেযার কী দোষ করল?

যা বলেছিস।

কালই ই-মেইল পাঠাব গোপাল সাহাকে।

সে আবার কে?

জি. এম. বসু কোম্পানির এমপ্লয়ি। অর্ডার পায় আর ইন্টারনেটের চাবি টেপে। কেনে আর বেচে।

পাঠা তাহলে? কিন্তু তোর ডি-ম্যাট অ্যাকউন্ট আছে তো?

সেটা আবার কী?

ডিম্যাটাইজেশান। শেয়ার তোর কাছে থাকার দরকার নেই। ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে থাকবে।

যাঃ শালা। দিনে দিনে কত কী হবে।

তবে সি.ই.এস.সি এখনও ফিজিক্যালই আছে।

তবে তো ভালই। বলে, মুক্তধারার গান ধরে দিল অতি, 'নমোঃ যন্ত্র নমোঃ, যন্ত্র নমোঃ যন্ত্র নমো'।

মোবাইলে কী যেন মেসেজ এল একটা।

অতির গাল লাল হয়ে এল। বলল, তুই একটা কাছাখোলা। ওয়্যারলেস সেটটা অন করা ছিল। রায়দা সব কথা শুনেছেন।

তাই? কী বললেন তোকে? তা আমার কী দোষ?

তুই দেখবি তো একটু?

আমি কি ছাই জানি। ফোনটা কি তোর এই এয়ারবাসের ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেল।

কী বললেন, তাই বল না?

উনি কে?

কে আর? আমার বস্। বললেন, ন্যাশড্যাকে বেয়ারার চাকরি খালি আছে একটা। চলে যাও। ড্র্যাগ লাইনকে অযোগ্য হাতে রাখতে চাই না আমি। ডাম্পার ওয়ান ডাম্পার টু নিচে দাঁড়িয়ে চিঁ চিঁ করছে, খেয়ালই করছ না তুমি! কথার ফুলঝুরি ফুটোচ্ছো?

আমার এই বন্ধুটা যাচ্ছেতাই রায়দা।

অতিথিকে গাল না দিয়ে নেমে এসো। ঘোড়পাদে এসে গেছে। এই তো দোষ বাঙালির। বউ বা বন্ধুকে কাছে পেলে তো বিশ্ব ভুলে গেলে! আজ যদি কুরুভিলা থাকত তাহলে কনভার্সেশন টেপ করে কালাম সাহেবকে দিয়ে দিত। 'কত প্যাডিতে কত রাইস' বুঝতে তখন।

ঘুম ভেঙে দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই ছুটকু বলল, চা লাউ সাব?

অনিশ বলল, লাও। বলে বারান্দাতে এসে বসল। গাছে গাছে চারপাশ সবুজ হয়ে রয়েছে। একেই বোধহয় বলে সবুজায়ন। ট্রেনে আসতে আসতে রায়বাবুর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তাঁর কাজ...

তখনই বুঝেছিল যে নর্দার্ন কোলফিল্ডস বা কোল ইন্ডিয়ার অন্যান্য ডিভিশনে, যেখানে ওপেন কাস্ট মাইনিং হচ্ছে সেখানে সবুজায়নের ওপরে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। অত্যন্তই ভাল কথা। অতি বনে-জঙ্গলে খুব কমই ঘুরেছে কিন্তু হাজারীবাগে ওর মামাবাড়ি ছিল। সেখানে প্রতি শীতের ও গরমের ছুটিতে যেত। ওর মামারা গাছ-গাছালি সম্বন্ধে একেবারেই অনভিজ্ঞ ছিলেন। আশ্চর্য। কোনওরকম ঔৎসুক্যও ছিল না। এটা কী গাছ? জিজ্ঞেস করলে বলতেন, গাছ। ওটা কী ফুল? জিজ্ঞেস করলে বলতেন, ওই। ফুল। পাখির বেলাতেও তাই। কিন্তু মামাবাড়ির পাশের বাড়ি ছিল বিজিতেন মামার। বিজিতেন মামা হাজারীবাগ পোস্ট অফিসের অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশনমাস্টার। অনেক ছেলেমেয়ে নিয়ে জরাজীর্ণ পৈত্রিক ভবনে থাকতেন। বাসভবন বলে মনে হতো না, বাড়িটাকে জঙ্গল বলেই মনে হতো। বড়মামী বলতেন, সন্ধের পরে যাসনি ওদিকে, বাঘে ধরবে। কিন্তু যতদিন থাকত অনিশ হাজারীবাগে, ওই বাড়িতেই পড়ে থাকত বলতে গেলে। সাচ্ছল্য ছিল না সে বাড়িতে কিন্তু আনন্দ ছিল খুব। গাছ-গাছালি, সে বড় গাছই হোক কী ছোট ফুলের কোনও ঝাড়, সে বাড়ির মস্ত চৌহদ্দিতে বেঁচে থেকে যেন ভারি খুশি হতো। তাদের মনোভাব যেন বুঝতে পারত অনিশ সে বাড়িতে গেলেই। গাছেরা যদিও কথা বলতে পারত না। কিন্তু অনিশ তবু যেন বুঝতে পারত যে তারা অনিশের সঙ্গে কথা বলছে।

বিজিতেন মামীমার নাম ছিল রেবা। সব সময়ে হাসিমুখ। ছেঁড়া ব্লাউজ, মলিন রং-চটা পাড়ের শাড়ির মালিন্য তাঁর মুখের সদা-নির্মল হাসির ঔজ্জ্বল্যকে কখনই ম্লান করতে পারত না। বিজিতেন মামার মেজ ছেলে পাদপ অনিশের সমবয়সী ছিল। পাদপের ডাক নাম ছিল বিটকেল। বিটকেলের চেয়ে এক বছরের ছোট ছিল তার বোন পামরি। আর সবচেয়ে ছোট ছিল পান্থপাদপ। তাকে সবাই ডাক নামে ডাকত পাপু বলে।

পাদপ মানে যে গাছ, পা দিয়ে যে জল পান করে সেই যে পাদপ তা জেনেছিল অনিশ বিজিতেন মামারই কাছে। পান্থপাদপ মানে কী?

বোঝাতে বিজিতেন মামা বলেছিলেন, এ এক বিশেষ ধরনের গাছ। আয় তোকে দেখাই। বাগানের ওই কোণে অনেক যত্নে ওকে বাঁচিয়ে রেখেছি। ওদিকের দেওয়ালটা গেছে ভেঙে। হাজারি সিংয়ের বাড়ির গরু-ছাগল যখন-তখন ঢুকে পড়ে আমার গাছপালা সব খেয়ে দেয়।

আপনি কিছু বলেন না কেন?

কী বলব বাবা। ওরা যে বড়লোক। হাত জোড় করেই থাকতে হয়। বড়লোক হয়ে গেলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষ আর বড় থাকে না। তার ভাল জিনিসগুলো নষ্ট হয়ে যায়, যদি না সে সবসময়ে সে ব্যাপারে সচেতন থাকে।

গাছটার সামনে অবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল অনেকক্ষণ অনিশ। অনিশকে সকলেই অনি বলেই ডাকতেন হাজারীবাগে। 'পান্থপাদপ' এমন নাম হলো কেন বিজিতেন মামা?

বিজিতেন মামা বললেন, এদের পাতার গোড়াতে আঘাত করলেই অজ্ঞাত কারণে জল বের হয়। নামটি সংস্কৃত। আসলে এ গাছ কিন্তু এসেছে বহু দূরের সমুদ্রের এক দ্বীপ থেকে।

ছেলেমানুষ অনি শুধোত কোন দ্বীপ বিজিতেন মামা?

মাদাগাস্কার।

অনেকদিন পরে কলকাতার বটানিক্যাল গার্ডেনে তার এক বটানিস্ট বন্ধু পান্থপাদপের বটানিক্যাল নাম বলেছিল অনিকে। Ravenala Madagascariensis.

আজও মনের চোখে এক শীতের দুপুরে পান্থপাদপ গাছটির সামনে দাঁড়ানো শেয়ালে-রঙা ছেঁড়া একটি র‍্যাপার আর ধুতিপরা লম্বা তামাটে রঙের দীর্ঘনাসা বিজিতেন মামার ছবিটা ভাসে।

বিজিতেন মামাকে অনি তাঁর নামের মানে জিজ্ঞেস করাতে উনি হেসে বলেছিলেন, আমার নামের কোনও মানে নেই রে অনি। আমি মানুষটারও যেমন কোনও মানে নেই।

পামরি মানে কী? জিজ্ঞেস করাতে বিজিতেন মামা বলেছিলেন, ফসল নষ্ট করে এমন একরকমের পোকা।

তা পামরির নামটা এমন খারাপ রাখলেন, কেন মামা?

বিজিতেন মামা হেসে বলেছিলেন, নামে কি এসে যায় রে বাবা, যে মানুষ খারাপ নামকে মিথ্যে প্রমাণ করে নামের চেয়ে অনেকই বড় হয়ে উঠতে পারে, সেই তো মানুষ। বিজিতেন হয়ে হার বা জিতের কাছাকাছি না থাকতে পারার চেয়ে বাজে ব্যাপার আর কী থাকতে পারে বলো।

বাক্যটার মানে সঠিক বুঝতে পারনি সেদিন অনি। পেরেছিল অনেকদিন পরে। পেরে, বিজিতেন মামার জন্যে বড় দুঃখ হয়েছিল।

বিজিতেন মামা প্রকৃতির প্রতি এক গভীর ভালবাসা পোষণ করতেন যে শুধু তাই নয়, তাঁর কাছাকাছি যাঁরা আসতেন তাদের মধ্যে সেই ভালবাসাটা সংক্রামিত হয়ে যেত।

অনি যখন কলেজে উঠেছে, তখন হাজারীবাগ থেকে মামাবাড়ির চিঠিতে, বাবার কাছে লেখা, জেনেছিল যে, বিজিতেন মামা মারা গেছেন সাপের কামড়ে, রাজডেরোয়ার জঙ্গলে কী এক দুষ্প্রাপ্য ফুলের গাছ সংগ্রহ করতে গিয়ে। ছেলেমেয়েদের স্কুল আগেই ছাড়াতে বাধ্য হয়েছিলেন। পাদপ না কি ড্রাইভিং শিখে পার্ল মোটর কোম্পানির বাস চালায়। বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে গেছে মামাদেরই কাছে। যা পেয়েছে, তা ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপোজিট করে মাসিক সুদ পায় কিছু। মেজমামাই বাড়িটি কিনে নিয়েছেন, ভেঙে, মডার্ন বাংলো করবেন বলে। কেনার পরই নাকি সব জঙ্গল কেটে সাফ করে দিয়েছেন। এখানে কেয়ারি করা বাগান হবে। সিঁদুর গাঁ থেকে মালী এসেছে।

তারপর অনির আর হাজারীবাগ যেতে ইচ্ছে করেনি। হাজারী সিংয়ের সঙ্গে ওর মামাদের রুচি, শিক্ষা-দীক্ষা, ধ্যান-ধারনার তফাত ছিল না বিশেষ। হাজারী সিংয়ের মস্ত ব্যবসা ছিল বিড়িপাতার। আর মামাদের ছিল ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা।

খুবই ইচ্ছে করত পামরির কথা জানতে আর বিজিতেন মামীমার কথা। খাপরার চালের একটি বাড়িতে নাকি উঠে গেছিল পাদপরা। বড় মামীদের চিঠিতে পড়তো অনি যে, তখনও নাকি বিজিতেন মামীমার মুখের হাসি মিলোয়নি। পান্থপাদপ সাইকেল মেরামতির দোকান দিয়েছে

জলের ট্যাঙ্কের পথে। পামরি বাড়িতে বসেই মেয়েদের জামা-কাপড় সেলাই করে। অনিশের বয়স যদি এখন ঊনচল্লিশ হয়, পামরির বয়স হবে চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ। কেন জানে না, খুবই ইচ্ছে করত একবার হাজারীবাগে যায়, পামরি আর বিজিতেন মামীকেই দেখতে। পাদপ আর পান্থপাদপের সঙ্গে বিজিতেন মামা বা মামীমার কোনও মিল ছিল না। হিন্দি গান গাইত, স্থানীয় ছেলেদের সঙ্গ তাস পিটতো। তারাও অনিকে পছন্দ করেনি কোনও দিন, অনিও করেনি তাদের।

হাজারীবাগে যাওয়া হয়নি আর। মামারাও হাজারীবাগ ছেড়ে ধানবাদে চলে যান ক'বছর পরেই। ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা ধানবাদেই ভাল। নাতি নাতনিদের পড়াশুনোরও সুবিধে। তারপর থেকেই হাজারীবাগের সঙ্গে যোগসূত্রটি ছিন্ন হয়ে গেছে। মা যতদিন ছিলেন বিজিতেন মামীমার সঙ্গে চিঠিপত্রর আদান-প্রদান ছিল। মাঝে মাঝে বাবাকে লুকিয়ে টাকা পাঠাতেন পুজোর বা নববর্ষের আগে ওঁর আর পামরির জন্যে। মা চলে গেছেন আট বছর। তারপরে আর কোনও যোগাযোগ নেই। কিন্তু আজ যেমন, নীগাহিঁর অতির কোয়ার্টারের এই বারান্দাতে বসে, কালোজামুন আর নিমকি দিয়ে চা খেতে খেতে কৃষ্ণচড়া আর কদম গাছটাকে বালাপোষের মতো দাঁড়িয়ে থাকা এই শ্রাবণের বিকেলের নরম আলোর দিকে উদ্দেশ্যহীনভাবে চেয়ে হঠাৎই হাজারীবাগের কথা মনে পড়ে গেল। সেই সব রাত-দিন, হাসি-গান। পামরির গানের গলা খুব ভাল ছিল, একটা ভাঙা হারমনিয়ম বাজিয়ে ঠুংরী গাইত। পামরির চোখের মধ্যে এমন কিছু ছিল যা ভীষণই আকৃষ্ট করত অনিকে। ভারী এক বিষাদ ছিল পামরির মুখে। কিন্তু সেই বিষাদ সে সবসময়েই সে তার মা রেবা-মামীমার কাছ থেকে পাওয়া এক সুন্দর হাসি দিয়ে মুড়ে রাখত। সেই হাসি কারও বিশেষ পাওনা ছিল না। ও যখন ফাঁকা ঘরেও থাকত বা বারান্দাতে একা বসে, তখনও সেই হাসি পরে থাকত মুখে। চানঘরে যখন নাইতে যেত তখন ও কী করত তা জানতে খুব ইচ্ছে করত অনির। কিন্তু কৈশোর ও প্রথম যৌবনের অনেক কামরাঙা লাল-সাদা ইচ্ছের মতো সেই ইচ্ছেও কখনওই স্ফুরিত হয়নি।

আজ মধ্যপ্রদেশের এই খাদান এলাকার নীগাহিঁতে এসেই কেন যে হাজারীবাগের কথা, বিজিতেন মামার কথা, পামরির কথা, পান্থপাদপ গাছটির কথা এমন করে মনে পড়ছে কে জানে। হাজারীবাগের পামরি নামের সেই দুখিনী মেয়েটির আশ্চর্য মুখচ্ছবি যে তার বুকের মধ্যে এমন একটা স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে তা জানেনি অনিশ কখনও।

ভাবছিল, কলকাতা থেকে বেরিয়ে এই ফাঁকা জায়গাতে না এলে হয়ত, ব্যাকগিয়ারে এতগুলো বছর চলে গিয়ে গয়নার বাক্স নিয়ে এই সব প্রিয় ও পুরনো হিরে-মুক্তো নিয়ে খেলতে বসাও হতো না। যে যেখানে থাকে, কাজ করে, সেখান থেকে এই জন্যই সম্ভবত মাঝে মাঝে শিকড় উপড়ে নিয়ে কিছুদিনের জন্যে বাইরে আসা প্রয়োজন। ভাবছিল অনিশ।

চায়ের বাসন নিতে এল ছুটকু। অনি বলল, তোমার বাবু কখন আসবেন?

অন্যদিন তো ক্লাবে কিছু সময় কাটিয়ে খাবার আগে আগে চলে আসেন ন'টা নাগাদ। আজ তো আপনি আছেন, তাড়াতাড়ি আসবেন নিশ্চয়ই।

মানে, ক'টা নাগাদ?

ছুটি তো এখন ছ'টাতেই হয়ে যাবে, এখন যে শিফট চলছে সাহেবের, তাতে। শিফটের উপরে নির্ভর করে। সাহেব তো আর সবসময়ে বসা-কাজ করেন না।

তাই? তাহলে আমি একটু হেঁটে আসি।

কোনদিকে যাবেন? পার্ক কোনদিকে তা কি আপনি জানেন? দেখিয়ে দেব আমি?

আরে না না। পার্ক দিয়ে কী করব। আমরা কলকাতার মানুষ। তোমাদের বাড়ির এই সামনের পথটাই আমার কাছে পার্ক। ফাঁকা রাস্তা, অনেক গাছ, নিরিবিলি, এই তো পার্ক আমার।

বলেই, ছুটকুকে অবাক করে দিয়ে উঠে পড়ল বারান্দার বেতের চেয়ার ছেড়ে অনিশ।

ছুটকু বলল, আপনি কলকাতায় থাকেন সাহেব?

হ্যাঁ।

কলকাতাটা নীগাহিঁর কোন্ দিকে?

কোন্ দিকে?

ছুটকুর প্রশ্নে একটু মুশকিলেই পড়ল অনিশ। তারপর একটু ভেবে, পশ্চিমে আকাশের সূর্যের উল্টোদিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, পুব দিকে।

ছুটকু অনিশের নির্দেশিত দিকে কয়েক সেকেন্ড নিশ্চুপে চেয়ে রইল। তারপর বলল, ক'টাকা ভাড়া নেবে বাসের? বহুতই দূর কি? দশ টাকা নেবে?

অনিশ হেসে ফেলল, ছুটকুর কথায়। তারপর বলল, তোমার সাহেবকে বলব এরপরের বার যখন সে কলকাতাতে যাবে, তোমাকে নিয়ে যাবে সঙ্গে করে। আমার বাড়িতেই থাকবে তুমি।

আপনি বুঝি খুব বড়লোক সাহাব?

হেসে ফেলল অনি আবারও ছুটকুর কথাতে।

সারল্য যে এখানে এতো সাবলীল তা দেখে অভিভূত হলো। এমন সারল্যর কথা কলকাতাতে ভাবা পর্যন্ত যায় না। তারপর বলল, আমি বড়লোক নই কিন্তু পুরনো দিনের বাড়ি তো আমার। মস্ত বড় বড় ঘর, আমাদের বাড়িতে অনেকই জায়গা। আর আমি থাকিও একাই। তোমারই মতো একজন অনুচর আছে আমার, আমাকে দেখাশোনার।

মা-বাবা নেই?

নাঃ। কেউ নেই।

তার নাম কী?

কার?

যে দেখাশোনা করে আপনার?

ওঃ। তার নাম পোটকা।

তার দেশ কোথায়?

ছুটকুর ঔৎসুক্যে হেসে ফেলল অনিশ। বলল, তার দেশ কলকাতার দক্ষিণে, সমুদ্রর কাছাকাছি।

তার নাম পোটকা হলো কেন? পোটকা মানে কী?

ওরা যেখানে থাকে, সেখানে অনেকরকম মাছ পাওয়া যায়। পোটকা একরকম মাছের নাম। ওর পেটটা মোটা বলে ওর নাম পোটকা।

হেসে উঠল ছুটকু। বড় নির্মল সে হাসি।

অনিশ বলল, তোমার কাছ থেকে তোমার বাড়ির গল্প শুনব ছুটকু। আমি একটু হেঁটে আসি। সেই কাল বিকেলে ট্রেনে চড়েছি তারপর থেকে শুধু বসেই আছি। হাত-পা সব ধরে গেছে।

ঠিক আছে সাহাব।

একতলায় যে সাহেবরা থাকেন তাদের কী নাম?

শ্রীরামালু। মেমসাহেবের নাম মীনাক্ষী। ভারি ভালমানুষ ওঁরা। ছেলেমেয়ে নেই তো। আমাকে মাঝেমাঝেই দোসা আর বড়া খাওয়ান। সাহাবের জন্যে পাঠান। তবে বড়ই নারকোল খান ওঁরা। আর নারকোল তেল। আমার বদবু লাগে।

তা তুমি কিছু পাঠাও না ওঁদের? বদলে?

হ্যাঁ পাঠাই তো। সাহাবের বলাই আছে। যাই-ই ভাল পদ রান্না হয় নিরামিষ আমাদের বাড়িতে, তাই বেশি করে করি, আর ওঁদের পাঠিয়েও দিই। সবচেয়ে ভালবেসে খান ওঁরা রিকমচ্।

রিকমচটা কী জিনিস?

হায় রাম। রিকমচও খাননি? ডাল দিয়ে তৈরি হয়। বাংলাতে কী বলে বলতে পারব না। সাহাব এলে জিজ্ঞেস করে নেবেন।

অনিশ ভাবছিল, কলকাতার আঁতেলরা রাম বলে কেউ আদৌ ছিলেন কি না এই প্রশ্ন তুলে যখন জ্বালাময়ী ভাষাতে ইংরেজি-বাংলা কাগজে প্রবন্ধ লেখেন, তখন সারা ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষদের হৃদয়ে যুগ-যুগান্ত ধরে মৌরসীপাট্টা গেড়ে বসে থাকা রাম মুচকি হাসেন।

অনি সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে নামতে ভাবছিল, কত কীই যে আছে ওর অজানা। ছুটকুর সব ব্যাপারেই অমন ঔৎসুক্য দেখে ভারি ভাল লাগল। অনিশের বাবা দু'টি বাক্য প্রায়ই বলতেন, বলতেন প্রায় স্বগতোক্তিরই মতো। শুনে শুনে, গীতার শ্লোকের মতো মুখস্ত হয়ে গেছে

অনিশের। প্রথমটি হলো 'শিক্ষিত আর অশিক্ষিতর মধ্যে তফাত শুধু ঔৎসুক্যর। অশিক্ষিত মানুষের ঔৎসুক্য থাকে না আর শিক্ষিতর থাকে।' দ্বিতীয়টি হলো, 'নৈঃশব্দর চেয়ে বড় শব্দ আর নেই।'

গাছের নিচে নিচে প্রায় আধ কিলোমিটার হেঁটে গেছে অনিশ লাল কাঁকড়ের সফট্ শোলডার দিয়ে—পিচ-বাঁধানো পথটাকে এড়িয়ে, এমন সময়ে রায়ের সঙ্গে দেখা হলো। বলল, কালকে আমিও যাচ্ছি পিকনিকে।

তা? বাঃ। ভালই তো। তারপর বলল, আপনি এদিকেই থাকেন বুঝি?

না, না। আমার কোয়ার্টার ওই দিকে। বলে হাত দিয়ে দেখালেন দূরে। তারপর বললেন, অতিদাদার মতো বড় কাজ তো করি না আমি। আমাদের কোয়ার্টার খুবই সাধারণ।

কথাটার মধ্যে কোনওরকম ঈর্ষা বা খোঁচা ছিল না। হাসতে হাসতেই বললেন রায় কথাটা। তারপর বলল, একদিন নিয়ে আসব আমাদের বাড়িতে আপনাকে।

কে কে আছেন বাড়িতে?

মা আছেন। মায়ের এক মাসতুতো দিদি আর তাঁর মেয়ে। সে আমার চেয়ে ছোট।

বিয়ে করোনি তুমি?

এই রোজগারে বিয়ে! বিয়েটা ক্রমেই অধিকাংশ মানুষের কাছেই বিলাসিতা হয়ে উঠছে। আর যারা অ্যাফোর্ড করতে পারে, তারা বিয়ে করে বিয়ে ট্যাকাতে পারছে না।

তারপর, যেন কোনও ভারী গোপন সামরিক তথ্য পাচার করছে এমন ভাবে এদিক-ওদিক চেয়ে গলা নামিয়ে বলল, স্টেডি ডেথ।

অনিশ মজা পেল রায়ের কথাতে। বলল, কিছু একটা করুন। মানে, বাঁচিয়ে তো রাখতে হবে, এতদিনের ঐতিহ্য একটা।

শিশুর মতো হাসলেন রায়বাবু। বললেন, আমি কি ওসব পারি। মুমূর্ষু গাছ দিন আমায়, যে-কোনও মুমূর্ষু গাছ, আমি ঠিক বাঁচিয়ে দেব। কিন্তু মানুষ! ওরে বাবা।

হাসল অনিশ। বলল, কাল আপনি কি একাই যাবেন?

সম্ভবত। আমার মাসতুতো বোনকেও বলেছি, অনেকবারই বলেছি। কিন্তু ঘরকুনো। যেতে চায় না কোথাওই। লাজুক ভারী।

কী করে তোমার মাসতুতো বোন?

ও কিছু করে না। মানে করে, বাড়িতে গান আর সেলাই শেখায়। বাড়ির কাজ তো করেই। ফর্ম্যাল এডুকেশন খুব একটা নেই। ডিগ্রি না হলে তো চাকরি হয় না। অথচ ও অনেক শিক্ষিতর চেয়ে বেশি শিক্ষিত। ও আরও একটা জিনিস করে, বই পড়ে। ইংরেজি-বাংলা বইয়ের পোকা একেবারে। হিন্দিও পড়ে। মুখ্যত ওরই উৎসাহে আমাদের এলাকাতে আমরা একটা ফাঁকা গ্যারাজ ঘরে বাংলা বইয়ের লাইব্রেরি চালু করেছি। পঁয়ত্রিশজন গ্রাহক এখন। এই রকম জায়গাতে নেহাৎই কম নয়। বিশ্বজিৎদাকে ওরা ধরেছে ওঁর ভায়রাভাই স্বপ্নময় চক্রবর্তীকে একবার নিয়ে আসবার জন্যে। একবার কবি সম্মেলনও করেছিলেন বিশ্বজিৎদারা।

এখানে অনেক কবি আছেন বুঝি।

অনেক না হলেও আছেন কিছু। কবিতা লেখা তো সাইকেলে চড়া শেখার চেয়েও সোজা কাজ। তাই কবির অভাব কী?

তুমি নিজে লেখো?

হাসলো রায়। ভারি মিষ্টি হাসি।

বলল, লিখি। কিন্তু কারোকে দেখাই না। কেউ জানেও না। আপনাকেই প্রথম বললাম।

জোরে হেসে উঠল অনিশ। বলল, এই তো আসল কবির লক্ষণ।

তারপর বলল, কালকে কিন্তু পকেটে দু'টো অন্তত নিয়ে এসো। আমরা শুনব। কবি হিসেবে তোমকে আমিই পরিচিত করিয়ে দেব কাল।

তাহলে কিন্তু আমি যাচ্ছি না। অতিদাকে বলবেন। এখানে গোদা গাঙ্গুলি, সবজান্তা লাহিড়ী কত বড় বড় কবি আছেন। তাছাড়া, আমার কবিতা একেবারেই আমার নিজস্ব সম্পত্তি। কাউকে দেখাতে পারব না মরে গেলেও।

এমনভাবে কথাটা বলল রায়, যেন অনিশ ওর পুরুষাঙ্গই দেখতে চেয়েছে। হেসে ফেলল ও রায়ের কথাতে। বলল, ঠিক আছে না দেখালে না দেখাবে। পিকনিকে যাবে অবশ্যই। বোনকেও নিয়ে এসো, গান শোনা যাবে।

সে তো রূপাদিদিই থাকবে। গান তো তিনিই গাইবেন!

তাই?

হ্যাঁ তো।

তবু তোমার বোনকেও নিয়ে এসো।

দেখি। সে তো আমারও ওপর দিয়ে যায়। অথচ গান কিন্তু সত্যিই দারুণ গায়। বম্বে গেলে খুব নাম করতে পারত। সন্দেহ নেই।

কিছু বলল না অনিশ। ভাবছিল, "বম্বে গেলেই" যদি নাম করা যেত, তবে আর দুঃখ ছিল কি? বম্বেতে শারীরিকভাবে পৌঁছনো আর নায়িকা বা গায়িকা হিসেবে নাম করার মধ্যে কত চোরাবালি, মরাসোঁতা পেরিয়ে যেতে হয়, তা সম্ভবত রায় জানে না।

চলি। দেখা হবে তাহলে কাল।

বলে, এগোল অনিশ, রায়ের বিপরীত মুখে।

এসো কিন্তু।

দেখি কী করি।

বলল, রায়।

সাধারণ-সাধারণ সব সিদ্ধান্ত নিতেও এতো দ্বিধাগ্রস্ত হতে খুব বেশি মানুষকে দেখেনি অনিশ। এর সঙ্গে বেশিক্ষণ সময় কাটালে এর দ্বিধা অনিশের মধ্যেও চারিয়ে যেতে পারে। দ্বিধার মতো সংক্রামক রোগ খুব বেশি নেই।

পুরো গোলাইটাতে এক চক্কর লাগিয়ে যখন ফিরল অনিশ অতির কোয়ার্টারে, তখন দেখল, অতি, ফিরে দোতলার বারান্দাতে বসে চা খাচ্ছে। ওকে দেখতে পেয়েই দাঁড়িয়ে উঠে বলল, কোনদিকে গেছিলি? তোকে তো দেখলাম না ফেরার পথে।

রায়-এর সঙ্গে দেখা হয়ে গেছিল। গল্প করতে করতে এগিয়ে গেছিলাম। কোনও জিপ তো দেখলাম না পথে। তুই কিসে করে এলি!

জিপে তো আসিনি। অ্যাম্বাসাডরে এসেছি। চ্যাটার্জিদা নামিয়ে দিলেন।

কোন চ্যাটার্জি? অগ্নিভ চ্যাটার্জি? তোদের সি.জি.এম?

আরে না না। আয়। ওপরে আয়, কথা হবে। চ্যাটার্জি এখানে গণ্ডা গণ্ডা আছে।

ওপরে উঠে গেলে অতি বলল, খাবি নাকি আরেক কাপ চা?

দে খাই।

চান করবি?

এখন করব না। বরং রাতে শোওয়ার আগে করব। ঘুম ভাল হবে।

গরম জলে করিস কিন্তু। ও বাথরুমে গিজার নেই। তুই আমার বাথরুমেই করে নিতে পারিস।

লাগাসনি কেন গিজার?

আমার বাথরুমে তো আছেই। কী হবে। থাকি তো একাই। কালেভদ্রে কেউ এলে এইভাবে চলে যায়। আমার তো ছেলেমেয়ে নেই যে বুড়োবয়সে দেখবে আমাকে। তাই সঞ্চয়ের কথা ভাবতে হয় বৈকি। তবে যা ইনফ্লেশান, ব্যাঙ্কে টাকা থাকা না থাকা সমান।

ভাবছ তাই? ছেলেমেয়ে থাকলে তোমাকে দেখে উল্টে দিত। তবে অত হা-হুতাশেরই বা কী আছে। বিয়ের সময় তো তোর এখনও পেরিয়ে যায়নি। তুই তো আর অরক্ষণীয়া কন্যা নোস।

না রেঃ। বেশ আছি। ভাবতো, আমার যদি স্ত্রী থাকত তবে, সে স্ত্রী যত ভালই হোক না কেন, তুই কি আমার এখানে এমন ফ্রীভাবে থাকতে পারতিস। বাধো বাধো ঠেকত না? প্রত্যেক স্ত্রীই অজানিতে স্বামীর ওপরে প্রভাব ফেলেই। স্বামীও ফেলে স্ত্রীর ওপরে। স্বাভাবিক তা। তাই দু'জনেই না জেনেই অনেক বদলে যায়। আমি নিজেকে বদলাতে চাই না।

এটা ঠিক বলছিস না। তোর স্ত্রী থাকলে আমার আদর-যত্ন-আরাম হয়ত বেশিই হতো।

যাকগে বাবা। চারধারে যা দেখি। না করেছি, ভালই করেছি।

কী দেখিস? ইনফিডিলিটি?

আরে নাঃ। তা নয়। তাহলেও তো বেশ ইন্টারেস্টিং হতো। বন্ধুদের স্ত্রীতেই নিজের কাজ চলে যেতো। যেটা আমাকে Repulse করে সেটা হচ্ছে একঘেয়েমি। থোড়-বড়ি-খাড়া, খাড়া-বড়ি-থোর। এক দম্পতির সঙ্গে অন্য দম্পতির বিশেষ তফাত দেখি না। চাওয়া-পাওয়া চিন্তা-ভাবনা আশা-আকাঙ্ক্ষাতে। একেবারে প্রোটো-টাইপ একে অন্যের। এটাই আমাকে ভীষণই হতাশ করে। দুরর্ বেশ আছি।

বলেই বলল, ও ভাল খবর আছে। অগ্নিভদার বাড়িতে সামনের শনিবার আবার আকবর আলি খান গাইবেন। রেনুকুট থেকে বিন্ধ্যাচলে বিড়লাদের গেস্ট হাউসে একটি ছোট্ট প্রোগ্রাম করতে গেছেন সিলেক্টেড অডিয়েন্সের জন্যে। তারপর ওখানে দু'দিন বিশ্রাম নিয়ে আসবেন।

বিন্ধ্যাচল তো উত্তরপ্রদেশে না?

তাই তো। আমাদের এই সিঙ্গরাউলি তো উত্তরপ্রদেশ-মধ্যপ্রদেশের সীমান্তেই। স্টেশন থেকে আসার সময়ে তোকে বলিনি?

হ্যাঁ।

তারপর অতি বলল, তুই কী গান শুনবি? ক্যাসেটের আলমারির চাবি দেব?

নাঃ। আজ প্রথমদিন এলাম। তাই কিছুই বিশেষ না-করাটাই ভাল লাগছে।

ফাইন। যা ভাল লাগে তাই কর। বী হ্যাপী। রিল্যাক্স কর। আনওয়াইন্ডিং প্রসেস সবে শুরু হয়েছে। একটা একটা করে দিন যাবে, আর ভাললাগা বাড়বে। তারপর যাওয়ার দিনে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে বলবি, 'অতি, আমি আর ফিরে যাব নারে, আর চাকরি করব না, আমাকে খাদানের কুলি করে দে।'

জোরে হেসে উঠল অনিশ, অতির ভাঁড়ামি দেখে। বলল, ভাল বলেছিস। তারপর বলল, শৈলেশ গুহনিয়োগী কি তোদের এখানেই ছিলেন? এ তো মধ্যপ্রদেশই।

আস্তে কয়েন কর্তা, ঘোড়ায় শুইন্যা হাসব। এটা মধ্যপ্রদেশ অবশ্যই, তবে ছত্তিশগড় না। ছত্তিশগড় হচ্ছে আমাদের এস.ই.সি.এল-এর এলাকাতে।

সেটা কী?

সাউথ ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটিড। বিলাসপুরে হেডকোয়ার্টার। বহু দূর বিস্তৃত তার এলাকা। 'আদল বদল' উপন্যাসের পটভূমি। অমরকন্টক, নর্মদা আর শোন নদের উৎস যেখানে, সেই হচ্ছে ছত্তিশগড়। তবে শৈলেশ গুহনিয়োগীর অ্যাক্টিভিটি ছিল দুর্গ্ এবং ভিলাইয়েরও পশ্চিমে দল্লি-রাঝাড়ার লোহার খনির এলাকাতে। বিলাসপুর থেকে অনেকই দূর।

তাই?

ইয়েস স্যার। তুই "পরদেশিয়া" পড়েছিস? রোম্যান্টিক উপন্যাস। ভেরি ইন্টারেস্টিং রীডিং। বিলাসপুর আর অমরকন্টকের পটভূমিতে লেখা।

পড়িনি তো।

আমার কাছে সম্ভবত আছে। না থাকলে, পামরির লাইব্রেরিতে পাবিই।

পামরির লাইব্রেরিটা কী ব্যাপার? পামরি কি কোনও জায়গার নাম?

অতি হেসে বলল, নানা, পামরি একজন মহিলার নাম। মহিলা বলা ঠিক নয়, আমাদের চেয়ে ছোটই হবে অনেক। অদ্ভুত নাম, না? পামরি।

হুঁ। ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার।

আচ্ছা আমি এবারে চানটা সেরে নিই তারপর তোকে নিয়ে বেরোব আমার গাড়ি করে।

গাড়ি করে মানে?

আরে ওই হলো! মোটর সাইকেলে। দু'টো চাকা কম বলে সে কি গাড়ি নয়।

কোথায় যাবি?

নো হোয়ার ইনপার্টিকুলার। তোকে জায়গাটি ঘুরিয়ে দেখাব। সো দ্যাট উ্য মে হ্যাভ আ ফীল অফ দ্যা প্লেস।

চল।

ওরা যখন বেরুলো তখন সোয়া সাতটা বাজে। এর আগে কখনও মোটর সাইকেলে চড়েনি। বেশ লাগে। দু'দিকে-দু-পা দিয়ে বাতাসকে রমণ করতে করতে নিজের নানা সুপ্ত ইচ্ছাকে পথের দু'পাশের বৃষ্টিভেজা নরম জমিতে বপন করতে করতে ধুম-ধাড়াক্কা করে চলে যেতে। কিন্তু সামান্য যেতেই বাদ সাধলো একটা ল্যাজকাটা লাল কুকুর। সে মহা গোল তুলে তেড়ে এল এবং মোটর সাইকেলের পেছন পেছন দৌড়ে আসতে লাগল। গতি বাড়িয়ে কুকুরটাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলল অতি।

পামরি মানে জানিস?

হঠাৎই বলল অনিশ।

কী বললি?

চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল অতি।

মোটর বাইকে চেপে চলতে চলতে কথা বলতে হলে জোরে চেঁচিয়ে কথা বলতে হয়, জিজ্ঞেস করল অনিশ, কী বললি?

কী বললি? পামরি শব্দর মানে। হঠাৎ?

না, তুই বললি না একটু আগে, পামরির লাইব্রেরির কথা।

যাবি নাকি? আমাদের পথেই পড়বে।

এখনও খোলা আছে?

আটটা অবধি খোলা থাকে। আমার আপত্তি কী? তোর কাছে এসেছি, তুই যেখানে নিয়ে যাবি যাব।

'হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা, আমি যে পথ জানি না।'

তুই যে আমার উপরে এতখানি নির্ভরশীল তা তো জানতাম না।

আমিও কি ছাই জানতাম। এখানে এসেই না জানলাম।

তারপর বলল, তা এখন বল পামরি মানে জানিস কি না।

জানতাম না। ডিকশনারি দেখে বের করতে হয়েছিল ওই নামটা প্রথম শোনার পরে। পামরি এক রকমের পোকার নাম, যে পোকা ফসল নষ্ট করে।

বলিস কি? কন্যার নাম পামরি রাখেন এ কেমন বাবা?

কতরকমের বাবা-মায়ের সন্তান যে এখানে আছে। দুই বোন আছে, তাদের নাম জর্জেট আর শিফন। শাড়ির নামে নাম। দু-ভাইবোন আছে, তাদের নাম ফ্লোরা আর ফনা।

মানে?

এতো ইংরেজী নাম, Flora and Fauna.

সত্যি?

সত্যি। বলেই, জোরে হেসে উঠল অতি মোড় নিতে নিতে।

অনিশ বলল, আমার মামা বাড়ি ছিল হাজারীবাগে। সেখানে, মামাবাড়ির পাশের বাড়িতে একটা মেয়ে ছিল তারও নাম পামরি। তাদের দাদাদের নাম ছিল, পাদপ আর পান্থপাদপ।

পাদপ মানে হচ্ছে গাছ। পা দিয়ে জল পান করে বলে।

আর পান্থপাদপ?

পান্থপাদপও একরকমের গাছ। তাদের পাতাতে আঘাত করলে তারা কাঁদে, মানে জল বেরোয় পাতা থেকে।

তা দাদাদের নাম জানলি আর বোনের নামই জানলি না।

লজ্জা করত।

কেন? দেখতে খুব সুন্দরী ছিল। পেরেম হয়েছিল বুঝি?

সুন্দরী বলব না। তবে সে অন্য দশটা মেয়ের মতো ছিল না।

তা তো হবেই। অন্য মেয়েরা তো আর ফসল নষ্ট করা পোকা নয়।

তারপরেই অতি বলল, তখন ছেলেমানুষ ছিলাম। এত পেরেম-টেরেম বুঝতাম না, তবে বুকের মধ্যে একটু ব্যথা ব্যথা করত তার সঙ্গে দেখা হলেই।

খুব জোরে হেসে উঠল অতি মোটর সাইকেলের ইঞ্জিনের শব্দ ছাপিয়ে।

কোথাকার কথা বললি? হাজারীবাগ? তা পামরি তো হাজারীবাগেই থাকত। বছর পাঁচেক হলো ও গোপেন রায়ের কাছে এসেছে।

ও একা এসেছে?

না। সঙ্গে ওর মাও তো এসেছেন। রেবা মাসি। ভারি চমৎকার এবং সম্ভ্রান্ত মহিলা। উনি আসার পরে রায়ের মা হঠাৎ মারা যান। প্রথম সেরিব্রাল অ্যাটাক। তখন থেকে রেবামাসিই মায়ের মতো দেখাশোনা করেন রায়কে।

এই পামরির মায়ের নাম যদি রেবা হয়, তবে হয়ত হাজারীবাগে আমি যে পামরিকে দেখেছিলাম, সেই পামরিই এই পামরি।

অতি বলল, সর্বনাশ করেছে। আবারও তো বুকে ব্যথা করবে তাহলে। প্রিভেনশান ইজ বেটার দ্যান কিওর। ডাক্তারখানায় নিয়ে যাচ্ছি। সরবিট্রেট না কী পকেটে রাখেন হার্টের রোগীরা, চল সেই ওষুধ কিনে নিই।

বলেই, মোটর সাইকেলের হ্যান্ডল ঘোরাল বাঁদিকে।

এই! কী করছিস অতি।

আরে লাইব্রেরির দিকে যাচ্ছি।

কিছুটা গিয়েই স্পিড কমিয়ে দিল অতি। স্বগতোক্তি করল, আলো জ্বলছে না কেন? ক'টা বেজেছে রে?

পৌনে আট।

তবে তো বন্ধ হওয়ার কথা নয় এখন।

লাইব্রেরিটা গ্যারাজ ঘরের পাশেই যে বাড়ির গ্যারাজ, সেই বাড়ির সামনে দু-তিনটে ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল হ্যালোজেন লাইটের নিচে। সেই হলদে আলোতে তাদের গায়ের রঙ আর পোশাকের রঙ বদলে গেছিল। বাইকটা থামিয়ে অতি একটা ছিপছিপে, উনিশ-কুড়ি বছরের সালোয়ার-কমিজ পরা এক বিনুনি-করা মেয়ের বেণী ধরে টান মেরে বলল, অ্যাই ঝিমলি, লাইব্রেরি আজ তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে গেল কেন রে?

ইসস্। কী করো না অতিদা। লাগে না বুঝি?

যাতে লাগে, সেই জন্যেই তো বেণী টানা। বল না?

লাইব্রেরিয়ান কাল পিকনিকে যাবেন। দই-মাংস রান্না করে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব পড়েছে পামরিদিদির ওপরে। তাই তাড়াতাড়ি বাড়ি গেছে।

তা গেছে। কিন্তু তোরা কেউ আটটা অবধি থাকলি না কেন লাইব্রেরিটা খুলে?

ভারি বয়ে গেছে। বই আনাওই না তোমরা। কবে লিস্ট জমা দিয়েছি।

তাই? আচ্ছা দেখব তো। কথা বলব পামরির সঙ্গে। কিন্তু পিকনিকে যাচ্ছেটা কোথায়?

ঝিমলি নামের তন্বী তরুণী বলল, আহা। যেন জানে না। ঢং। নিজেই তো পালের গোদা আর ঢং করছ জানো না। কই মারা গুম্ফাতে আমরাও যাইনি, আমাদের নিয়ে তো একদিনও গেলে না? এই বর্ষাকালে কেউ পিকনিকে যায়?

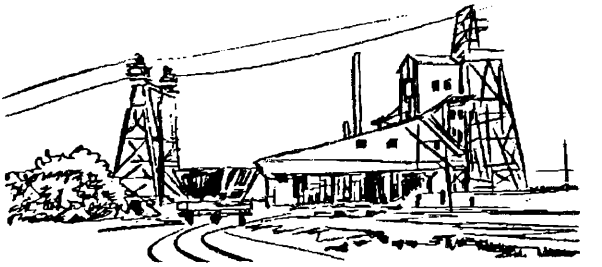

বাবাঃ! এটা কী রে। এ যে সত্যিই ডাইনোসরের বাবা।

হ্যাঁ। দ্যাখ এবারে নয়ন খুলে।

বাসরে। এত বড় বড় যন্ত্র চালাস তুই?

এখনই কি? ড্রাইভিং ক্যাবিনে ওঠ। তবে তো বুঝবি।

একবার দিল্লীর ফ্লাইটে এয়ার বাসের ককপিটে গেছিলাম। আমার এক বন্ধুর দাদা কো-পাইলট ছিলেন।

হ্যাঁ। পাইলটদের ওপরে ভক্তি হয়েছিল বটে। ক্যাপ্টেন আর কো-পাইলটকে ওই হাজার আলো-জ্বলা প্যানেলের সামনে বসে মোস্ট ক্যাজুয়ালি কফি খেতে দেখে বিশ্বাস করতেই কষ্ট হচ্ছিল যে ওঁরা আমাদেরই মতো মানুষ।

দিনে গেছিলি না রাতে?

রাতে। দিনে গেলে তো তাও পৃথিবীটাকে চেনা চেনা ঠেকত। অন্ধকার রাত, অমাবস্যা-টমাবস্যা ছিল বোধহয়। যেদিকে তাকাই, সেদিকেই অগণ্য তারা, কত লক্ষ লক্ষ গ্রহ-নক্ষত্র নিয়ে আর তার মাঝে এয়ার-বাসকে অটো-পাইলট-এ দিয়ে একজন সুন্দরী স্টুয়ার্ডেসের সঙ্গে কফি খেতে খেতে গল্প করছিল।

ফুঃ! এয়ার বাসের ককপিটে গিয়েই ওই! তাহলে কনকর্ড-এর ককপিটে গেলে তুই তো ভির্মি খেতিস। এতেই অভিভূত আর তুই-ই নাকি বিজ্ঞান বিরোধী?

বিরোধী নই। আদৌ নই। তবে বিজ্ঞানের অগ্রগতির এক জায়গাতে থামা উচিত বলে মনে করি আমি।

ভালই বলেছিস। সেই গান আছে না, রবীন্দ্রনাথের—

"এ বোঝা আমার নামাও বন্ধু নামাও, ভারের বেগেতে ঠেলিয়া চলেছি এ যাত্রা তুমি থামাও।

আপনি যে দুঃখ ডেকে আনি সে যে জ্বালায় বজ্রানলে—

অঙ্গার করে রেখে যায় সেথা কোনো ফল নাহি ফলে!"

কনকর্ডও তো একদিন ভেঙে পড়তে পারে, যেমন টাইটানিকও ডুবে গেছিল একদিন।

তাতে কী? সো হায়োট? বিজ্ঞান থামতে পারে না, জানে না থামতে। বিজ্ঞানের ঘোড়া যেদিন থামবে, সেদিনই সে মরবে। বিজ্ঞানের থামা মানেই মরা।

আর তার সঙ্গে মরবি তোদের মতো বিজ্ঞানের ঘোড়ার চড়া বিজ্ঞাননির্ভর মানুষেরা। তোরা তোদের নিজস্বতা, তোদের মানুষী ব্যাপার-স্যাপার বলে কিছুমাত্র আর অবশিষ্ট রাখবি না আর। তোদের এই অগ্রগতি, তোদের মতো মানুষদের শিগগিরি একদিন দাঁতও মাজিয়ে দেবে, শৃঙ্গার মসৃণ করাবে, রমণও করিয়ে দেবে। আর কী চাস?

আমি কিছুই চাই না।

তোর সময় এলে, বিজ্ঞান যদি তোর বদলে, অন্য কারোকে পটল তোলাতে পারত, তাহলে দেখে বড় সুখী হতাম। পটল তো তোকেও তুলতে হবে একদিন। এতো যে কেদ্দানি, তার শেষ তো একদিন হবেই, যেদিন জীবন শেষ হবে। তবে?

জীবনও হয়তো অশেষ হবে একদিন। কে বলতে পারে।

তার মানে তোদের মতো মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিজ্ঞান-নির্ভর মানুষই পৃথিবীর মালিকানা ভোগ করবি, আর কারোকেই ঘেঁষতে দিবি না কাছে।

দেব না কেন? যাদের আনা হবে পৃথিবীতে তাদেরও আমরাই আনব—গুনে-গেঁথে, রূপ-গুণ বিচার করে। ফালতু মানুষ পৃথিবীতে আর থাকবে না। ডি-উইভিং করে ওদের সব নির্মূল করব আমরা।

ঈশ্বর করুন সেই ভয়ঙ্কর দিন যেন আমার দেখতে না হয়।

এসব কথা থাক। এখন ওঠ লিফটে।

লিফটে করে উঠতে হবে নাকি ড্রাইভিং ক্যাবিনে?

ইয়েস স্যার। হাইড্রলিক লিফট আছে।

চল।

ড্রাইভিং ক্যাবিনে উঠে অতি যখন ড্রাইভিং সীটে বসল, তখন অভিভূত হয়ে স্বগতোক্তি করল অনিশ, ওয়াও।

সত্যি। কোন্ শালা বলে, "ওরে ভীরু তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার।"

রবীন্দ্রনাথকে শালা বলিস না।

আরে উনি কারও শালা তো ছিলেনই। হিরো ওরশিপিং-এর একটা সীমা থাক উচিত। এই করেই বাঙালির সর্বনাশ হলো!

থামা ওসব এখন। আরে এই ড্র্যাগ-লাইন তো ট্যাঙ্কেরই মতো দেখছি।

ট্যাঙ্কের চেয়েও অনেক বেশি উন্নত। এ সামনে পেছনে তো বটেই পাশাপাশিও চলতে পারে। ওই দ্যাখ ওপাশে যে ড্র্যাগ লাইনটা চলছে, শয়ে সয়ে টন কয়লা এক একবারে তুলে ডাম্পোরে ভর্তি করে দিচ্ছে আর ডাম্পার ছুটছে তা নিয়ে কনভেয়র বেল্টের দিকে। কনভেয়র বেল্ট ছুটেছে সাইলোর দিকে।

বানানটা কী?

Silo। যেখানে কয়লা জমা করে রাখা হচ্ছে। সাইলো থেকে মেকানিকাল ডিভাইস ও রেল লাইনে দাঁড়িয়ে-থাকা ওয়াগনের Rake-এ বোঝাই হচ্ছে। হয়ে চলে যাবে গন্তব্যে অথবা Loading Point-এ।

সত্যি। ভাবা যায় না। ওই নিচের জিপগাড়ি আর মানুষদের কেমন খুদে খুদে দেখাচ্ছে রে। কত ওপরে আছি আমরা?

আমাদের চেয়েও অনেক ওপরে আছে দ্যাখ ওই পাহাড়।

পাহাড়টার নাম কী? অনিশ জিজ্ঞেস করল।

বলিস তো তোর নামে নামকরণ করে দিই সি.এম.ডি সাহেবকে বলে? সি.জি.এম-কেও বলতে পারি। তারপরই বলল, ওটি তো আমাদেরই সৃষ্টি করা পাহাড়। তোকে বললাম না, Removal of

overburden-সংক্ষেপে R.O.B. ভূ-স্তরের উপরিভাগের সেই মাটি এবং কয়লা-মিশ্রিত মাটি সরিয়ে সরিয়ে ওই দিকে জমা করা হয়েছে, তাতেই এই বিরাট পাহাড় হয়ে গেছে। আর দ্যাখ ডানদিকে এবং মধ্যিখানে আমরা কয়লার Seams-এ কাজ করছি। দ্যাখ, যেন পাতালপুরীতে।

কতদিন করবি? এই কাজ? পাতালপুরীতে?

বহুদিন। জয়ন্ত্-এর খাদানের এলাকা ২৪৬৫ হেক্টর আর আমাদের ওই প্রজেক্টে সঞ্চিত আছে ৩৮৪৯ মিলিয়ন টন কয়লা। যেসব প্রক্রিয়াতে আমরা কয়লা তুলি এখানে, তা আধুনিকতম। নইলে আর শ্রেষ্ঠত্বর সম্মান পেলাম কেন? তাছাড়া, এখানে আমরা, টু-টিয়ারকে, বাংলাতে কী বলবি? দ্বি-স্তর?

হ্যাঁ।

দ্বি-স্তরে Effluent Treatment প্ল্যান্ট তৈরি করেছি আমরা জয়ন্ত্-এ।

খরচ হয়েছে কত?

আমি কি আর অ্যাকাউন্টস-এর লোক? তবে শুনেছি, প্রায় দু'কোটি টাকার মতো।

তার কত গেছে ঠিকাদারদের পকেটে? আর কত ফিরে এসেছে কেষ্ট-বিষ্টুদের হাতে আন্ডার-হ্যান্ডে?

দ্যাখ অনিশ। এই তো দোষ আমাদের। মানে, বাঙালিদের।

এই আমার বন্ধু অনিশ এসেছে কলকাতা থেকে। ওর জন্যেই অ্যারেঞ্জ করলাম। পুজোর পরেই তোর পিকনিক। তারিখ ঠিক কর। তোদের ইয়াং গ্রুপের সবাইকে নিয়ে যাব আমি আবার পিকনিক-এ। সব খরচ আমার। এই আমাদের মতো বুড়োদের সঙ্গে কী করতে যাবি? এরা তো নাচতেও জানে না। জানে না, তা নয়, মুখে গরম আলু পড়লে নাচে কিন্তু তোদের তো ঝিং-চ্যাক পার্টনার চাই। কি? চাইত?

দু'টো ছেলের একটা বলল, হুঁঃ। তুমি আবার বুড়ো। তুমি টামাকও খাও, ডুডুও খাও। সব দলেই তো তোমার সমান ডিম্যান্ড। উ্য আর লাইকড বাই এভরিবডি।

কেন বলত? বিয়ে করিনি তাই একটা বাজে নাক-উঁচু বা নাক-বোঁচা বউদি থাকলে তোদের হয়ত বনতই না তার সঙ্গে। মধ্যে দিয়ে বদনাম হতো আমার।

সেটা হয়ত ঠিকই বলেছ।

ঝিমলি বলল, যেমন শিরিষদাকে হারালাম আমরা। কী মজারই না ছিল শিরিষদা। বিয়ের পরে ওই গোমড়ামুখী নীলা বউদির পাল্লায় পড়ে বেচারির জীবনটাই ধ্বসে গেছে।

ভাবেছিস তোরা। যে জীবন তোদের সঙ্গে ছিল সেটা হয়ত ধসেছে, কিন্তু শিরিষের কোয়ার্টারের মধ্যে যে জীবন তা হয়ত অন্য দীপ্তি পেয়েছে। এসব কথা তোরা বুঝবি না। বড় হলে বুঝবি।

হাঃ। আর কবে বড় হবো বলতে পারো অতিদা।

ঝিমলি বলল।

আচ্ছা, এর জবাব পরে পাবি। এখন টা—টা।

কাল ভাল করে এনজয় কোরো। আমার জন্য একটু ফুল নিয়ে এসো জঙ্গল থেকে।

কী ফুল? আমি যা আনব তাই কি পছন্দ হবে? তখন বলবি, যুঁই ফুল চাই না, বেলফুল দাও।

তুমি যা ভালবেসে আনবে তাই নেব।

বাঃ আমার দেখছি তোকেই বিয়ে করতে হবে। মোটে কুড়ি বছরের বড় আমি তোর চেয়ে। তোর সঙ্গে বয়সের এত পার্থক্য, চলবে তো?

ঝিমলি বলল, তার ঝলমলে মুখে বুদ্ধি ও বিশ্বাসের ঝিলিক তুলে, যাকেই বিয়ে করি, আমি তো তার বয়সকে বিয়ে করব না, করলে, আস্ত মানুষটাকেই করব। তোমার হাসি, তোমার আনন্দ, তোমার মজা, তোমার গান, তোমার যত স্বপ্ন, তোমার দেওয়া ফুল সব কিছুকেই। বয়সটার কোনও আলাদা পরিচয়ই থাকবে না সেখানে।

উরি বাবাঃ। এটা কোন সিরিয়ালের ডায়ালগ রে? দিলি বটে একখানা। আজই অ্যাকসিডেন্ট হবে।

আজে বাজে কথা বোলো না।

তারপর অনিশের দিকে চেয়ে বলল, আছেন তো কিছুদিন। পরে আপনার সঙ্গে আলাপ হবে ভাল করে। আমরা সবাই পামরিদির অ্যাডমায়ারার। তাই সময় পেলেই লাইব্রেরিতে একটু হাওয়া বদলে যাই। সাহিত্যর গল্প হয়, গানের গল্প হয়, খু-উ-ব ভাল লাগে। টিভি-ফিভি আমাদের ভাল লাগে না। আমরা একদল আছি এখানে। সাহিত্যই-সর্বস্ব। তার কোনও বিকল্প হয় না।

বাঃ!

অনিশ বলল। পুরনো দিনের অনেক কথা ওর মনে পড়ে গেল। বিশেষ করে পামরির কথাতে, হাজারীবাগের কথাও।

অতি বলল, তোর জন্যে একটা ফুল আনব, যার নাম শুনেই তুই চটে যাবি।

কী নাম?

বেশরম।

ইঁ-ইঁ-ইঁ-ইঁ। মারব তোমাকে। বলেই, তেড়ে এল ঝিমলি। মোটর সাইকেলের দিকে।

হাতের অ্যাকসিলারেটর বাঁই করে ঘুরিয়ে অতি ঝিমলি। মোটর সাইকেলের দিকে।

হাতর হ্যান্ডলটা বাঁই করে ঘুরিয়ে, অতি ঝিমলির নাগালের বাইরে চলে এল, হাত তুলে বলল, চলি রে গুড নাইট এভরিবডি।

কার মেয়েরে? ভারি প্রাণবন্ত মেয়ে। অনিশ বলল।

ওর মা ও বাবা দু'জনেই গায়নোকলোজিস্ট। জয়ন্ত্-এর হাসপাতালে আছেন। চমৎকার দম্পতি। মেয়েটা যেমন সহজ, সোজা, খোলামেলা, সংস্কারমুক্ত, বাবা-মাও তেমনি।

তারপরই বলল, বেচারী! ওই বয়সে নিজের জীবন, নিজের বিয়ে নিয়ে কত সুন্দর স্বপ্ন থাকে। তারপর ধীরে ধীরে এই ডাইনি জীবনের লোলচর্মভরা শিরা বের-করা দু'টি হাত ধীরে ধীরে অধিকাংশ স্বপ্নকেই মুছে দিতে থাকে, বড় Ordinary, Mundane হয়ে ওঠে জীবন। তাই না?

তাই। অনিশ বলল। তবু তার মধ্যেই সেই প্রাত্যহিকতার ডাইনীর হাত থেকে জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা তো করতে হয়ই। তার কাছে হেরে না-যাওয়াটাই তো, মনুষ্যত্ব। আজকের ঝিমলির মতো মানসিকতা নিয়ে যদি জীবনের শেষ দিন অবধি বেঁচে থাকা যায়, তবে তার চেয়ে আনন্দের আর কী হতে পারে।

আরও দশ মিনিট মতো মোটর সাইকেলে গিয়ে একটা বেশ বড় হ্রদের কাছে এসে পৌঁছল অতি। তার পাশ দিয়েই রাস্তা চলে গেছে। রাস্তার অন্য পাশে পাহাড়। কোন্ পাহাড়টা যে স্বাভাবিক আর

কোন্‌টা ওভারবার্ডেন-সরানো মাটির তা স্থানীয় মানুষেরাই বলতে পারবেন।

অতি, বাইকটা পথের পাশে লাগিয়ে, পাহাড়ে সামান্য উঠে একটি বড় পাথর দেখে বলল, দ্যাখ পছন্দ তো? গ্র্যান্ড-স্ট্যান্ড ভিউ হলো তো?

ফার্স্ট ক্লাস।

তবে সাপ-ফাপ থাকতে পারে। তোর পেছনে কামড়ালে আমি তো তোকে টিকিয়া উড়ান চালিয়ে নিয়ে যাব জয়ন্ত্‌-এর হাসপাতালে, কিন্তু আমার পেছনে কামড়ালে তুই কী করবি?

তুই বল্‌?

তুই, আপ্রাণ চিৎকার করবি, পামরি। পামরি বলে।

মানে? ইয়ার্কি করছিস?

ইয়ার্কি করব কেন? তোর প্রেম যদি সাচ্চা হয়ে থাকে, তোর বুকের ব্যথা যদি সাচ্চা হবে থাকে, তবে পামরি তোর আর্তনাদ ঠিক শুনতে পাবে। পেয়ে, ফোনে যা করার তো করবে। এছাড়া করার তো কিছু নেই। তুই তো মোটর সাইকেল চালাতে জানিস না। এছাড়া আর কিই বা করতে পারবি?

বড় বাজে কথা বলিস তুই।

এই যাঃ!

অনিশ বলল, আমার পার্টনারকেই ছেড়ে এলাম।

কে তোর পার্টনার? বড় হেঁয়ালি করসি তুই। আগে জানলে আসতাম না।

রাম-এর বোতল, মিনারেল ওয়াটারের বোতলে জল, দু'টি নন-ব্রেকেবেল্‌ গ্লাস সব নিয়ে এসেছি, কাজুবাদাম, আর দেখেছিস, গাড়ি থেকে নামাতেই ভুলে গেলাম।

ও। এই জন্যেই পিঠে কী যেন বিঁধছিল।

হুঁ। রামেই যদি এতো ব্যথা, তবে রাবণ নিয়ে এলে তোর অবস্থা কী হতো।

আমি ওসব খাই না।

আমিও কি রোজ খাই? তোরই অনারে খাব আজ।

আমি খাব না।

বেরসিকের মতো কথা বলিস না। জয়ন্ত কুমারমঙ্গলমের সামনের হ্রদটার নামই হচ্ছে বীণা সাগর। আসলে ভীনা। জয়ন্ত কুমারমঙ্গলমের মেয়ের নামে নাম। জানি না, মেয়ে-জামাই স্বচক্ষে এই সাগর দেখে গেছেন কি না।

ন্যাচারাল লেক-এর নাম বদলে বীণা সাগর হল?

আরে ন্যাচারাল লেক নয়। কে জানে চতুর্দিকের এইসব...

দাঁড়া থলেটা নিয়ে আসি, বলে অতি মোটর বাইকের দিকে এগিয়ে গেল।

এসব নিলি কখন? আমি তো খেয়াল করিনি।

আমি নেব কেন? ছুটকুকে বলে গেছিলাম। সে সব ঠিকঠাক করে রেখেছিল, কোন্ ফাঁকে তুলে দিয়েছে। দ্যাখ, জলটা এখনও দারুণ ঠাণ্ডা আছে। তার মানে ফ্রিজ থেকে বোতলটা একেবারে লাস্ট মিনিটে বের করেছে।

ফিরে এসে, দু'টি গ্লাসে রাম ঢেলে, জল দিয়ে লেবুও চিপে, দু'টি কাঁচালঙ্কা ভেঙে বিচিগুলো ফেলে শুধু লঙ্কা দু'টি গ্লাসে ফেলে দিয়ে একটা চামচ দিয়ে নেড়ে, একটা গ্লাস অনিশের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, চিয়ার্স। ফর বীণা, চিয়ার্স ফর পামরি অ্যান্ড লাস্ট বাট নট দ্যা নট দ্যা লিস্ট চিয়ার্স ফর ঝিমলি, মাই সুইটিপাঈ।

'সুখ নেইকো মনে, নাকছাবিটি হারিয়ে গেছে হলুদ বনে বনে।'

চেনা চেনা লাগছে।

লাগবেই। আমাদের প্রথম যৌবনে এই দ্বিপদী উচ্চারণ করেনি এমন ছেলেমেয়ে ছিলই না বলতে গেলে।

কোথায় পড়েছিলাম বলত?

'হলুদবসন্ত' উপন্যাসের মুখবন্ধে।

বুদ্ধদেব গুহর লেখা?

সে তো 'হলুদবসন্ত'। এই দ্বিপদী অবশ্যই তাঁর লেখা নয়। কার যে লেখা তা জানার অনেক চেষ্টা করেও আনতে পারিনি। সম্ভবত লেখক নিজেই জানতেন না, জানলেও ভুলে গেছিলেন। সে যাইহোক, আমরা তো মাথায় করে রেখেছি সেই দ্বিপদীটাকে।

খেতে কি হবেই?

অনিশ বলল।

আলবাৎ হবে। নইলে, গল্প জমবে কী করে।

তারপর বলল, দ্যাখ, সাহিত্য-টাহিত্য যাঁরা সৃষ্টি করেন তাঁরা অভাগা বড়।

কেন?

ধর না, এই 'হলুদবসন্ত'ই সম্ভবত ষাটের দশকের শেষে অথবা একেবারে সত্তরের গোড়াতে বই হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল। তার লেখক আজকে নিশ্চয়ই বৃদ্ধ ভাম। তার নাতনী কারও প্রেমে পড়লে হয়ত সঙ্গে সঙ্গে খড়্গহস্ত হচ্ছেন অথচ এই লেখকই, আমাদের, বলতে গেলে বকিয়েছিলেন।

প্রেমে ইনিসিয়েট করা আর বকানো কি এক জিনিস? আই বেগ টু ডিফার।

যাইহোক। এই সব তর্কের শেষ নেই। তুই এনজয় করছিস তো।

হুঁ।

এই বীণা সাগর সম্বন্ধে একটু বল।

হ্যাঁ। আমার মনে হয় এই সব পাহাড়ের নিচে একটা ন্যাচারাল ডিপ্রেসান ছিল। তাতে বৃষ্টির জল জমে জমে একটি ঝিলের সৃষ্টি হয়েছিল হয়ত বহু বছর আগে। কিন্তু সেই ঝিল আর আজকের বীণা সাগরের মধ্যে অনেকই তফাত।

কেন?

ভারতের সবচেয়ে বড় কয়লা খাদান 'জয়ন্ত্-এর কয়লার সিমস্-এর

বুক থেকে যে জল বেরোয় তা এই বীণা সাগরেই পাম্প করে এনে ফেলা হয়।

কয়লার বুকে জল থাকে না কি?

কী বলছ দোস্ত! জল, কার বুকে নেই। তোমার বুকে নেই? না, আমার বুকে নেই? নাকি তোমার পামরির বুকে নেই, না যৌবনের জল-পাওয়া, তরতর করে পাতা-ছাড়া ঝকঝকে ঝিমলির বুকেই নেই। বুক থাকলে জল থাকবেই। চোখ থাকলে যেমন চোখেও জল থাকে।

বলেই, আবার আবৃত্তি করল, 'নীগাহ যায়ে কাঁহা সীনেসে উঠকর, হুয়া তো হুসন কি দৌলত গড়ী হ্যায়।"

অনিশ বলল দ্যাখ অতি, তুই মাঝেমাঝে এমন ভাব করিস যেন, মীর সাহেবের পর তোর চেয়ে বড় শ্যায়ের আর হিন্দুস্থানে জন্মায়নি।

দু'কানে হাতের বুড়ো আঙুল আর মধ্যমা ঠেকিয়ে গাইয়ে বাজিয়েরা যেমন গুরুর নাম করলেই কানে হাত দেন, তেমনি করে অতি বলল, আমি মুসলমান না হয়েও বলছি তওবা। তওবা। অমন ভাবার মতো বদতমিজি আমার যেন কখনও না হয়।

অনিশ বলল, শোন এবারে। আমি একটা বলি। শের বলবার আর শোনবার মতো এমন জায়গা তো কলকাতাতে পাওয়া যায় না।

কার শের? মীর্জা গালিবের?

না। অধিকাংশ বাঙালিই নাসিরুদ্দিন শাহের মীর্জা গালিব দেখার পর থেকে মীর্জা গালিবের ওপরে যেন অথরিটি হয়ে গেছে। শুধু মীর্জা গালিবের দু-চারটে শায়রী জেনে নিজেকেই শ্যয়র ভাবতে শুরু করেছে।

যেমন তুই।

তুই... কী যেন বলতে গেল অতি, কিন্তু তার আগেই অনিশ বলল,

"ইসক্ জফর হ্যায় গোরখধান্দা
খোলে উসকি পেচ কোয়ী ক্যা
এক খুলা তো দুসরা মেহকস
পেচকে উপরে পেচ পড়া"

কার এটা?

জাফর।

বহুত খুউব। তুই তো দেখছি, ছুপা রুস্তম।

আমার কিছুই ছুপা নেইরে অতি—সবই খুলা। তাই তো এত দুঃখ।

এই তো দোষ কলকাত্তাওয়ালাদের। এই রকম উদলা জায়গাতে এলেই, খোলা আকাশের নিচে বসলেই, যত দুঃখ সব উথলে ওঠে একেবারে। সত্যি কথা বলতে কি, তোদের সকলেরই কমন রোগ হলো দুঃখবিলাস। এর ওষুধ হলো রোজ সকালে উঠে দাঁত না মেজে, চারটে কাঁচালঙ্কা, এক মুঠো কালমেঘ পাতা বেটে বড় চামচের এক চামচ মধুর সঙ্গে খেয়ে নিবি। দুঃখবিলাস এক মাসে সুখবিলাসে পৌঁছে যাবে, তোকে সবাই সুখবিলাসী বলে ডাকবে।

হেসে উঠল অনিশ অতির কথাতে।

ধীরে চুমুক দে। একটা পাঁইট এনেছি, দু'জনে মিলে শেষ করে রাতে গিয়ে কষা-মাংস আর পরোটা খাব। সঙ্গে মোষের দুধের রাবড়ি। জমে যাবে।

আমি একটাই খাব।

একটা খাসনি বাবু। একটা খেলে গৃহস্থর অকল্যাণ হয়।

তোর তো এসব নেশা ছিল না। ধরলি কবে? ছেড়ে দে।

ধরিওনি, ছাড়ছিও না।

তুই কি আমার বড়পিসিমা যে, তোর কথাতে আমার উঠতে বসতে হবে? তবে একটা কথা বলি তোকে, আমি কোনও নেশাকে পেতে পারি, কোনও নেশা আমাকে পাবে না। এখানে নানারকম মানুষের সঙ্গে মিশেছি। গাঁজা, সিদ্ধি, নস্যি, খৈনী, মদ সবরকম নেশা করেছি, কেমন লাগে তা দেখারই জন্যে। কিন্তু কারোকেই পেয়ে বসতে দিইনি। দেবও না। সিগারেট তো ছেড়ে দিয়েছি, যেটা সত্যিই নেশা ছিল। তুইও পারলে ছেড়ে রে।

দেখি। আমার তো সিগারেট ছাড়া আর কেউই নেই। মা চলে যাওয়ার পরে আরও একা লাগে।

এসব বাজে কথা। সিগারেটটা ছাড়। কারও মা-ই চিরদিন থাকেন না। কচি খোকা।

হুঁ। বীণা সাগরের কথা বল।

অনিশ বলল।

আমাদের এখানে যে আটটি খাদান আছে, সবই ওপেনকাস্ট মাইন। তোকে বোধহয় গর্বীর কথা বলিনি।

না। কী নাম বললি?

গর্বী। গর্বী দু'নম্বর।

এক নম্বর গর্বীর কী হলো?

কী আর হবে। সাধারণত এক নম্বর গর্বীদের যা হয়। পতন হয়েছে। অর্থাৎ বন্ধ হয়ে গেছে।

কী সুন্দর সব নামগুলো রে তোদের খাদানের। নীগাহিঁ, বীণা, আনপাড়ী, কাকড়ি, খেদিয়া, জয়ন্ত, সিঙ্গরাউলি, আমলোরি, ঝিঙ্গুরদা, দুধিচুয়া আর গর্বী। প্রত্যেকটি নামেরই নাম-মাহাত্ম্য আছে।

তবে এর মধ্যে বীণা ও জয়ন্ত অবশ্য কুমারমঙ্গলম্ সাহেবের দেওয়া নাম।

এবারে খাদানের কথা বল। কয়লা জন্মায় কী করে।

কিন্ডারগার্টেন ক্লাসের ছেলের মতো কথা বলিস না তো। কয়লা কি ব্যাঙচি না কাকের বাচ্চা যে, ডিম ফুটে বেরোবে? কত কোটি কোটি বছর আগের সব গাছ-গাছালি মাটি চাপা পড়ে, জল চাপা পড়ে থেকে থেকে প্রস্তরীভূত হয়ে গেছে। হয়ে গিয়ে, কয়লা হয়ে গেছে। কয়লা সবসময়েই ভেষজ। অন্যভাবে কয়লা হয়নি কখনওই। পাথরের মধ্যে, পাহাড়ের খাঁজ-খোঁজের মধ্যে স্তরে স্তরে কয়লা থাকে। কোথাও কয়লা বের করা হয় ইনক্লাইন বা শ্যাফট পদ্ধতিতে। লিফটে করে স্তরে স্তরে পরতে পরতে নিচে নেমে কয়লা তুলতে হয়। খনির নিচে কয়লার মস্ত মস্ত পিলার বা স্তম্ভ ছেড়ে ছেড়ে কয়লা কেটে বের করতে হয়। স্তম্ভ ছাড়তে হয়, যাতে ওপর থেকে ওপরের মাটির স্তর হুড়মুড় করে ভেঙে নিচে না পড়ে। অনেক সাবধানতা অবলম্বন করেই সব কাজ করতে হয় তবু

দুর্ঘটনা কখনও সখনও ঘটে ওইসব মাইনে। একদিকের সব কয়লা কেটে বের করে আনা হয়ে গেলে তখন বালি দিয়ে সেই শূন্যস্থান ভর্তি করে দিতে হয়। তাকে বলে 'স্টোয়িং'। প্রত্যেকটি মাটি, পাথর ও কয়লার স্তরের মধ্যে মধ্যেই জল থাকে। সেই জলধারার জল পাম্প করে এনে ফেলতে হয় বাইরে, নইলে কাজের অসুবিধে হয়। জল জমেও থাকে এক এক জায়গাতে—তাকে বলে Water Table. জানিসই তো যে, মাটি এবং আকর দু'রকমের হয়—এক ধরনের Porus যার মধ্যে দিয়ে জল চুইয়ে যায়। অন্য রকম হচ্ছে Impervious. এই Impervious লেভেলের ওপরেই Water Table থাকে।

এই সব জায়গা, মানে যেসব জায়গাতে কয়লা পাওয়া যায়, সেখানে কি শুধুই কয়লাই পাওয়া যায়।

না রে! তা কেন? আরও নানা আকর পাওয়া যেতে পারে সেখানে।

যেমন?

যেমন ধর বক্সাইট। মুখ্যত বক্সাইট। তাই দেখবি, কয়লা খাদানের কাছাকাছি আলাদা বক্সাইট খাদানও থাকে। নর্দার্ন কোলফিল্ডস-এর পাশেই হিন্দুস্থান অ্যালুমিনিয়াম, সাউথ ইস্টার্ন কোলফিল্ডস-এর পাশেই ইন্ডিয়ান অ্যালুমিনিয়াম, বহু পুরনো কানাডিয়ান কোম্পানি, সাউথ ইস্টার্ন কোলফিল্ডস-এর বিহারের পালামৌর লোহারডাগাতে, মধ্যপ্রদেশের ছত্তিশগরের অমরকণ্টকে, এখানের রেনুকুটে এই সব কোম্পানির দারুণ দারুণ সব গেস্ট-হাউস আছে।

কয়লা কীভাবে ঠিক জমে ওঠে? এত বিপুল পরিমাণ কয়লা এক একটি স্তরে জমতে কত বছর লাগে?

সে প্রশ্নের উত্তর তোকে ভূ-তত্ত্ববিদেরা দিতে পারবেন। তোর সঙ্গে চিফ এঞ্জিনিয়ার, এক্সকাভেশন, গিরি সাহেবের আলাপ করিয়ে দেব। উনি মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার। আমাদের সি.এম.ডি. সুবোধ কুমার সেনও মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার। আমি মোটামুটি বলতে পারি।

তুই যতটুকু জানিস তাই বল।

Drift Theory আর Insitu এই দুইভাবে কয়লার উৎস-সন্ধানীরা ব্যাপারটিকে ব্যাখ্যা করেছেন। কোটি কোটি বছরের সময়সীমাতে সমুদ্রর উত্থান পতনে, ভূ-স্তরের উত্থান পতনে নানা মহাদেশ উপমহাদেশের সৃষ্টি ও বিনাশ হয়েছে। নতুন স্থলভূমি, চরের মতো হাজার হাজার মাইল জুড়ে মাথা জাগিয়েছে জল থেকে, আবার অন্য দিকে হাজার হাজার মাইল স্থলভূমি চলে গেছে জলের তলায়। আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের কারণে বর্ধিষ্ণু কত জনপদ বিলীন হয়ে গেছে, জ্বলন্ত গলিত বহমান লাভাপিণ্ডর স্রোতে। শিশু ও নারীর কান্না চাপা পড়ে গেছে প্রজ্জ্বলন্ত, গলিত পাথর আর নানা ধাতুর পর্বতগাত্র বেয়ে নেমে আসার কর্ণবিদারী শব্দে আবার ঠিক সেই সময়েই এই পৃথিবীরই অন্য কোনও রূপ-রস-গন্ধ ভরা পত্র-পুষ্পশোভিত অঞ্চলে শোনা গেছে যুবক-যুবতীর প্রেমালাপ, শিশুদের খেলাধুলোর উচ্চকিত কণ্ঠ এবং নবজাত শিশুর কান্না।

এইটুকু বলেই অতি বলল, নে নে শেষ কর। এক পাত্তর রাম শেষ করতে তুই দেখি দশ মাস দশ দিন নিবি।

তারপর নিজের গ্লাসে রাম ঢালতে ঢালতে বলল, দুসস্ শালা। আমাকে দেখি হাঁসজারু বানিয়ে দিবি তুই। ড্রাগলাইন অপারেটর তো নই যেন মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার। এখানের কারোকে যেন বলিস না আবার কী কী জ্ঞান দিলাম তোকে।

গ্লাসে রাম ঢালা শেষ হলে, অনিশের শূন্য গ্লাসেও ঢেলে দিয়ে অতি হঠাৎ আবৃত্তি করল,

"বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি!
দেশে দেশে কত না নগর রাজধানী—
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত-না অজানা জীব, কত-না অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে। বিশাল বিশ্বের আয়োজন;
মন মোর জুড়ে থাকে অতিক্ষুদ্র তারি এক কোণ।"

রামের গ্লাসে চুমুক দিয়ে অনিশ আবার বলল,

"দক্ষিণ মেরুর ঊর্দ্ধে যে অজ্ঞাত তারা
মহাজ্ঞানশূন্যতায় দীর্ঘ রাত্রি করিতেছে সারা,
সে আমার মধরাতে অনিমেষ চোখে
অনিদ্রা করেছে স্পর্শ অপূর্ব আলোকে।"

বাঃ বাঃ! কলেজের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, না রে অনিশ। তোর স্মৃতিশক্তি চিরদিনই দারুণ।

তারপর বলল, মনে আছে? চিরকুমার সভাতে তুই চন্দ্রবাবুর চরিত্রে অভিনয় করেছিলি।

মনে আছে। একেবারেই বাজে করেছিলাম। আমি মানুষটা সরল রেখার মতো। এক কথাতে বোকা। অভিনয় আমার আসে না। কী জীবনে, কী মঞ্চে।

তাছাড়া, ওই চরিত্র কি আমার দ্বারা ফোটানো সম্ভব ছিল? তা নির্ঝর শুনলো কোথায়। ওর ধারণা ছিল, ওর চেয়ে বড় ডিরেক্টর দেশে আর হয়নি এবং হবেও না।

তা ঠিক। কলেজ জীবনে আমরা প্রত্যেকেই নিজেদের কেউকেটা ভাবি।

কলেজ জীবনে ভাবলেও ক্ষমা করা যায় কিন্তু কাল তুই এমন এমন কিছু মানুষ দেখবি যে, তাদের ক্ষমা করা কঠিন।

তারা কারা?

কালই আলাপ হবে। তার মধ্যে একজন সবজান্তা লাহিড়ী। আরেকজন গোদা গাঙ্গুলি।

এরা যদি গোলমেলেই এমন, তাহলে এদের বললি কেন? পিকনিকটাইত মাটি হবে।

আমি কী বলব। এরাই তো সেল্ফ-অ্যাপয়েন্টেড লোকাল-গার্জিয়ান আমাদের। এঁরা মনে করেন, এঁরা না থাকলে নর্দার্ন কোলফিল্ডস-এর কোনও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ডই ঘটা সম্ভব নয়। এঁরা জোর করেই

সকলকে অখাদ্য কবিতা শোনাবে মদ গেলাবে গান শোনাবে, যে-গানে একটি পর্দাও সুরে বলে না। আমরা কিন্তু কাল মদ্যপান করব না। অ্যাট দ্য মোস্ট We will split a beer.

ঠিক আছে। আমি তো খাইই না।

আমিও কালে-ভদ্রে খাই। বলেই, অনিশ আবার বলল,

"জীবনে জীবন যোগ করা
না হলে, কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ করা গানের পসরা।
তাই আমি মেনে নিই যে নিন্দার কথা—
আমার সুরের অপূর্ণতা।
আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।"

বলেই বলল, তোর সবজান্তা লাহিড়ীরা রবীন্দ্রনাথ কি পড়েছেন?

জানি না। পড়লেও স্বীকার করে না।

এই মধ্যবর্তী সময়ের সবজান্তা লাহিড়ীর মতো সবজান্তা কবিরাই বর্তমান প্রজন্মের এই সাংস্কৃতিক শূন্যতার জন্যে দায়ী বলে কি মনে হয় না তোর?

হতেও পারে। বর্তমান সময়ের ছেলেমেয়েরা, এই ঝিমলিদের জেনারেশানের অধিকাংশই যেই সবজান্তা লাহিড়ীদের প্রভাবে রবীন্দ্রনাথকেই ভাল করে পড়ল না, এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য ওদের আর কী হতে পারে। তবে ঝিমলি ওরকম নয়। পামরি তো নয়ই। নয় বলেই, ওকে অত ভাল লাগে।

বাঃ। দেখ দেখ ঐ একটা বড় তারার ছায়া কী সুন্দর কাঁপছে বীণা সাগরের জলের উপরে।

আরে বড় তারা কী রে। ওটাই তো সন্ধ্যাতারা।

তাই?

ইয়েস স্যার। কলকাতাতে থাকতে থাকতে একেবারে অমানুষ হয়ে গেলি।

যা বলেছিস।

এখানে অনেকই অসুবিধে কিন্তু আনন্দও অনেক। আর সেই সব আনন্দ পেতে পয়সা খরচ হয় না, ধাক্কাধাক্কি ঠেলাঠেলি করে সব ব্যাপারেই লাইনে দাঁড়াতে হয় না। তোর জন্যে আকাশে, বাতাসে, গাছতলিতে, পথপাশে, বীণাসাগরে কত কিছু বিস্ময় অপেক্ষাতে আছে।

—কীসের অপেক্ষা?

কীসের আবার? তোর আবিষ্কারের অপেক্ষাতে। তুই আবিষ্কার করে ধন্য করবি বলে।

বাঃ। বেশ বলেছিস।

কালকে 'মারা'তে যাবার পথে পথের পাশে পাশে তোকে একরকমের ফুল দেখাব, বেগনে বেগনে ফুল। জংলি ফুল। অবহেলাতে ফুটে থাকে। কেউ আদর যত্ন করে না, কেউ তাদের ছিঁড়ে নিয়ে গিয়ে ঘর সাজায় না বা খোঁপাতে গোঁজে না, তবু তারা ফোটে। তাই তাদের নাম বেশরম। বলছিলাম না ঝিমলিকে?

বেশরম? বলিস কী? ফুলের নাম বেশরম?

হ্যাঁরে! তা না হলে বলছি কী?

তারপর বলল, তবে একটা ব্যাপার আছে। ভূতত্ত্ববিদদের কাছে এই গাছের খুব কদর।

কেন?

এই ফুল কোথাও ফুটেছে দেখলেই তাঁরা বুঝতে পারেন যে, ওখানে মাটির নীচে কয়লা আছে।

সত্যি?

নইলে বলছি কি? ওই ফুলের ঝাড়দের বটানিকাল নাম IPOMIA BATATA. তুই দেখলেই চিনতে পারবি। বিদেশ থেকে এদের কেউ কোনোদিন বেড়া হিসেবে লাগাবার জন্যে নিয়ে এসেছিল হয়ত। তারপর থেকে অনাদরে অবহেলায় নিলর্জ্জর মতো ছেয়ে গেছে এরা চারধারে।

বাঃ ভারি মজা তো।

হ্যাঁ। প্রকৃতির মধ্যে এমনিই কতা মজা লুকিয়ে আছে।

আগামীকাল যে আমরা যাব, কোন কোন জায়গা দিয়ে যাব?

কাল যেতে যেতেই দেখবি। অত অধৈর্য কেন তুই? কিন্ডারগার্টেনের ছাত্র না কি?

তা, বীণা সাগরের কথা বললি না কিন্তু তুই?

বললাম না?

কোথায় বললি?

তারপর বলল, রাম্‌টা শেষ কর। এই স্পিডে রাম্ খেলে তো আজ সারা রাত এখানেই ভূতের মতো বসে থাকতে হবে। খাদানের কুলি-কামিনেরা রাতের বেলা এদিকে কিন্তু কেউই আসে না। বলে, পেতিনরা ডাংগুলি খেলে জলের মধ্যে ফলের বল নিয়ে। নে! শেষ কর। খাস না, খাস না। যেদিন খাবি ভাল করে খাবি।

বলেই, প্রায় জোর করেই অনিশের গ্লাসটা শেষ করিয়ে আবার ভরে দিল।

তারপর বলল, সেই গানটা গাইবি একবার। ভারি ভালবাসতাম গানটা আমি তোর গলাতে শুনতে।

কোন গানটা?

'আমারে তুমি অশেষ করেছ এমনি লীলা তব।'

ভাল লাগত বুঝি?

খুউব। গা না। ক-ত্ব দিন শুনি না।

অনিশ একটু কেশে নিয়ে ধরল,

আমারে তুমি অশেষ করেছ, এমনি লীলা তব
ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছ, জীবন নব নব।
কত যে গিরি কত-যে নদী তীরে
বেড়ালে বহি ছোট এ বাঁশিটিরে,
কত যে তান বাজালে ফিরে ফিরে কাহারে তাহা কব।।

অন্তরাটা গা। প্লীজ। অতি বলল।

"তোমারি ওই অমৃতপরশে আমার হিয়াখানি
হারালো সীমা বিপুল হরষে, উথলি উঠে বাণী।
আমার শুধু একটি মুঠি ভরি
দিতেছ দান দিবস-বিভাবরী
হল না সারা কত না যুগ ধরি
কেবলই আমি লব।"

গান শেষ হলে দুজনে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল।

অনিশ বলল, কলেজের ফার্স্ট-ইয়ারে পড়া যে-আমি এই গানটা গাইতাম সে তখন এই গানের গভীর তাৎপর্যর কিছুমাত্রই বুঝতাম না।

আজকে? বুঝিস?

আজকে কিছু হয়ত বুঝি, সব বুঝি না। অবশ্যই বুঝি না। যা-কিছুই দৈনন্দিনতার মলিনতার ঊর্ধ্বে উঠে ক্লাসিক হয়ে যায়, হয়ে যায় চিরকালীন, সেই সব কিছুরই মর্ম একবারে, একদিনে, কোনো একটা বিশেষ বয়সে বুঝে ওঠা যায় না। সারা জীবন ধরে, ধীরে ধীরে বুঝতে হয়।

আর যায় না বলেই তো ধীরে ধীরে, পরতে পরতে তার অর্থ, তার ব্যঞ্জনা আমাদের গভীর থেকে গভীরে চারিত হয়ে যায়। তাই না?

ঠিক তাই।

সেই জন্যেই এই ঝিমলিদের জন্যে আমার ভারি কষ্ট হয়। ওরা না হয় পশ্চিমবাংলা এবং কলকাতা থেকে এতদূরে এই কয়লা খাদানে স্কুলে পড়াশোনা করছে, বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতি থেকে অনেকেই দূরে চলে আসাই ওদের পক্ষে স্বাভাবিক কিন্তু যারা এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা শহরে বা রাজধানী কলকাতাতেই আছে তারাও কি রবীন্দ্রনাথের তাৎপর্য জানছে? নানা বহির্ঘূর্ণি, জীবনমুখী, বিচিত্রগামী এবং নিঃসন্দেহে ক্ষণস্থায়ী প্রভাব তাদের যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে এমনিতেই দূরে সরিয়ে আনছে এটা ওদের পক্ষে যে কতবড় অভিশাপ, কতবড় দুর্দৈব তা ওরা তো জানছেই না, ওদের মা-বাবারাও কি জানতে পারছেন না? ভাবছেন না কি একবারও?

তারপর অতি বলল, বলি, বীণা সাগরের কথা। আগেই বলেছি, হয়ত স্বাভাবিক একটা দোলা মতো ছিলই ওই পাহাড়ের বলয়ের পাদদেশে। তাতে বৃষ্টির জল, পাহাড়-গড়ানো জল, উপর থেকে বয়ে আসা ছোট ছোট নালার জল সব তো এসে জমতোই, তার উপরে এই খাদান হবার পর থেকে কয়লার ও মাটির বিভিন্ন স্তরের যে জল, ওয়াটার টেবল ও জমে থাকা জল, তা প্রকাণ্ড পাইপের সাহায্যে অত্যন্ত শক্তিশালী পাম্পের সাহায্যে পাম্প করে এনে ওই বীণা সাগরে ফেলা শুরু হলো। এই করে করে বীণা সাগর মস্ত এক হ্রদ হয়ে উঠল।

তারপর বলল, কিছুদিন হলো কথা হচ্ছে এখানে অ্যামিউজমেন্ট-পার্ক হবে, রঙিন আলো, যন্ত্রচালিত নৌকো, নানা ওয়াটার-স্পোর্টস ইত্যাদি। তবে আমি ব্যক্তিগত ভাবে খুশি হব বীণা সাগর এমন নির্জন, জনবিরল, আধি-ভৌতিক হয়ে থাকলেই। আজকে আমরা দুজনে যে এখানে বসে গান করছি, প্রায় দু'ঘণ্টা হতে চলল, চার-পাঁচটির বেশি গাড়ি বা জিপ যায় আসেনি শান্তিভঙ্গ করে। বল?

—এই তো ভাল। মানুষ প্রকৃতির উপরে মাতব্বরি করতে গিয়েই স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও নির্জনতাকে একমাসের মধ্যে যতখানি নষ্ট করে প্রকৃতি নিজে হাতে একশ বছরেও হয়ত তা করত না। হয়ত চেষ্টা করলেও করতে পারত না। ধন্য এই মানুষ আমরা!

যা বলেছিস!

কিছুক্ষণ পরে অনিশ বলল। উঠবি না? এরকম উদোম জায়গাতে বসে-থাকাও যে অভ্যেস নেই। আমার পাতলা-চুলের মাথাতে ঠাণ্ডা লেগে যাবে। আগে জানলে একটা টুপি-ফুপি নিয়ে আসতাম।

চল্। তাছাড়া, ছুটকু তোর জন্যে রেঁধে-বেড়ে বসে রয়েছে। উ্য মাস্ট ড্যু জাস্টিস টু হিম।

ভারি ভাল ছেলেটা।

হ্যাঁ। এখনও ভাল আছে বাড়িতে থাকে বলে। কলোনির হিরোদের সঙ্গে মেলামেশা করলেই হিরো হয়ে যাবে। এই টেলিভিশন এসে

আমাদের মতো গরিব-মানুষদের দেশে কী ক্ষতি যে করল, তার খতিয়ান বানাবার সময় সত্যিই হয়েছে। লাভ হচ্ছে ও হয়েছে মুষ্টিমেয় মানুষের কিন্তু ক্ষতি হচ্ছে কোটি কোটি মানুষের। চারিত্রিক ক্ষতি।

সত্যি!

উঠতে উঠতে অনিশ বলল, কোন ব্রান্ডের শ্যাম্পু কিনব এই সমস্যাই মনে হয়, এই মুহূর্তে ভারতের মানুষের একমাত্র সমস্যা।

মডেলদের জামা-কাপড় দেখিস? ঘর-বাড়ি?

শুধু অ্যাডস এই নয়, হিন্দী ছবিতেও, আজকাল হিন্দীর কুৎসিত অনুকরণ বাংলা ছবিতেও। দেশের যে সমাজের বিন্দুমাত্র যোগ নেই আমাদের জীবনের সঙ্গে সেই সমাজ, সেই জীবনযাত্রার ছবিই অনুক্ষণ দেখানো হচ্ছে। চারদিকে এতো যে চুরি-ডাকাতি-খুন হচ্ছে তা সবই এই জন্যে। অথচ এ নিয়ে কারোরই মাথাব্যথা নেই।

দ্যাখ এর পরে ইনফরমেশন টেকনোলজির এই রবরবার এফেক্ট কী হয়! কাজকর্মের সুবিধা হবে খুবই। খবরা-খবর আদান-প্রদানের সুবিধাও হবে। আয় বাড়বে সমাজের এক শ্রেণির মানুষের। অনেক সময়ও বাঁচবে। কিন্তু ভয় হলো, এই উদ্বৃত্ত সময় নিয়ে মানুষ কী করবে? কী ভাবে কাজে লাগাবে তাকে? আরও টাকা রোজগারের জন্যেই কি? এতে মানুষ আরও অনেক 'কেজো' মানুষ হয়ে উঠবে অবশ্যই কিন্তু সেই সঙ্গে 'পেজো' মানুষও হয়ে উঠবে না কি?

সত্যি। ব্যাপারটা অনেক গভীরে গিয়ে ভাবা প্রয়োজন। আই.টি. টেকনোলজির উন্নতি ক্রমশ মানুষের ভাবনা-চিন্তার ক্ষমতাই নষ্ট করে দেখে হয়ত।

ব্যাগের মধ্যে মিনারাল ওয়াটারের বোতল এবং রাম-এর বোতল ভরে নিয়ে পথে নেমে এল ওরা দুজনে। রাম এর বোতলটা উপরে তুলে পথ-পাশের একটি আলোর বিপরীতে তুলে নিয়ে হাসল অতি। বলল, খুব পীনেওয়ালা বটে আমরা! আধবোতলও শেষ হয়নি। চল, বাড়ি গিয়ে বারান্দাতে বসে খাওয়া যাবে। শ্রীরামালুকেও ডেকে নেব। বাড়িতে আরও আছে।

শ্রীরামালুর কি নেশা আছে না কি?

না। ওর কিছুই নেই। গায়নি ছাড়া ও কিছুই জানে না, জানতে চায়ও না। বউকে ভয় পায় প্রচণ্ড। যতটুকু বেনিয়ম, তা আমার তাঁবে থেকেই করে আর মীনাক্ষীর যেহেতু আমার উপরে অগাধ বিশ্বাস, আমার সঙ্গে থাকলে ওর স্বামীর অবনতি না হয়ে, উন্নতিই হবে বলে ওর ধারণা, তাই শ্রীরামালু আমার ছায়া হয়ে থাকলে মীনাক্ষী খুশিই হয়। শ্রীরামালু তো হয়ই।

তোদের এখানে কত বিভিন্ন রাজ্যের মানুষ থাকে, না?

নিশ্চয়ই। ভারতবর্ষ তো একটা মস্ত দেশ। "নানা ভাষা, নানা মত নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান, আসিবে ভারতে পুনঃ জাতীয় উত্থান, জগজন মানিবে বিস্ময়, জগজন মানিবে বিস্ময়।" এই সত্যটা কলকাতা আর পশ্চিমবাংলাতে স্থায়ীভাবে বাস-করা বাঙালিরা আজকেও পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারলেন না। অথচ তাঁদেরই বোঝা উচিত ছিল সবচেয়ে আগে। এবং সবচেয়ে বেশি করেও।

তারপরে বলল, তুই মানবি কী না জানি না, আমরা আজও বড় কূপমণ্ডুক।

পশ্চিমবঙ্গের নেতাদের প্রত্যেককে ধরে ধরে বাধ্যতামূলক ভারতভ্রমণে নিয়ে এলে লজ্জায় তাঁরা অধোবদন হয়ে থাকতেন। বুলি-কপচানো বন্ধ হতো। সত্যিই এ ভারি লজ্জার যে রাজ্যের অধিকাংশ নেতারা পর্যন্ত কূপমণ্ডুক।

থাকগে। যার যা কর্মফল তা ভোগ তাকে করতেই হবে। এই ভোগ যতদিন না সম্পূর্ণ হবে ততদিন এই বাস্তববোধ-হীন দেশ-দশের হিত-বর্জিত রাজনীতির বেনোজলে ডুবে মরতেই হবে। আমরা নিজেরাই যদি নিশ্চেষ্ট থাকি তবে আমাদের কে বাঁচাবে বাইরে থেকে এসে। ভঙ্গি দিয়ে চোখ ভোলানো যতদিন না বন্ধ হচ্ছে ততদিন কিছুই হচ্ছে না, হবে না।

মোটর সাইকেলটা স্টার্ট করতেই তার এঞ্জিনের ভোঁতা ভট ভট

আওয়াজ বীণা সাগরের জলে ও চতুর্দিকের পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে রাতের অপার্থিবতাকে লণ্ডভণ্ড করে দিল।

অতি বলল, বুঝতে পারছিস, নির্জনতটা কী গভীর এখানে। আমাদের নিচুগ্রামের কথাবার্তাও এখানে বোমা পড়ার আওয়াজ বলে মনে হচ্ছিল এতক্ষণে নিশ্চয়ই।

তারপরই বলল রাম এর পাঁইটটা শেষ করে গেলি না। অ্যাকসিডেন্ট না হয় পথে।

সেকি? কেন?

কেন জানি না, এখানকার গুরুরা বলেন, আধভর্তি রাম এর বোতল বা কাঁচা ডিম সঙ্গে নিয়ে কখনও যাতায়াত করবে না গাড়ি বা মোটর সাইকেলে। করলেই "রামেংকারী" বা "ডিমেংকারী" হবে। অ্যাকসিডেন্টও হয়তো হবেই। তোর মাথাতে আবার হেলমেট নেই। এই ছোটকুটাকে নিয়ে পারা যায় না। ব্যবহার হয় না বলে একস্ট্রা হেলমেটটাকে রান্নাঘরে ঝুলিয়ে রেখে তার মধ্যে তেজপাতা রেখেছে। ওর নাকি রান্না করতে সুবিধে হয়।

রামেংকারী, ডিমেংকারী এগুলো আবার কী কথা?

হ্যাঁ। স্থানীয় ভাষাবিদদের COINAGE.

বাবাঃ। ভাষাবিদও আছেন দেখি এখানে।

মাটির মালসায় জিয়োনো-সিংগির মতো স্বল্প আয়তনে গুচ্ছের আধুনিক কবি যেখানে খলবল করতে পারে সেখানে দু-এক গাছা ভাষাবিদ থাকবে না তা তুই ভাবলি কী করে।

"কয়েকগাছা" আবার কীরকম ভাষা!

ঐ হল। মুখার্জিদা বলেন। কয়েক গাছা লাঠি হয়, কয়েক গাছা চুল হয় আর কয়েক গাছা কবি বা দু'-একগাছা ভাষাবিদ হবে না কেন?

অনিশ চুপ করে গেল। রাম-খাওয়া মানুষকে আর কম্যুনিস্টদের কখনও কনট্রাডিক্ট করতে নেই। করলেই সে ঘুম-ভেঙে ওঠা কুম্ভকর্ণ হয়ে যাবে। তর্কে এঁদের কেউ কোনোদিনও হারাতে পারেনি।

অতি বলল, জানিস, আমি ভাবছি, ওরা গাড়িতে গেলে যাক, কালকে "মারা"তে। আমি আর তুই আমার গাড়িতেই যাব।

গাড়ি মানে?

গাড়ি মানে, আমার দু চাকার এই গাড়ি।

কেন?

কোন গাড়িতে ঠেলে দেবে কে জানে গোদা গাঙ্গুলি বা সবজান্তা লাহিড়ীদের কারো সঙ্গে। পুরো জার্নিটাই ঝুলে যাবে। তাছাড়া, নিজেদের বাহন থাকলে সুবিধে এই যে নিজেদের ইচ্ছেমতো ফেরা যাবে, নিজেদের ইচ্ছেমতো থামাও যাবে যাতায়াতের পথে। তুই কী বলিস অনি?

আমি কী বলব। তুই যা ভাল মনে করবি আমি তাতেই রাজি। ন্যাচারলি।

মারা গুম্ফাতে কি খুব ভিড় হবে? মানে পিকনিক এ?

ভিড়? না না। আমরা আমরাই যাব। দেখিস তোর ভাল লাগবে। লোকে তো গন্তব্যর কথাই ভাবে শুধু, যে পথ তাকে সেই গন্তব্য পৌঁছে দেয়, তার কথা ভাবে না। কিন্তু আমার তো মনে হয়, গন্তব্যের চেয়েও যে-পথ বেয়ে গিয়ে আমরা সেখানে পৌঁছই সেই পথের তাৎপর্য অনেকেই বেশি। ভ্রমণে যান অগণ্য মানুষে কিন্তু ভ্রমণের আর্টে আর্টিস্ট থাকেন খুব কমই তাদের মধ্যে। আমার তো পথ না-চলেও, জানালার সামনে বা বারান্দাতে বসে পথের দিকে চেয়ে থেকেই দিন কেটে যায়। কোন অতিথি কখন এসে হাজির হয় তা কে বলতে পারে?

বলেই, মোটর সাইকেলের গতি কমিয়ে, অতি হঠাৎ গান ধরে দিল। গলাতে ওর সুর খুবই আছে কিন্তু গলাটা একটু মেয়েলি।

"আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ
খেলে যায় রৌদ্র ছায়া, বর্ষা আসে বসন্ত
কারা এই সমুখ দিয়ে
আসে যায় খবর নিয়ে
খুশি রই আপনমনে
বাতাস বহে সুমন্দ।

সারাদিন আঁখি মেলে
দুয়ারে রহি একা
শুভক্ষণ হঠাৎ এলে
তখনি পাবে দেখা।
ততক্ষণ ক্ষণে ক্ষণে
হাসি গাই মনে মনে
ততখন রহি রহি
ভেসে আসে সুগন্ধ।

অনিশ বলল, সত্যি। ঝিমলিরা যদি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ছেড়েই দিলাম, গানও যদি না জানে তাবে তাদের মধ্যে মানুষ হিসেবে বড়ই খামতি বয়ে যাবে।

হয়ে যাবে কী! রয়ে যাচ্ছেই। আজকের বাঙালি তরুণ সমাজ একেবারে নিরুদ্দিষ্ট। তার দোষ কিন্তু তাদের নয়।

তবে কাদের?

তাদের মা-বাবার, তাদের পরিবেশের, তাদের শিক্ষক-শিক্ষিকার। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে অধিকাংশই এখন নিজ নিজ জীবিকান্বেষণে, টাকা, আরও টাকা রোজগারে এতোই ব্যস্ত যে তাঁদের জীবিকা, যে, ডাক্তারদেরই মতো, অন্যতম মহান জীবিকা। এ কথা অনুভব তো দূরের কথা এ কথা জানেনই না মনে হয়। এর চেয়ে বড় দুঃখের কথা আর কী হতে পারে, বল?

যাক। এসব গুরুগম্ভীর কথা যাক। যে বা যারা আত্মহত্যা করবে বলে, নিজেদের সব ঐতিহ্য, সব ভালত্বটুকু সম্বন্ধে অনবহিত হয়ে পাখার সঙ্গে গামছা বেঁধে ঝুলে পড়েছে তাদের বাঁচাবার দায়তো আমাদের নয়। যা হবার তা হবে।

দূরে নীগাহিঁর আলো দেখা যাচ্ছে। একটু পরই কলোনির পথে উঠে যাবে অতির মোটর সাইকেল।

অতি বলল, কটা বাজে দেখ তো রে।

পৌনে দশটা।

ছুটকু আমাকে খেয়ে ফেলবে। আমাকে খাইয়ে-দাইয়ে কী একটা হিন্দী সিরিয়াল দেখে ও রোজই সাড়ে দশটা থেকে। ওর এই একটিই দাবি আমার কাছে। ছেলেমানুষ, গাঁ থেকে এতদূরে একা থেকে সারাটা বছর আমার দেখভাল করে, তাই ওকে মানা করি না। সারা দেশের গ্রামীণ মানুষ যদি টিভি দেখে নিজেদের সর্বনাশ করেই তবে আমার একার সাধ্য কি যে এই দুরারোগ্য রোগকে আমি দুর্বল দুটি হাতে একা প্রতিরোধ করি।

বলেই, মোটর বাইকের হাতল ঘুরিয়ে বাইকের গতি বাড়াল। দেখতে দেখতে ওরা উঠে এলো নীগাহিঁর রেসিডেনশিয়াল এলাকাতে। দূরে সার সার আলো-জ্বলা বাড়ি, আব্রুর জন্যে পর্দাটানা, ঘরের মধ্যে সংসার সংসার পুতুল খেলা অভ্যেসের পুতুলেরা সকাল থেকে রাত যায় যার ভূমিকা সকলেই পালন করে যাচ্ছে। একটু পরই একটি একটি করে নিভে যাবে আলোগুলি।

হু হু করে হাওয়া লাগছে গায়ে। হ্যালোজেন আর ফ্লুরোসেন্ট আলো জ্বলছে অতন্দ্র প্রহরীর মতো। হাওয়াতে কাঁপতে থাকা নানা গাছগাছালির পাতাগুলো ঝিলমিল করছে ঐ সব আলোর অবাস্তব অতিপ্রাকৃত রঙে।

একটু সামনেই পথটা কাটা। টেলিফোন বা বিজলির লাইনের কাজ হয়েছে, বা হচ্ছে। রাস্তা ছেড়ে ডানদিকে বাঁদিকে ডাইভার্সনে নেমে গেলে হয়ত হতো কিন্তু অত স্পিডে তা করা আদৌ সম্ভব ছিল না। অতির পক্ষে কী সম্ভব আর কী অসম্ভব তা অনিশের পক্ষে জানা সম্ভবও ছিল না। মোটর সাইকেল চালায়নি কখনও ও। খুব বড় ও ভারী অনিশের মোটর সাইকেলটি। তাছাড়া, অতির উপরে মিস্টার রাম্-এর প্রভাব কতখানি পড়েছিল তাও জানা নেই। মিস্টার মোটর সাইকেল মিস্টার রাবণের মতো ব্যবহার করাতে রাম চকিতে ছিটকে উঠল উপরের সেই কাটা জায়গাটাতে পড়েই। কখন যে অতির কোমর জড়ানো অনিশের

হাত-দুখানি শিথিল হয়ে এসেছিল সে খেয়ালই করেনি। বাইকটি লাফিয়ে উঠতেই অনিশ ছিটকে পড়ল দূরে। একটা শিরিষ গাছের তলাতে কতগুলি বড় বড় পাথর, হয়ত রাস্তা মেরামতির জন্যেই জড়ো করা ছিল। অনিশ সেই পাথরগুলোর উপরে ছিটকে গিয়ে পড়ছে যে তা বুঝতে পারল মুহূর্তের জন্যে। তার পরমুহূর্তেই পৃথিবীর সব অন্ধকার নেমে এল তার দু'চোখের উপরে। মাথার পেছনে একটা আঘাত পেল মনে হল। তারপরেই তারপরে আর কিছুমাত্রই মনে নেই।

অনিশ গভীর ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখছিল। মোটর সাইকেলের পেছনের সিটে বসে চলেছে 'মারা' গুম্ফার দিকে। খুব জোরে চালাচ্ছে অতি। বলছে, গাড়িওয়ালাদের এখানেই আমাদের কাছে হার। বুঝলি। মোটর সাইকেলের সঙ্গে সাধারণ গাড়ি পেরে ওঠে না।

এই দ্যাখ অনি, বেশরম ফুল। তোকে বলেছিলাম ওদের কথা। দ্যাখ! দ্যাখ! পথের দু'পাশে ফুটে আছে কী রকম। তোকে বলেছিলাম কাল, মনে আছে?

অনি দেখল। বেগুনী-রঙা ফুল। কোমর সমান উঁচু ঝাড়ে ফুটে আছে অজস্র ফুল।

কী যেন বলেছিল ইংরেজি নামটা? বাটাটা-পুরীর মতো? মনে পড়েছে IMPMIA BATATA. না কী যেন।

অনি বলল, আরে! এই ফুলতো দেখেছি।

কোথায় দেখেছিস?

দাঁড়া। দাঁড়া। মনে করি।

পরক্ষণেই বলল, দেখেছি, হাজারীবাগে।

হাজারীবাগে?

মানে, হাজারীবাগ-রামগড়ের পথে—ঘাটো-টাঁড় কলিয়ারির কাছে।

তাই বল। কলিয়ারির কাছেই তো এদের ফোটা-ফুটি।

একটু পরে অনিশ বলল অতিকে, শোন, আমার যেতে ইচ্ছে করছে না।

সে কীরে। তুইই হলি আজকে গেস্ট অফ অনার!

এতো সব অচেনা লোকজন। তার উপরে একগাদা মেয়েরা। আমার ভাল লাগে না। মোটর সাইকেলেই যদি যাওয়া যেত তবে তো আমরা-আমরাই যেতে পারতাম। মানে, দুজনে।

তা পারতাম। তবে রান্না-বান্না কারা করত? গান কারা গাইত? পারফ্যুমের গন্ধ কারা ছড়াত? তাছাড়া যে সব মেয়েরা যাচ্ছে বলে বিরক্ত হচ্ছো তার মধ্যে তোমারই তো দুগাছা।

আঃ। লাঙ্গোয়েজ। খাদানে থেকে থেকে তোর মুখটা কুলি-কামিনের মতো হয়ে গেছে।

মুখে কী আসে যায়। মুখ তো বহিরঙ্গ ব্যাপার। অন্তরে তো সুরুচিই আছে। আছেন রবীন্দ্রনাথ।

তা আমার দুগাছা মানেটা কী হল?

বাঃ পামরি আর ঝিমলি। পামরি তোর ওল্ড ফ্রেম। আর ঝিমলি তো তোর ভবিষ্যতের চিঙ্গারি। চিঙ্গারি মানে স্ফুলিঙ্গ। তাও জানিস না!

ও। তারপর বলল, যা-তা বলিস তুই।

হাঃ। হাঃ করে হাসল অতি। বলল, যা-তা?

তারপরই এক হাতে স্টিয়ারিং ধরে, অন্য হাত ছেড়ে দিয়ে গান ধরল,

"আছ আকাশ পানে তুলে মাথা/
কোলে আধেকখানি মালা গাঁথা।।
ফাগুনবেলায় বহে আনে আলোর কথা ছায়ার কানে,
তোমার মনে তারি সনে ভাবনা যত ফেরে যা-তা।।

বাঃ। বাঃ। তুই চালাস তো ড্র্যাগ-লাইন। এতো কবিত্ব তোর আসে কোত্থেকে! আর এখানে বসে গানগুলো মনেই বা রাখলি কী করে। আজকাল তো কলকাতার দক্ষিণীর ছাত্র-ছাত্রীরা দেখি কাগজে লেখা গান, না— দেখে এক কলিও গাইতে পারে না।

যারা তা করে, তারা গান গায় না, স্বরলিপি পাঠ করে। গান, বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীত, কথা আর সুর যেখানে অবিচ্ছেদ্য, তা গায়ক-গায়িকার পুরোপুরি আত্মস্থ না হয়ে যায়, সেখানে গান তো প্রাণের জিনিস হয় না। মনের জিনিসই হয়ে থাকে মাত্র। আগেকার দিনে পাড়ার 'ফাংশানে'

আধুনিক গান-গাওয়া আর্টিস্টরাই খাতা দেখে গান গাইতেন, একজনও রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়ক-গায়িকাকে খাতা হাতে কোথাও দেখিনি।

বাবাঃ! শালা! তুই দেখি মিনি-রবীন্দ্রনাথ হয়ে গেছিস ড্র্যাগলাইন অপারেটর।

আরে ড্র্যাগ-লাইন চালানো আমার জীবিকা, আর গান সাহিত্য এসব আমার জীবন। যে-মানুষ জীবিকা থেকে জীবনকে আলাদা করে রাখতেই শিখল না, তার বিদ্যা-শিক্ষা সবই তো জলে গেল।

অনিশ বলল, তবে ওই গানটা তো বসন্তের গান। এই শ্রাবণ শেষে গেয়ে দিলি গানখানি।

বেশ করেছি। মহাভারত কি তাতে অশুদ্ধ হলো?

না, রবীন্দ্রসঙ্গীতের পণ্ডিতেরা....

ঐ পণ্ডিতেরা রবীন্দ্রসঙ্গীতের যে-পরিমাণ ক্ষতি করেছে এবং আজও করছে তার একটা হিসাব হওয়া দরকার। রবীন্দ্রনাথ বলতেন না? যাঁহারা সব কিছুই পণ্ড করেন তাঁহারাই পণ্ডিত! গান যদি প্রাণের প্রাণ না হয়ে উঠল তাহলে গান গেয়ে লাভ কী? যখন আমি গাইব তখনই ফুল ফুটবে, বৃষ্টি ঝরবে। মিঞা তানসেন যদি দীপক রাগ গেয়ে আগুন জ্বালাতে পেরে থাকেন, মেঘমল্লার গেয়ে বৃষ্টিও নামাতে পেরে থাকেন তবে আমিই বা কেন বর্ষাতে বসন্ত আনতে পারব না?

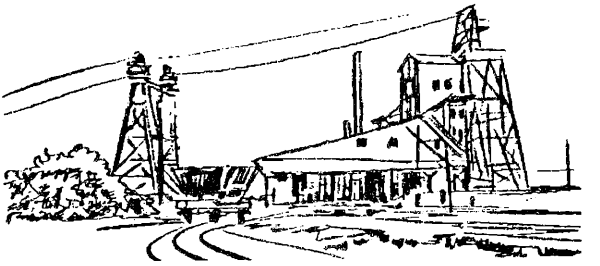

জ্বর কি আছে?

একটি অপরিচিত কণ্ঠস্বর বলল। একেবারেই অপরিচিত অনিশের কাছে। পুরুষকণ্ঠ।

কে?

বলে চোখ খুলল অনিশ। ওর মাথার পেছনে অসম্ভব ব্যথা।

আটানব্বই।

একটা অপরিচিত নারীকণ্ঠ বলল।

কখন নিয়েছেন টেম্পারেচার? সিস্টার?

পনেরো মিনিট আগে স্যার।

ফাইন।

বিড়বিড় করে কী বলছিলেন?

অতিবাবুর সঙ্গে গল্প করছিলেন? অনিশের মুখের কাছে ঝুঁকে-পড়া, সাদা হাউস-কোট গায়ে একজন তীক্ষ্ণনাসা ভদ্রলোক বললেন।

তারপর ডাক্তার সিস্টারকে বললেন LUCID INTERVAL কতক্ষণ থাকছে?

আজ সকাল থেকেই সেন্স এসেছে। মনে হচ্ছে আর আনকনসাস হবেন না।

আপনার কি মনে হয় না, বাড়িতে নিয়ে গেলে তাড়াতাড়ি রিকভার করবেন?

স্যার। আমি কি বুঝি? তবে ডঃ মজুমদারও তাই বলে গেলেন।

স্যার কখন এসেছিলেন রাউন্ডে? আমাকে খবর দেননি কেন আপনারা? আমার চাকরিটা কি খাবেন?

R.S সাহেবের বাড়িতে কী জরুরী কাজ আছে আজ সকালে, তাই তাড়াতাড়িই এসেছিলেন। আপনাকে লাঞ্চটাইমে বাড়িতে ফোন করতে বলেছেন। পেশেন্ট সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করবেন।

করব। উনি আর কী বললেন?

বললেন, SALINE আর MANNITOL ড্রিপ কাল থেকে বন্ধ করে দিতে এবং পরশুই বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে।

কলকাতাতে?

অবাক গলাতে বললেন ডাক্তার।

না, না আরও দশদিন না দেখে কলকাতাতে পাঠাতে রাজি নন উনি। এদিকে রবার্টসগন্ধ হয়ে পাহাড়ী রাস্তাতে বেনারস হয়ে কলকাতা যেতেও অনেকেই ঝক্কি আর শক্তিপুঞ্জে তো খাওয়া-দাওয়া দেখাশোনার খুবই অসুবিধে। পুরো পথটাই খাদান আর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। এমার্জেন্সি কিছু হলে মুশকিল হবে। কন্ডিশান হান্ড্রেড পার্সেন্ট STABLE না হলে কলকাতাতে পাঠানো যাবে না।

মিঃ রায় কি বিবাহিত?

কোন মিস্টার রায় স্যার?

আরে পেশেন্টের বন্ধু। যাঁর গেস্ট হয়ে উনি এসেছেন সিঙ্গরাউলিতে।

না, উনি তো ব্যাচেলর।

তবে? বাড়িতে দেখাশোনা কে করবেন? একজন সিস্টারের বন্দোবস্ত করবেন রাতে। দিনের বেলা মিস্টার রায়ের পরিচিত বন্ধুদের স্ত্রী বা বোনেরা সামলে নিতে পারবেন আশা করি।

ডাঃ এবং মিসেস শ্রীরামালুর কোয়ার্টারের দোতলাতেই তো মিস্টার রায়ের কোয়ার্টার।

কে? গাইনি ডাঃ শ্রীরামালু ও ডঃ মিসেস শ্রীরামালু। হ্যাঁ স্যার।

তাই? তবে তো ভালই।

OCCIPITAL LOBE-এ ব্যথা নেই যখন তখন চিন্তার আর কিছু নেই। আজকেই একটা সিটিস্ক্যান করিয়ে নেবেন দুপুরে, লাঞ্চের আগে। মিস্টার রায়কেও খবর দিয়ে রাখবেন রিলিজ এর ব্যাপারে।

কে?

অনিশ বলল এতক্ষণে।

আমি ডাঃ রায়, সৌরিন রায়। নিউরোলজিস্ট।

কেমন ফিল করছেন মিস্টার সেনগুপ্ত?

ফাইন। কী হয়েছিল আমার? এত সব নল-টল কীসের? স্যালাইন? আমার কি কলেরা হয়েছে? ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া?

হেসে বললেন ডাঃ রায়, ওসব বড় অসুখ কিছুই নয়। রাম-ভক্ত হনুমানদের ওই খাদানের ভূতেরা মোটেই পছন্দ করে না। তাই তাঁরা আপনার বন্ধুর মোটর সাইকেলের পেছনে অদৃশ্য হাত দিয়ে ধাক্কা মেরেছিল বলে আপনি ছিটকে গিয়ে পথে পড়েছিলেন। মাথা ফেটে গেছিল।

অতির কিছু হয়নি তো? অতিও কি হাসপাতালে? ওকি আমাকে না নিয়েই পিকনিকে গেছিল?

সিস্টার বললেন, না না। আপনার কারণেই পরদিন পিকনিকই ক্যানসেল হয়ে গেছিল। পরের বার যখন আসবেন তখন হবে বলেছেন, মিস্টার রায়।

তারপর বললেন, আপনার খোঁজ করতে কত মানুষ এসেছিলেন জানেন?

কে কে?

সবাইকে কি আমি চিনি! মিস্টার গাঙ্গুলি, মিস্টার লাহিড়ী, মিস্টার বাগচী সস্ত্রীক। আরও অনেক মহিলা এসেছিলেন। ডাঃ শ্রীরামালু এবং ডাঃ মিসেস শ্রীরামলু, ছুটকু মিস্টার রায়ের কাজের লোক।

ওঃ। আমার চোট কি সাংঘাতিক।

না, না। কিছুই নয়। তবে মাথার চোট তো। কিছু প্রিকশন নিতে হয়ই আমাদের। আর কিছুদিন অবজার্ভেশনেও রাখতে হয়। সেই জন্যেই আটকে রাখা হয়েছিল আপনাকে অ্যাজ আ মেজার অফ অ্যাবান্ডান্ট প্রিকশন।

জ্ঞান ছিলো না বুঝি?

সামান্য সময়ের জন্যে।

কতক্ষণের জন্যে?

এই দিন তিনেক?

তবে তো মরেই যেতে পারতাম।

হ্যাঁ। মরা কি অত সোজা? বিশ্রামের দরকার ছিল, বিশ্রাম হয়ে গেল। বাড়িতে ফিরে বিশ্রামে থাকাই ভাল। সকাল-বিকেল হেঁটে বেড়াবেন একটু। একটা টনিক দিচ্ছি। ভাল করে খাওয়া-দাওয়া করবেন। তারপর কলকাতা। মা, স্ত্রী, ছেলে মেয়ে....।

ডাঃ রায় অনিশকে খুশি করার জন্যে বললেন।

অনিশ চুপ করে রইল। তার বাড়ি যে ফাঁকা। মস্ত মস্ত ঘর, উঁচু সিলিং-এর পলেস্তারা-খসা, গোটা কুড়ি সাদা-কালো পায়রা, তিনটি বেড়াল, বাইরের চওড়া রক ও শুয়ে থাকা বিনা মাইনের পাহারাদার নেড়ি কুকুর টাইগার যে অন্য সব কুকুর এবং বিশেষ করে কুকুরীদের ভীষণই ভয় পায়। কিন্তু ভাবল, কী দরকার তার একাকীত্বর কথা আত্মীয়-পরিজনহীনতার কথা সকলকে বলতে যাওয়ার! কারো সহানুভূতি চায় না অনিশ, চায় না কারো করুণাও। এমনকী, কারো প্রীতি বা প্রেমও চাইতে পারেনি, যখন অন্য কেউ তা দেবার জন্যে খুবই উৎসাহও দেখিয়েছে। ও এইরকমই। অন্য কারো মতনই নয়। এই জন্যেই বোধ হয় অতিব সঙ্গে ওর এত মিল। নইলে, অতি কলকাতাতে তিনদিনের জন্যে এলেও ওর সঙ্গে দেখা কেন করে? কেন ওকে প্রতিবারে সিঙ্গরাউলিতে যেতে বলে। কলেজের বন্ধু তো অনেকেই ছিল। এমনকী, কলকাতাতে এই মুহূর্তেও অনেকেই আছে অথচ তাদের জন্যে এইরকম টান অনুভব করেনি কখনওই।

যাবার সময়ে অনিশের বাহুতে দুটি ছোট্ট চাপড় মেরে ডাঃ রায় বললেন, উ্য আর অলরেডি ওক্কে। নেভারদিলেস গেট কমপ্লিটলি ওয়েল সুন। পরশু সকালে ব্রেকফাস্টের পরে আপনার বন্ধু ওঁর বাড়িতে নিয়ে যাবেন আপনাকে। ওক্কে?

ওক্কে।

আমি কালও আসব আপনাকে দেখতে। তবে পরশু সকালে একটি বড় অপারেশন আছে। ও.টি-তে থাকতে হবে সার্জনকে অ্যাসিস্ট করতে। রেনুকুট থেকে মিস্টার ভার্গব আসবেন একটি কমপ্লিকেটেড অপারেশনে। মিসেস ঘোষ আপনাকে টা-টা করে দেবেন।

হাসল অনিশ। নার্স মিসেস ঘোষও হাসলেন।

চান করে সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে এসেছেন সিস্টার ঘোষ। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম হয়েছে। গলাতে একটি মটর-মালা। দেখেই মনে হয় যে, জীবনযুদ্ধে ভারি ক্লান্ত এই মহিলা। ব্লাউজটা বাঁহাতের বাহুর কাছে একটা খোঁচা খাওয়া। জাম-রঙা বাহু দেখা যাচ্ছে একটু। গায়ে হালকা ঘামের গন্ধ, তবে সুখের কথা এই যে, ঘামের গন্ধটা Repulsive নয়। পারফ্যুম মাখার আর্থিক অবস্থা নেই বলেই মনে হলো।

অনিশ ভাবছিল, কে জানে! ওঁর স্বামী কী করেন? ছেলেমেয়ে কী? তাদের কার কাছে রেখে আসেন? নিজেই রান্না করেন কি না। স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক কেমন?

অন্যর অসুবিধা ও কষ্টর কথা ভাবলে নিজের কোনো কষ্টই আছে যে, সে কথা অবলীলাতে ভুলে যাওয়া যায়। ভাবছিল, অনিশ।

এমন সময়ে একজন ওয়ার্ড-বয় এসে বলল, ডাঃ সেন আপনাকে একবার ডাকছেন দিদিমণি। পাঁচ নম্বরের পেশেন্ট এর ড্রিপ খুলে দিতে হবে।

আসছি আমি একটু।

বললেন, সিস্টার ঘোষ।

তারপর বললেন, কিছুই না-করে চোখ বন্ধ করে এতক্ষণ যেমন জেগে-জেগে স্বপ্ন দেখছিলেন, কথা বলছিলেন, তেমনই করুন। স্বপ্নের মতো আনন্দ এবং নিখরচার দান ঈশ্বর কীই বা দিয়েছেন বলুন মানুষকে।

আজ রবিবার।

অতির বাড়িতে ফিরেও বেড-রেস্ট-এ থাকতে হয়েছিল দিন তিনেক। মাথার পেছনে কিছুটা চুল কেটে সেখানে একটি ব্যান্ড এইড-এর পুলটিস লাগানো ছিল ওষুধপত্র দিয়ে। তাও কাল বিকেলে খুলে ফেলেছেন নার্স। কাল রাত থেকে তাঁরও ছুটি হয়ে গেছে। এখন শুধু দিনে তিনবার করে রিলিজিয়াসলি খেতে হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক। চলবে দিন সাতেক। সঙ্গে ভিটামিনস্‌ও।

অনিশ সকালে ব্রেকফাস্ট করে বারান্দাতে বসে গতকালের কাগজ দেখছিল। এলাহাবাদ থেকে কাগজ আসে। বাংলা কাগজের মধ্যে প্রতিদিন। এই কাগজটি খুব অল্প দিনের মধ্যেই বেশ তরতর করে বেড়ে উঠছে। কবে এদেরও বিজ্ঞাপনের রোগে ধরবে, কে জানে। এইডস এর চেয়েও মারাত্মক সে রোগ। সংবাদপত্র মাত্রেরই একটি বিশেষ দর্শন থাকা উচিত, একটি বিশেষ দায়বদ্ধতা, সততা, বিশেষ রুচি। এই সবই অর্থ এবং ক্ষমতার সীমাহীন লোভে বিজ্ঞাপনের তোড়ে অবলীলায় যে ভুলে যায় অনেক সংবাদপত্র গোষ্ঠীই, তার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ চোখের সামনে একাধিক আছে। সংবাদপত্র যে অন্যান্য না না ব্যবসা থেকে অনেকেই আলাদা একথাটা তাঁদের মালিকেরা বুঝলে ভাল হতো। টাকা রোজগার তো গুড় বা আলুর ব্যবসা করেও করা যেতে পারে। সেই মানসিকতার মানুষ কাগজ কেন করতে আসেন, বোঝে না অনিশ।

আজ লুচি, বেগুনভাজা, আলুর ঝাল-ঝাল তরকারি এবং সন্দেশ দিয়ে

ব্রেকফাস্ট সেরেছে অনিশ। একাই। অতি, ভোরে বেরিয়ে গেছে এক কাপ চা খেয়ে।

কাগজ পড়া শেষ হয়েছে এমন সময়ে ফোনটাও বাজল।

হ্যালো, বলল, অনিশ।

অতি দা?

একটি নারীকণ্ঠ বলল ও পাশ থেকে।

না, আমি অতির বন্ধু অনিশ। ওর আজকে সকালের শিফ্ট। কে বলছেন আপনি?

আমি রূপা। ওঁর বন্ধু মিধার বোন।

কিছু বলব ওকে? ও ফিরলে?

না, আসলে আপনার খোঁজ নেবার জন্যেই ফোনটা করা। আমি রেনুকুটে আমার এক মাসির বাড়িতে ছিলাম দিন সাতেক। ফেরার পরেও দাদা খবরটা আমাকে দিতে ভুলে গেছিল। কাল রাতেই শুনলাম, তাই।

ভেরী নাইস অফ ড্য ইনডিড।

এই বাক্যটি কি বাংলাতে বলা যেত না?

যেত বুঝি? ভেবে দেখিনি। আপনিই বলে দিন ঐ বাক্যটির বাংলা তর্জমা ঠিক কী হলে মানাতো?

দাঁড়ান এক সেকেন্ড।

দাঁড়ালাম।

অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।

হলো না। "ধন্যবাদ" কথাটাও আমরা সচরাচর ব্যবহার করি না ইনফর্ম্যাল কনভারসেশনে। মেকী মেকী মনে হয় কেমন। হয় না কি?

সেটাও ঠিক।

তবে যদি বলতাম, আপনি কী ভাল? তাহলেও হতো কি?

উঁহু। তাহলেও হতো না। অচেনা কাউকে হঠাৎ করে 'আপনি কী ভাল', বললে ব্যাপারটা বেশ গায়ে-পড়া গায়ে-পড়া শোনাতো। তাই না?

হয়তো তাই। কিন্তু এই সুযোগে বলে নিই যে, আপনি সত্যিই ভাল। অতির কাছে আপনার অনেক গল্প শুনেছি আসার পর থেকে। আপনার গানের কথাও। ভেবেছিলাম, পিকনিকে আপনার সঙ্গে আলাপ হবে।

পিকনিক এ? সেই সময়তো আমি বেলুকুটে ছিলাম।

কিন্তু অতিকে ফোন করে এক ভদ্রলোক বললেন, যে আপনি অবশ্যই যাবেন।

তাই? ঠিক জানেন আপনি? কে তিনি?

দাঁড়ান। একে আমি ভুলো-মন তার উপরে মাথায চোট খেয়ে স্মৃতিশক্তি একেবারেই ভেসে গেছে।

ওদিক থেকে চাপা হাসি শোনা গেল।

তারপরই অনিশ বলল, হ্যাঁ পড়েছে মনে।

কে?

মিস্টার লাহিড়ী। সবজান্তা লাহিড়ী।

এবারে রূপা বেশ জোরে হেসে উঠল। বলল, অতিদা বুঝি ঐ নাম দিয়েছে লাহিড়ীদাকে?

শুধুমাত্র অতিই নয়। এখানের অনেককেই তো ওকে ঐ নামেই ডাকতে শুনলাম।

তাই?

তারপর বলল, এ কথা ঠিকই যে, ওঁর হাবভাব অনেকটা সেরকমই।

তারপর বলল, এটা তো উনি অন্যায় করেছেন। মানে, লাহিড়ীদা। দাদার অধিকাংশ বন্ধুই ওই রকম গোলমেলে।

কী রকম?

মিথ্যা কথা বলে। অকারণে মিথ্যা কথা বলে। কারণে বললেও ক্ষমা করা যেত হয়ত।

অনিশ বলল এখন বেশ বুঝতে পারছি, কেন আমাকে অতি, মোটর সাইকেল থেকে ফেলে দিয়েছিল।

ফেলে দিয়েছিল মানে?

তাছাড়া কী? ফেলেই তো দিয়েছিল। নিজে হেলমেট পরে গ্যাঁট হয়ে বসে রইল আর হেলমেটবিহীন নিরীহ বন্ধুকে পাথরের উপরে ছিটকে ফেলে দিয়ে মারার উপক্রম করেনি ও?

কিন্তু অতিদা কেন অমন করেছিল? মানে, অমন করতে যাবার কারণ কী হতে পারে।

কারণ আর কী। যাতে পরদিন পিকনিকে যেতে না হয় আমাকে বয়ে নিয়ে।

বুঝলাম না আপনার কথা।

বুঝলেন না। আপনার জন্যেই তো ও যাচ্ছিল। আপনি নীগাহিঁতেই নেই তা ও সম্ভবত জেনে গেছিল কিন্তু সে কথা আমাকে বলে কী করে। তাই মধ্যে দিয়ে আমাকেই মাথা ফাটিয়ে কেলেঙ্কারী করতে হল। ও ইচ্ছে করেই আমাকে ফেলে দিয়েছিল। এখন প্রাঞ্জলভাবে বুঝতে পারছি।

ওপাশ থেকে রূপা নামক অত্যন্ত সপ্রতিভ মেয়েটি হেসে উঠে বলল, আমিও বুঝতে পারছি যে আপনার কল্পনাশক্তি অত্যন্ত প্রবল। আপনি তো বানিয়ে বানিয়ে গল্প-টল্প লিখলেও পারেন।

গল্প বা উপন্যাস যাঁরা লেখেন তাঁরা বুঝি বানিয়েই লেখেন বলে আপনার ধারণা?

লেখেন না?

সম্ভবত নয়। পুরোটাই অবশ্যই বানানো নয়। তবে তাঁদের কল্পনাশক্তি অবশ্যই প্রবল যে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই কোনো। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা এই যে, তাঁদের ঈশ্বর এক বিশেষ অন্তর্দৃষ্টি দেন। তাঁরা, আমরা যা দেখতে পাই না, তাই দেখতে পান। যেখানে আমাদের মমত্বর বা সহমর্মিতার আঙুল কখনওই পৌঁছতে পারে না, সেখানে ওঁদের আঙুল সহজেই পৌঁছয়।

বাঃ। আপনি তো ভারি সুন্দর কথা বলেন।

যারা কাজে অপদার্থ তারাই সুন্দর কথা বলে।

কথা বলাও তো একটা কাজ। খুব সুন্দর কাজ। কজন সুন্দর করে কথা বলতে পারে? বলুন?

তা জানি না।

মানে?

মানে, ক'জন বলতে পারেন তা জানি না, তবে আপনি পারেন।

আজকে সন্ধেবেলাতে আপনাদের কি কোনো প্রোগ্রাম আছে? মানে, কোথাও যাবার?

না তো। আমি অন্তত জানি না। অতির থাকতেও পারে।

আপনাকে ফেলে উনি নিশ্চয়ই যাবেন না কোথাওই।

যেতেও পারে। যে আমাকে ইচ্ছে করে মোটর সাইকেল থেকে ফেলে দিতে পারে, সে আমাকে ফেলে কোথাও যেতে পারে না তা বিশ্বাস করা শক্ত।

যাই হোক, আপনি তো যাচ্ছেন না কোথাওই?

না। আমার যাবার জায়গা কোথায়?

তবে শুনুন স্যার। আমাদের বাড়ি আপনাদের নেমন্তন্ন আজ রাতে। অবশ্যই আসতে হবে।

সেকী। কেন?

আজ দাদার জন্মদিন। তবে কথাটা আপনাকেই জানালাম, অতিদাকে জানাবেন না। ফুলটুল নিয়ে এসে ব্যাপারটার ইনফর্মালিটিকে একেবারেই নষ্ট করে দেবে।

বেশ। জানাব না।

তারপর বলল, আপনি জীবনের সব ক্ষেত্রেই ফর্ম্যালিটি বুঝি খুবই অপছন্দ করেন?

হয়ত তাই। ফর্ম্যালিটিকে আমার বড় জবরজং লাগে। বেনারসী শাড়ির মতো। যে শাড়ি বিয়ের দিনে পরতে হয় তা কি রোজদিন পরা ভাল না, পরা সাজে? পরলে, বাজে ব্যাপার হয় না?

তা ঠিক।

তাহলে আসছেন। ডিনারও এখানে। আসলে, মা এখন রেনুকুটে। তাই ভারত স্বাধীন। আপনাদের তো আবার আজে-বাজে জিনিস না খেলে খিদে হয় না, কবিতা আসে না, গান আসে না। তাই দাদার

জন্মদিনে ভারত স্বাধীন হওয়াতেই আমিই ইনিসিয়েটিভ নিয়ে ব্যাপারটা ঘটালাম। নইলে, দাদার জন্মদিনে মা পায়েস রেঁধে দেন, আমি কেক বানাই, ব্যাস। এবারে ভারত এই প্রথম স্বাধীন হল বলেই...

কাটাতে যেতে হবে?

আপনি যখনই আসবেন তখনই সুসময়।

বেশি লোক হবে না তো?

কেন?

আমার ভিড় ভাল লাগে না।

খুব ভিড় হবে না। তবে ভারত তো রোজ স্বাধীন হয় না। কম কম করেও পনেরো-ষোলো জন তো হবেই। অতিদার কাছে শুনলাম ঝিমলিকে আপনার খুব পছন্দ হয়েছে...

বলেই বলল, পছন্দ হয়েছে মানে, বুঝেছি, ভ্রাতৃবধূ হিসেবে, যদি ভাই আদৌ থাকত।

সবই শুনেছেন তো দেখছি।

আর বলেছি, পামরিকে আর রায়কেও। রেবা কাকিমাকেও বলতে পারতাম কিন্তু উনি আপনাকে একদিন ওঁদের বাড়ি যেতে বলেছেন নিভৃতে অনেক কথা বলবেন। উনি এলে, পাছে ভারত পরাধীন হয় তাই উনি আসবেন না। খুবই কনসিডারেট মহিলা উনি।

ওঁকে আপনি বহুদিন হলো চেনেন, না?

হ্যাঁ। শিশুকাল থেকেই। হাজারীবাগে আমার মামাবাড়ি ছিল তো। ওঁরা মামাবাড়ির পাশের বাড়িতেই থাকতেন।

শুনেছি, সবই ওঁর কাছে। ভারি চমৎকার মহিলা। সাচ্ছল্য আর সম্ভ্রান্ততা যে সমার্থক নয়, তা ওঁকে জানবার আগে আমি জানতাম না। পামরিও ভারি ভাল মেয়ে। ভাল মানে, একেবারেই অন্যরকম। She does not belong to the run or the mills. তবে কতদিন হয়ে গেছে। আমাকে হয়ত ভুলেই গেছে।

তারপরই বলল অনিল, আর কে কে আসছেন?

আপনি তো কারোকেই চেনেন না। বলে লাভ কী?

তবে বিশ্বজিৎদা আসছেন। সস্ত্রীক।

কে বিশ্বজিৎদা?

বিশ্বজিৎ বাগচী। উনিই আপনাদের তুলে নিয়ে আসবেন। মোটর সাইকেলে করে দয়া করে আসবেন না।

হেঁটে গেলে হয় না?

না। অনেক দূর আমাদের বাড়ি।

তা মিঃ বাগচীর তো ডান হাত ভাঙা— জিপ অ্যাকসিডেন্টেই ভেঙেছে শুনেছি, এখনও ব্যান্ডেজ কাটা হয়নি। তা আমাকে মোটর সাইকেল থেকে ফেলেও আপনাদের মন ভরেনি, এবার কি জিপ থেকে ফেলতে চান?

মনে হল, রূপা জোর হেসে উঠল ও প্রান্ত থেকে।

বলল, আর কেউ যদি নাও আসে, আপনি একা এলেই দাদার জন্মদিনের পার্টি জমে যাবে। You are a sparkling conversationlist.

তাই? হ্যাঁ স্যার।

তারপর বলল, আচ্ছা এখনকার মতো তাহলে ছাড়ি। অতিদাকে বলবেন, কোনো বাহানা শুনতে চাই না। তাড়াতাড়ি আসতে বলবেন। অতিদাকে বলবেন যে, তাঁর প্রিয় পদ আমি নিজে হাতে রান্না করব।

কী?

ধোকা।

বাঃ জন্মদিন আপনার দাদার আর রান্না হচ্ছে অন্য একজনের প্রিয় পদ।

ধোকা দাদারও খুব প্রিয়।

ধোকা-প্রিয়রা সকলেই কি ধোঁকাবাজ হয় আমার বন্ধু অতির মতো?

তা জানি না।

বিহার মধ্যপ্রদেশ-উত্তরপ্রদেশে ধোঁকাকে হিন্দিতে বলে তিড়ি। আর ধোকা যারা দেয় তাদের বলে "তিড়িবাজ"।

তিড়ি?

হ্যাঁ।

এখন ছাড়ি? কেমন?

সন্ধেবেলা দেখা হবে।

রিসিভারটা ক্র্যাডল-এ রাখার শব্দ শোনা গেল খট করে। একসঙ্গে বেশি কথা বললে দুর্বল লাগে।

বাইরে এক জোড়া লাল পাখি কদমগাছের ডালে বসে ভারি মিষ্টি ডাক ডাকছিল। অবাক হয়ে সেদিকে চেয়ে রইল অনিশ। এই সব পাখিটাখির কিছু চেনে অতি ছেলেবেলা থেকেই। কিন্তু এই লাল পাখিদের চেনে না।

ওর হাজারীবাগের মামাবাড়ির পাশের বাড়ির বিজিতেন মামার জন্যেই এই ব্যাপারে ঔৎসুক্য ওর মধ্যে তারিয়ে গেছিল। শুধু পাখি নয়, গাছ-গাছালিও। প্রতি রবিবারে ও শিবপুরের বটানিক্যাল গার্ডেনসে যেতই। ওর খুব ইচ্ছা ছিল যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের পরীক্ষাতে বসে ও ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিসে জয়েন করবে। তারপর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের অফিসার হবে। কিন্তু ওদের ছেলেবেলাতেও ছেলেমেয়ে কী হতে চায় আর না চায় তার চেয়েও বড় ছিল বাবা মা তাদের কী হওয়াতে চান।

অতির বাবার খুব ইচ্ছে ছিল অতি মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার হোক, ধানবাদ থেকে পড়ে। ভূতত্ত্ব স্বপ্নের বিষয় ছিল অথচ অতির ঠাকুর্দা ছিলেন জার্ডিন হেন্ডারসনের অ্যাকাউন্ট্যান্ট। ডিগ্রিহীন অ্যাকাউন্ট্যান্ট। তাই তাঁর খুব ইচ্ছা ছিল যে ও চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি পড়ুক। কোম্পানির অডিটরদের ধরে করে রায় অ্যান্ড রায় কোম্পানিতে আর্টিকেলড ক্লার্কও করিয়ে দিয়েছিলেন উনি কিন্তু চারদেওয়ালের মধ্যে বসে অন্য মানুষের রোজগার করা লক্ষ লক্ষ টাকার হিসেব কী করে রাখতে হয় সেই বিদ্যেতে পারদর্শী হতে তার মোটেই ভাল লাগল না। সি. এটা পাস করতে পারলে তো বটেই, নিদেনপক্ষে এম. কমটা পাস করলেও জার্ডিন হেন্ডারসনেই ওকে ঢুকিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারতেন। পালটি-ঘরের মনোমতো একটি মেয়েও ঠিক করে রেখেছিলেন পুত্রবধূ হিসেবে। কিন্তু দুই সাধই অপূর্ণ

রেখে তিনি হঠাৎই একদিন হেদোর কাছে ঝকঝকে নতুন দোতলা বাস চাপা পড়ে মারা গেলেন অফিস যাবার সময়ে। আত্মীয়স্বজনের শোকের মধ্যে ওইটুকুই সান্ত্বনা ছিল যে, একেবারে ঝকঝকে নতুন এবং বিলেতি দোতলা বাসের নীচে তাঁর প্রাণটা গেছে। কেউ কেউ বেশিও কেঁদেছিলেন কারণ তখনকার দিনের ফিয়াট বা ল্যান্ডরোভার বা আজকালকার দিনের ছারপোকা-সদৃশ মারুতির নিচে তাঁর প্রাণ যায়নি। কত "বেশি" লেগেছিল তা নিয়েও শোকার্তদের মধ্যে আলোচনা হয়েছিল নাকি। বাঙালিদের অনুভূতি প্রবণতা এবং কল্পনাশক্তির কখনই কোনো খামতি ছিল না।

এই সব গল্প অতির মুখেই শুনেছিল অনিশ।

আর অতির মা সীতা মাইমা চেয়েছিলেন যে অতি সরোদীয়া হোক। মুস্তাক আলি খাঁ সাহেবের এক নামী ছাত্রর কাছে তাকে নাড়াও বাঁধিয়েছিলেন। ডেবিট-ক্রেডিটের গোলোকধাঁধা এবং সরোদের ঝংকারের মধ্যে উদভ্রান্ত থাকলেও সরোদটাই বেশি পছন্দর ছিল ওর। বাবা জানতেন না। বাবা তাঁর স্বপ্ন নিয়েই নিমতলাতে গেছিলেন। মায়ের স্বপ্ন পূরণ করাও সম্ভব হয়নি অতির পক্ষে অর্থনৈতিক কারণে। বেচারী অতি। সরোদ শেখা শেষ করতে পারেনি বটে কিন্তু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রতি ওর গভীর প্রেমকে ও আজও জাগিয়ে রেখেছে হৃদয়ে নইলে উস্তাদ রাহিম খানের গান আরেকবার শুনতে পাবে তাদের সি.জি.এম অগ্নিভ চ্যাটার্জির বাড়ি এ কথা ভেবেই সে শিশুর মতো উল্লসিত হয় কেন এখনও?

মনে পড়ে গেল অনিশের যে সেই অনুষ্ঠান হয়নি গত সপ্তাহে, পিছিয়ে আগামী সপ্তাহে করতে হয়েছে কারণ খাঁ সাহেবের ছুটি মেলেনি বেনারসের অনুরাগীদের হাত থেকে।

অতির নামটার পেছনেও এক করুণ ইতিহাস আছে। অতির বাবার নাম ছিল সামান্য কুমার। কে তাঁর নাম রেখেছিলেন তা জানা ছিল না তাঁর নিজের তাই সেই আফসোস পুষিয়ে নিতে তিনি সামান্য কুমার রায়, পুত্রর নাম রাখেন অতিকুমার রায়। এই নামের কারণে তার বাবারই মতো

অতিকে কম দুর্ভোগ পোয়াতে হয়নি শিশুকাল থেকে। এখানে দানব-দর্শন সব ড্র্যাগলাইন চালায় বলে নাম হয়েছে অতিকায় রায়। অনেক মানুষে ঠাট্টা করে শুধিয়েছেন, কুমার অবধি জানা ছিল, চিরকুমারও অজানা ছিল না কিন্তু অতিকুমারটি ঠিক কী বস্তু তা তো ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না।

বলেছিলেন, কৌমার্য নিয়ে আমাদের ব্যস্ততা নেই, কিন্তু অতিকৌমার্য নিয়ে অবশ্যই আছে।

খবরের কাগজ পড়া শেষ হলে ঘরে গিয়ে বিছানাতে শুল একটু। সুস্থ মানুষও বিছানাতে, বিশেষ করে হাসপাতালের বিছানাতে শুয়ে থাকলে অসুস্থ ও দুর্বল হয়ে যায়। তার উপরে নানারকম ওষুধপত্র, ইঞ্জেকশন, অ্যান্টিবায়োটিকে যে-প্রকার অভিঘাত ঘটে একজন মানুষের শরীর-মনে, তা থেকে কাটিয়ে উঠতে বেশ সময় লাগে।

মানুষ তো শুধুমাত্র শরীরী জীবই নয়, মন বলেও যে তার এক বিশেষ সূক্ষ্ম, বস্তু আছে এ কথা অধিকাংশ ডাক্তারেরাই বোঝেন না। মানুষের সঙ্গে গিনিপিগ বা কমন ইন্ডিয়ান মাঙ্কির কোনো তফাতই তাঁরা করেন না। এটা দুর্ভাগ্যজনক।

আকাশ পরিষ্কার। ঝিরঝির করে হাওয়া বইছে একটা। জানালার পর্দা উড়ছে ধীরে ধীরে। ঘুম ঘুম পাচ্ছে অনিশের। অতির ক্যাসেট প্লেয়ারে কণিকা ব্যানার্জির একটি সি.ডি চাপিয়ে দিয়ে, যার প্রথম গানটিই 'দূরে কোথায় দূরে দূরে' গানটি, শুয়েছিল অনিশ। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চলে যাবার পর থেকে এই গানটি যেন তাঁর সঙ্গে তাঁর শ্রোতার এক বিশেষ দূরত্বের অনুষঙ্গ তৈরি করেছে, যা মানসিকভাবে শ্রোতাকে আরও দ্রব করে। "দূরে কোথায় দূরে দূরে, আমার মন যে বেড়ায় ঘুরে ঘুরে/যে পথ সকল দেশ পারায়ে উদাস হয়ে যায় হারায়ে, সে পথ বেয়ে কাঙাল-পরান, যেতে চায় কোন অচিন পুরে, দূরে কোথায় দূরে দূরে।"

ঘুমে চোখ লেগে এসেছিল অনিশের এমন সময়ে ডোর-বেলটা বাজাল। পাখির ডাকের মতো স্বর তার। ছুটকু রান্নাঘর থেকে গিয়ে দরজা খুলেই আপ্যায়ন করল। বলল, আইয়ে। আইয়ে। হাঁ হাঁ বিলকুল ঠিক।

অনিশ উঠে বসার ঘরে যেতেই দাঁড়িয়ে-থাকা মীনাক্ষী বললেন, এনি কমপ্লেইন? উওর ডক্টর উইল আস্ক মী অ্যাজ সুন অ্যাজ আই এন্টার দ্যা হসপিটাল।

অ্যাবসলুটলি ও.কে। থ্যাঙ্ক উ ভেরী মাচ ম্যাডাম।

ফাইন। টেক রেস্ট। সী উ্য। বলে, সিঁড়ি বেয়ে তরতরিয়ে নেমে গেলেন মিসেস শ্রীরামালু, খোঁপার ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে ঘরময়।

অনিশের মনে হলো একসময়ের শান্তিনিকেতনের মেয়েদের জীবনের সঙ্গে ফুল যেমন অঙ্গাঙ্গী হয়েছিল এখনও অধিকাংশ দক্ষিণ ভারতীয় মেয়েদের কাছে তা আছে। দেখে, ও গন্ধ নিয়ে ভাল লাগে। একটু ফুলের গন্ধ পরিবেশে যে কতখানি বদল আনতে পারে মুহূর্তে তা বলে শেষ করা যায় না। নিচে ডাঃ শ্রীরামালু গাড়ি স্টার্ট করে, স্টার্টে রেখে, বাঁদিকের সীটে গিয়ে বসেছিলেন নিশ্চয়ই। ডাক্তার মেমসাহেব চালাবেন। নিশ্চয়ই নতুন লাইসেন্স মেমসাহেবের। সড়গড় হতে চান আরো।

উনি চলে যেতেই অনিশের মনে পড়ে গেল প্রমথ চৌধুরীর একটা চিঠির কথা। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে লেখা। তখনও তাঁদের বিয়ে হয়নি। প্রেম করছেন। প্রমথ চৌধুরী লিখেছিলেন : শিউলি ফুল সম্বন্ধে। সেই চিঠিটি পড়ার আগে অনিশ নিজেও জানতো না যে শিউলির সংস্কৃত নাম হরশৃঙ্গার। লিখেছিলেন "ভৈরবীর মধ্যে কড়িমধ্যম এলে প্রাণের মূলে যেরকম আঘাত করে ঠিক সেই ভাবের (জানিনে, তোমরা ভৈরবীতে কড়িমধ্যম লাগাও কি না! ওস্তাদি হিসেবে সেটা বে-দস্তুর) একটুখানি চাঁদের আলোয়, একটা ফুলের গন্ধে, একটা গানের সুর আমাদের প্রকৃতির আসল অংশটি একেবারে খুলে দেয়। তুমি সৌন্দর্য, কবিত্ব মহত্ত্ব বলে যে জিনিস পৃথিবীতে আছে বলে বিশ্বাস করো, আমিও করি, কিন্তু জিনিসগুলির পূর্ণবিকাশ কেবলমাত্র গুটিকতক মাহেন্দ্রক্ষণে হয়। নিজের চেষ্টায় হয় না, বাইরের সৌন্দর্য, কবিত্ব, মহত্ত্ব এসে তা ফুটিয়ে তোলে। একটি ফুলের গন্ধে যা ফুটিয়ে তুলতে পারে তা দশ ভল্যুম ফিলজফিতে পারে না।"

আজ সকালে অতির হার্ট-থ্রব বা হার্ট-বার্ন রূপার সঙ্গে কথা বলে মনটা ভারি খুশি খুশি লাগতে লাগল। অনেক অনেকদিন পরে সাধুসঙ্গে হুইস্কি খেলে যেমন খুশি-খুশি হয় আর কী। অতির জন্যে গর্ব হতে লাগল ওর। চোখে এখনও দেখেনি বটে তবে ফোনে কথা বলে আন্দাজ তো একটা হয়ই। এমন মেয়ের সঙ্গেই পীরিতি করা চলে। সেই চণ্ডীদাস কবে পীরিতির ডেফিনিশন দিয়ে গেছিলেন।

"জলের উপর স্থলের বসতি
তাহার উপরে ঢেউ—
তাহার উপরে পীরিতি বসতি
তাহা কি জানয়ে কেউ।"

অতি বলেছিল, ওর ফিরতে দেড়টা-দুটো হবে। অনিশ যেন খেয়ে নেয়।

সি ডি ক্যাসেটটা উল্টে দিয়ে পাশ বালিশটা টেনে নিয়ে চোখ বন্ধ করল অনি। এই অকারণের ঘুম, অসময়ের ঘুম, গর্হিত ঘুমের একটা আলাদা মজা আছে। মা বলতেন, ছুটি মানে শুধু কাজ থেকে ছুটি নয়, নিয়ম থেকে, ছুটি, সবরকম নিয়ম থেকে ছুটি। অনিশ তার মায়ের কথা মানে অক্ষরে অক্ষরে। অধিকাংশ ছুটির দিনে, কোথাও বেরোবার না থাকলে, দাড়ি কামায় না, সময়ে খায় না, অসময়ে অনেক কাপ চা খায়, দেরি করে দুপুরের খাবার খায়, অনাহুত অতিথিকে খেয়ে যেতে বলে, একেবারে হারুন-অল রসিদ হয়ে যায়। উল্টে-পাল্টে ঘুমোয় অসময়ে।

কিন্তু ভবানীপুরে তাদের বাড়িটা আদিগঙ্গার দিকে গলির মধ্যে হলেও ছুটির দিনেও আওয়াজের কমতি নেই। ট্যাক্সির লাগাতার শব্দ, ট্রাকও যায়, রিকশার টুং-টাং, অদূরে একটা মোটরগাড়ি মেরামতের কারখানা— বিশ্বকর্মা পুজোর দিন ছাড়া অন্য কোনোদিনই তা বন্ধ থাকে না। তাই নৈঃশব্দ কাকে বলে তা বহুবছর পরে এই নর্দার্ন কোলফিল্ডস-এর এই নীগাহিঁতে এসে পুনরাবিষ্কার করল যেন অনিশ।

সেই ঘোর সকালে ঘুমিয়েই পড়েছিল কর্মহীনতার বিপুল অবকাশের

আশ্লেষে এমন সময়ে সেই পাখির স্বরের মতো ডোর-বেলটা আবারও বাজল। চোখ খুলল অনিশ।

শুনল, ছুটকু দরজা খুলছে। বলছে আরে! আপ দিদি! কিতনা দিনো বাদ। আইয়ে আইয়ে পাধারীয়ে। বৈঠিয়ে। মগর সাব তো খাদান গ্যায়ে।

ম্যায় জানতি হু। সাবসে মিলনে নেহি আয়ী হুঁ।

তো?

মারীজ কৈসে হ্যায়।

বিলকুল ঠিক। ও! অব সমঝা! অনি সাহাবসে মিলনে আয়া আপনে।

হাঁ ছুটকু।

মগর উনোনে তো শুয়া হুয়া না। দেঁখে?

নেহি, নেহি। তব ফিক্কর মত করো। মুঝকোভি তো ফোন করকে আনা চাহিয়ে থা। বগলমে আয়ী থী কো-অপ মে। তো লাগা কি, এক মরতবে দিখকর যানা। বচপনকি জান-চিন থী।

সচ?

অবাক গলাতে বলল, ছুটকু।

আপ কঁহাকি দিদিজী।

হাজারীবাগকি?

কভিভ শুনা নেহি নাম। উও জাগা কঁহা থা? কলকাত্তাকি অগল বগলহি?

ততক্ষণে অনিশ বসবার ঘরে উঠে এসেছে।

ওকে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল পামরি।

বলল, তুমি একরকমই আছ অনিদা।

তুমি আগের থেকেও সুন্দরী হয়েছো পামরি।

পামরির পরনে একটি ফলসা-রঙা শাড়ি। তার পাড়টি বেগুনী রঙা। গায়ে সাদা ব্লাউজ। হাতার কাছে লেস-এর ফ্রিল লাগানো। পায়ে বেগুনী-রঙা চটি। আর খোঁপাতে এক গুচ্ছ হালকা বেগুনী ফুল।

মুগ্ধ চোখে চেয়ে অনিশ আবারও বলল বাক্যটি।

পামরির ফলসা-রঙা গাল বেগুনী হলো লজ্জা-মেশানো ভাল লাগাতে। তারপর সামান্য হেসে বলল, আমরা গরিব হতে পারি অনিদা কিন্তু বাড়িতে একটি আয়না আছে মুখ দেখার। আমি যে আদৌ সুন্দরী নই তা আমি জানি।

তোমার আয়নাটিকে ফেলে দাও। পুরুষের চোখই তো আয়না মেয়েদের।

একটু শরবত খাও অন্তত। ঘেমে গেছ তো।

অনি বলল, গৃহস্বামীর অনুপস্থিতিতে গৃহস্বামী বনে।

পামরি বলল, স্রিফ ইক গ্লাস পানি পিলাও ছুটকু।

বাস?

জী। বাসস।

ছুটকু চলে গেলে অনিশ বলল, আমি যদিও ঘুমিয়ে ছিলাম তবু আমার ঘুম খুবই পাতলা, তুমি এলে কীসে করে? কোনো আওয়াজ তো পেলাম না? হেঁটে এলে?

না। সাইকেলে। আমার বাহন একটি লেডিস সাইকেল।

তাই?

তারপর বলল, সেদিন অতির সঙ্গে তোমার লাইব্রেরিতে গেছিলাম।

শুনেছি।

কে বলল?

ঝিমলি।

ও সেই সুন্দরী সপ্রতিভ মেয়েটি।

হুঁ।

রেবামামীমা আমাকে একদিন যেতে বলেছেন যে তাও শুনেছি। যাব। দেখো না ইতিমধ্যে কী কাণ্ড। এদিকে ফেরার সময়ও হয়ে এল।

মা না বললে যেতে না?

ঠিক ভেবে দেখিনি। তোমার সঙ্গে তো আমার সেরকম ঘনিষ্ঠতা ছিল না। মানে, মনে মনে ছিল, কিন্তু...

আমি তো দাদাদের মতো ছেলে ছিলাম না, যে তোমার সঙ্গে টিয়ার বাচ্চা পাড়তে গাছে চড়তাম।

গাছে চড়াই কি পুরুষের সমান হওয়ার একমাত্র পথ? তুমিও কি তসলিমা নাসরিন না কি?

হেসে ফেলল, পামরি।

বলল, তুমি তো চোখের সামনেই থাকতে সবসময়ে। দাদাদের সঙ্গে হুটোপাটি করতে, বাবার সঙ্গে রাজডেরোয়ার জঙ্গলে যেতে নতুন ফুল গাছের সন্ধানে, দাদাদের সঙ্গে একসঙ্গে খেতে বসতে। আমিই তো তোমাদের সকলকে পরিবেশন করতাম। হ্যাঁ তবে কথা খুব একটা বলিনি যে, এ কথা সত্যি। তখনকার দিনে ওরকম রেওয়াজও ছিল না। তাছাড়া তখন তো আমি ঝিমলির চেয়েও অনেক ছোট ছিলাম, এখনকার মেয়েদের মতো সপ্রতিভও ছিলাম না।

তুমি আমার কাছে এখনও ছোটই আছ।

হেসে ফেলল পামরি। ভারি সুন্দর দেখাল হাসিটা। ওর দুটি গজদন্ত আছে। কুড়ি বছর পরে দেখা হল ওর সঙ্গে। ওর কথা মনে হলেই ওর হাসিতে কী যেন একটা বৈশিষ্ট্য ছিল সে কথা মনে পড়ত কিন্তু সেটা যে কী তা কিছুতেই মনে আনতে পারত না। আজ সেই বৈশিষ্ট্যটা পুনরাবিষ্কৃত হলো।

তারপর দুজনে বেশ কিছুক্ষণ দুজনের দিকে চুপ করে চেয়ে রইল। খুবই প্রিয় অথচ অন্য ভাষাভাষী হারানো কুকুর বহুদিন পরে বাড়ি ফিরে এলে তার মালিক যেমন তার সঙ্গে কথা না বলে, তাকে আদর না করে, তার মাথায় বা ঘাড়ে হাত দিয়ে চুপ করে বসে থাকে তেমন করেই পামরির শরীরের কোথাওই হাত না দিয়ে চুপ করে বসে থাকতে ভাল লাগছিল।

অনেকক্ষণ পরে অনিশ বলল, অনেকই ঋণ জমে আছে তোমাদের পরিবারের কাছে আমার। নানারকম ঋণ। পাশের বাড়িটা নামেই আমার মামাবাড়ি ছিল। আসলে হাজারীবাগ বলতে যেটুকু স্মৃতি আমার, তা ছিল তোমাদেরই বাড়ি ঘিরে।

তারপর বলল, সত্যি বিজিতেন মামার মতো মানুষ আর দেখিনি।

পামরি হেসে বলল, মা বলেন অমানুষ। আমাদের ভাসিয়ে দিয়ে চলে গেছিলেন।

কেউ কারোকে ভাসাতে পারে না পামরি। তুমি টলস্টয়ের সেই বইটি, বই ঠিক নয়, বড় গল্প, WHAT MEN LIVE BY পড়েছ কি? না পড়ে থাকলে, পড়ো।

আমাদের এই লাইব্রেরির জন্যে বেশ কিছু বই তুমি দাও না অনিদা। বিশ্বজিৎদার ভায়রাভাই স্বপ্নময়বাবুকেও চিঠি লিখেছি অনুরোধ জানিয়ে।

দেব। নিশ্চয়ই দেব। কার কার বই তোমাদের পছন্দ, তার তালিকা করে দিও।

আধুনিক লেখকদের মধ্যে বহু লেখকের বইই পছন্দ। যাঁদের বই বেশি পছন্দ, দেব তাঁদের তালিকা। আর ক্লাসিকস এরও। আধুনিক লেখকদের লেখা বেশ কিছু বইও অবশ্য ক্লাসিকস এর পর্যায়ে চলে গেছে। সেগুলোরও তালিকা দেব।

তারপর বলল, তোমার কি মনে হয় না যে, প্রকৃতই শিক্ষিত বলতে তুমি কী বলতে চাইছ? প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালিরা মানে, যদি তাঁরা অবশ্যই প্রকৃতই শিক্ষিত হন...

জীবিকার জন্যে কোনো বিদ্যা অর্জন করলেই তাঁকে আমি শিক্ষিত বলি না, মাসে তিনলক্ষ টাকা রোজগার করলেও বলি না, তা তিনি ডাক্তারই হন, কী ইঞ্জিনিয়ার, কী চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। বাংলা সাহিত্য, গান ও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে কিছু করাটা সেইসব শিক্ষিত বাঙালির পক্ষে এখন খুবই প্রয়োজন হয়? যাচাই না-করেই বাতিল করাটা কি উচিত? বাংলাতে আজও যা লেখা হয় তা কি আজকের ইংরেজি সাহিত্যের চেয়ে কোনো অংশে খারাপ? ইংরেজি হরফে যাইই লেখা হয় তাই কি মহৎ সাহিত্য?

অবশ্যই নয়। তুমি ঠিকই বলেছ। আসলে বাঙালি জাতের জাত্যভিমানটাই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। তার বদলে যেটা গড়ে উঠছে সেটা এক ধরনের বিজাতীয় অনুকরণপ্রিয়তা এবং আত্মঘাতী ঔদ্ধত্য। এই

দুর্মতি থেকে বাঙালিকে বাঁচাতে না পারলে বাঙালি বলে কোনো জাত ভবিষ্যতে আর থাকবে না। অথচ আমাদের যা ছিল, তা আর কার ছিল?

পামরি বলল, লক্ষ্মী আমাদের কোনোদিনও ছিল না। সরস্বতী ছিল। এবং সে কারণে সারা ভারতবর্ষের মানুষ আমাদের এক অন্য সম্মানের চোখে দেখত। আজ লক্ষ্মীকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরতে গিয়ে সরস্বতীকেই ছেড়েছে বাঙালি এবং লক্ষ্মীকেও পায়নি। দুনৌকোতে পা দিলে যা হয় আর কী!

ঠিকই বলেছ।

তোমার মাথায় ওটা কী ফুল? জ্যাকারান্ডা?

না।

পামরি বলল। এখানে জ্যাকারান্ডা পাওয়া ভার। তবে আমি কুটুদার মাধ্যমে সুরিবালি সিং সাহেবকে বলিয়ে কিছু লাগিয়েছি। শুধু নীগাহিঁর কলোনিতেই নয়, জয়ন্ত, আমলোরি, কাকড়ি, গর্বী এবং সিঙ্গরাউলিতেও।

কুটুদাদা কে?

রায়বাবু। আমার পিসতুতো দাদা। যাঁর সঙ্গে আমরা আছি। যাঁর সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছিল না ট্রেনে এখানে আসার সময়ে।

ও বুঝেছি।

জ্যাকারান্ডা লাগিয়েছি যদিও কিন্তু বড় হতে আরও তিন বছর তো লাগবেই।

কী করছ তুমি এখানে পামরি? শুনলাম, সেলাই করো। অনিশ বলল।

তারপর বলল, কিছু মনে কোরো না, তাতে কি যথেষ্ট হয়?

পামরি হাসল। গজদন্তের জন্যে তার হাসিটি সত্যিই এক অন্য মাত্রা পেয়েছে। ভারি নির্মল হাসিটি ওর। চিরদিনই। ছেলেবেলাতে হয়ত এতখানি মনোযোগের সঙ্গে তাকে বা তার হাসিকে লক্ষ্যও করেনি কখনও। যৌবন যখন পুরোপরি এসে থিতু হয় তখন পাল্কিতে করে অনেক ধনদৌলত বয়ে এনে প্রত্যেক সামান্য নারীকেও মহারানী করে দেয়। এ কথা ভেবে আশ্চর্য হল অনিশ। পামরির মধ্যে দিয়েই কি ওর

এই এতগুলো বসন্ত পার করে এই সত্য অবশেষে প্রতিভাত হলো নীগাহিঁতে এসে?

পামরি বলল, যথেষ্ট হয় কি না জিজ্ঞেস করলে তুমি অনিদা। যথেষ্ট কি কখনও হয়? যথেষ্ট ব্যাপারটা তো একটা অ্যাটিচুডের ব্যাপার। বাবা আমাদের একটা কবিতা শিখিয়েছিলেন, কার মনে নেই, সম্ভবত KEATS-এর I am Content with What I have.

Be it little or more." আমার সন্তুষ্টি বিধানটাই হলো আসল কথা। তা হলেই তো যথেষ্ট হলো। নিজের সন্তুষ্টির উপরে বাঁধ বাঁধতে পারলেই যথেষ্ট হয়, নইলে পৃথিবীর সব ধনরত্নেও তা হয় না।

তারপর দুজনেই অনেকক্ষণ চুপ করে রইল।

বাঃ। সত্যি বিজিতেন মামা তোমাদের সকলকে কী সুন্দর শিক্ষা দিয়েছিলেন।

বাবা দিলে কী হয়, আমার সকলে কি তা নিতে পারলাম অনিদাদা। আমার সম্বন্ধে আমার কিছু অনুযোগ নেই কিন্তু আমার দাদারা দুজনে মানুষ হলে কি মায়ের এতো প্রিয় হাজারীবাগ ছেড়ে এই মধ্যপ্রদেশের সিধি জেলার নীগাহিঁর খাদানে এসে থাকতে হয়। এর কিছু পরেই তো ব্যায়রান। জানো তো? আগে রেওয়ার রাজা এই ব্যয়রানে দাগী আসামীদের এনে ছেড়ে দিতেন। এর চেয়ে ফাঁসিও ভাল ছিল।

অনি চুপ করে থাকল। ওর মুখে এসে গেছিল যে, কলকাতাতে পুরনো হলেও আমার এত বড় বাড়ি। সেখানে তোমরা এসে থাকতে পারো। কিন্তু জিভ কামড়ে ধরল পাছে কথাটা বাইরে না বেরোয়। জীবন অনিশকে শেয়ালের মতো ধূর্ত ও সাবধানী করে তুলেছে। সে জন্যে সে লজ্জিতও যেমন, গর্বিতও তেমন। পরক্ষণেই নিজেকে বুঝ দিল এই বলে যে, যাঁরা সারাজীবন হাজারীবাগের মতো খোলামেলা জায়গাতে থেকেছেন তাঁদের পক্ষে কলকাতার গলিতে বাস করা সম্ভব নয়, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে।

হঠাৎই পামরি বলল, অনিদা, আমি তোমাকে একটা কথা বলতে এসেছি। বলতে পারো, তোমার কাছে একটি ভিক্ষা চাইতে।

ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল অনিশের। পামরি কি জেনে গেছে যে, তার ব্যাঙ্কে প্রায় তিনলাখ টাকার এফ.ডি. আছে? তার পি.এফ. ও জমেছে অনেক। বাবার রেখে-যাওয়া লাখ চারেকের কোম্পানি-কাগজ, যা এতদিন মায়ের ছিল, তাও এখন তার। মায়ের সব গয়না-গাঁটিও। তাছাড়াও মায়ের মৃত্যুর পরে একটি পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ডের অ্যাকাউন্ট করেছে ভবানীপুর স্টেট ব্যাঙ্কে। তাতেও প্রতিমাসে পাঁচ হাজার করে জমা দেয়। ওর মন বলছে, টাকা চাইবে পামরি নিশ্চয়ই অনিশের কাছে। এই জন্যেই তো অসম অবস্থার মানুষের মধ্যে সম্পর্ক থাকে না, রাখা যায় না, তেলে-জলে মিশ খায় না কখনওই।

অনিশ বলল, ভি-ভি-ভি-ক্ষা? ব-ব-বলো। বলো না? যদি সম্ভব হয়, তাহলে দেব, দেব না কেন?

না, না। আগে বল যে তুমি 'না' করবে না, মেনে নেবে। পামরি বলল।

নিজেকে বলল, অনিশ, দেখেছো! এই জন্যেই অতিটা কাজে বেরিয়ে যাবার পর একা একা এসেছে পামরি অনিশের...

শোনো। রাগ কোরো না কিন্তু।

পামরি বলল, আমার পক্ষে আজ রাতে রূপাদের বাড়িতে যাওয়া কিন্তু সম্ভব হবে না। তুমি পাছে কিছু মনে করো, তাই ভাবলাম আমি নিজেই এসে বলে যাই।

তারপরে বলল কো-অপ এ এসেইছিলাম। এত বছর পরে যোগাযোগ হলো, ভুল তো তুমি বুঝতেই পারো।

তারপরই বলল, অতিদাদা আমাকে জানে, যাঁরা আজ যাবেন ওখানে তাঁদেরও সকলকেই জানেন উনি, তাই অতিদাদা কিছুমাত্রই মনে করবেন না যে, তা আমি জানি। তুমিই ভুল বুঝতে পারো। তারপরই বলল, এবারে আমাকে উঠতে হবে। মা চিন্তা করবেন।

তুমি রূপা আর ওর দাদা, কী যেন নাম?

মিধা।

হ্যাঁ। ওদের জানিয়ে দেবে তো যে যেতে পারছ না?

আমাদের বাড়িতে তো টেলিফোন নেই। তাই আমি একটি চিঠি লিখে দিয়ে যাব একটু ফুলের সঙ্গে। নিজে না আসতে পারলে বুধিয়ার মায়ের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেব। কুটুদাদার আজ বিকেলে একটু কাজ পড়ে গেছে সিঙ্গরাউলিতে। সে সিং সাহেবের সঙ্গে যাবে সিঙ্গরাউলিতে। ফিরতে ফিরতে রাত প্রায় দশটা হবে। ও আবার দশটাতেই শুয়ে পড়ে। তাই ও ও যেতে পারবে না। রাতে যায় না প্রায় কোথাওই। তাছাড়া... যাক সে প্রসঙ্গ।

টাকা বা চাকরি বা অন্য কিছু যে চেয়ে বসেনি পামরি এ কথা ভেবেই খুব ভাল লাগছিল অনিশের। রিলিভড্ লাগছিল।

ও হেসে বলল, নো প্রবলেম। ফুলও না পাঠালেও হয়। চিঠিটা পাঠালেই হবে। আমলোরি থেকে ফুল আনবার জন্যে বলে দিয়েছে অতি বিশ্বজিৎবাবুকে, আমি জানি। আর আমার সঙ্গে একটা একেবারে নতুন ইমপোর্টেড আফটার শেভ-লোশন রয়েছে সেটাই দিয়ে দেব আমি। এসব জায়গাতে তো ইমপোর্টেড জিনিস পাওয়া দুষ্কর। অতিও বোধহয় হুইস্কি নিয়ে যাবে, ঠিক জানি না।

আপনার অনারেই তো পার্টি। আপনিই তো গেস্ট অফ অনার। আপনার কিছু না দিলেও চলত। জন্মদিন তো কখনওই হয় না রূপার দাদার। আপনার আসাটাই আসল অকেশন। কো-ইন্সিডেন্স!

বলেই বলল, এবারে আমি সত্যিই উঠব।

উঠে দাঁড়িয়ে পামরি বলল, আমাদের বাড়িতে কবে আসছেন? যেদিন আসবেন, সেদিন ওখানেই খেয়ে আসবেন। অতিদাদাকে তো বাদ দেওয়া যায় না। কারণ, আপনি এখানেই উঠেছেন। তবে আপনি একা এলে আমি এবং মা দুজনেই অনেক স্বচ্ছন্দ হতে পারতাম। পুরনো দিনের প্রসঙ্গে। সেরকম হলে না হয় কুটুদাদাকেও তখন অন্যত্র পাঠিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করা যাবে। অবশ্য যদি আপনি আসেন।

দেখি। হাতে সময় তো বেশি নেই। জানাব।

আবার আসুন এখানে অনিশদা। শীতে আসুন ভাল লাগবে। ভারি সুন্দর সুন্দর নাম এই অঞ্চলের সব জায়গার ও নদীনালার। পিকনিকে যদি যেতেন 'মারা'তে তবে দেখতেন। হাজারীবাগের সঙ্গে আমাদের ছেলেবেলা ও প্রথম যৌবন জড়িয়ে-মড়িয়ে গেছে তাই হাজারীবাগের সঙ্গে কোনো জায়গারই তুলনা হয় না কিন্তু এই জায়গাও আপনাদের কলকাতার তুলনাতে অনেকই ভাল।

কী রকম? তুমি নামের কথা বলছিলে।

ব্যায়রান, পারশোনা, খুটার, রজমিলান। তারপর নইনগর হয়ে মারা।

তারপর বলল, যে কোনো উঠতি জায়গাতেই একটি করে নইনগর বা নই-মহল্লা থাকবেই? না? পথে পড়বে কাচেন নদী, লাউয়া নালা। গাড়াড়া নালা। মারাতে মারা-গুম্ভা। বৌদ্ধ গুম্ফা, ছোট্ট কিন্তু তাতে আবার দুর্গামূর্তি আছে।

তারপর বলল, আরও কত আছে! ভূতালি নালা, ঝিঙ্গাঝিরিয়া নালা, সুন্দরী মেয়ার নদী। আরও একটি গুম্ফা আছে, তার নাম রাবণমারা গুম্ফা। মারা থেকে কুড়ি কিমি গেলে বিন্দুল নামের একটি জায়গা আছে চমৎকার হরজাই জঙ্গলের মধ্যে। সেই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নানা পাহাড়ি নালা পেরিয়ে লালমাটির পথে যেতে হয়। এই পথেই পড়ে মাছবান্ধা নালা।

বাঃ! সুন্দর নাম তো।

ওদিকে গাড়োড়িয়া নামের একটা ফরেস্ট বাংলো আছে। গেলে, দেখতে পাবেন। তার কম্পাউন্ডে একটি চওড়া-পাতার নলি-বাঁশের ঝাড় আছে। হলদে-সবুজ পাতা। আমাদের নলিবাঁশের চেয়ে অনেকই চওড়া—গাছটি ফিলিপিন্স এর গাছ। একজন উৎসাহী, অল্পবয়সী ডাইরেক্ট রিক্রুট অ্যাডিশনাল ডি এফ ও এনে লাগিয়েছিলেন। ভারি সুন্দর দেখতে সেই বাঁশঝাড়টি। অনেক চেষ্টা করেও সেই ফরেস্ট অফিসারের নাম জানতে পারিনি।

জানলে কী করতে?

একটা ভালবাসার চিঠি লিখতাম। অমন মানুষকেই তো লেখা উচিত ভালবাসার চিঠি।

বাঃ। অনিশ বলল, দেখি আবার কবে আসা হয়। আবার ইচ্ছে তো করবেই। অবশ্য ইচ্ছে করবে শুধুমাত্র ফিলিপিন্স এর বাঁশঝাড়ই দেখতে নয় সঙ্গে আরও অনেক ইচ্ছেই থাকবে।

ইচ্ছে করলেই আসবেন। একজনের ইচ্ছের উপরে তো অন্যের কোনো জোর চলে না। ইচ্ছের জোর যদি কারো উপরে চলে, তবে সে ইচ্ছে আর ইচ্ছে থাকে না। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সেই কবিতা ছিল না।

কোন কবিতা?

"সকাল থেকে আমার ইচ্ছে,
এক ধরনের সাহস দিচ্ছে,
উড়ে না যাই।"

তোমরা একবার কলকাতাতে আসতে পারো। রেবামামীমাকে নিয়ে।

সে আপনি যখন আমাদের বাড়ি যাবেন, মায়ের সঙ্গে কথা বলে নেবেন। মায়ের ভাল লাগে না কলকাতা। আমারও কলকাতা ভাল লাগে না। একবার কলকাতাতে, আমার মামাবাড়িতে সাতদিন গিয়ে ছিলাম। মনে হয়েছিল, দমবন্ধ হয়ে মরে যাব। সেও অনেকবছর আগে। এখন তো শুনি, পল্যুশান নাকি আরও বেড়ে গেছে।

কলকাতায় এখন মানুষ শুধু টাকা রোজগার করার জন্যেই থাকে। তারা ভুলে গেছে হয়ত যে টাকার বান্ডিলই স্বর্গে ঢোকার একমাত্র ছাড়পত্র নয়।

ঠিক আছে। বলে, অনিশ উঠে দাঁড়াল। পামরি তো দাঁড়িয়েই ছিল।

আপনার নামতে হবে না। আপনি দোতলার বারান্দাতে দাঁড়িয়েই সী-অফফ করুন।

বেশ। তুমি যেমন আজ্ঞা করবে।

ঈশ্বর করুন কারোকে যেন এ জীবনে কখনওই আজ্ঞা না করি। যাঁরা আজ্ঞা করেন, তাঁদের অনেককেই আমার জানা আছে বলেই একথা বলছি।

অর্ধেক সিঁড়ি নেমে পামরি বলল, আপনি এখানে একটা চাকরী নিয়ে আসতে পারেন না অনিদা? এখানের জীবন কিন্তু অনেক শান্তির।

দেখি, চেষ্টা করব। অতিকেও বলব। আমারও কলকাতাতে থাকতে ভালো লাগে না।

পামরি চলে গেলে, সিঁড়ির মুখ থেকে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল অনিশ।

কদমগাছের কাণ্ডে সাইকেলটাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল পামরি। সাইকেলের হ্যান্ডেলের সঙ্গেই একটা বাঁশের তৈরি টোকা ঝুলছে। পেছনের কেরিয়ারে ও হ্যান্ডল থেকে ঝুলি-ঝোলা ঝোলানো আছে। চোরেরা কি এখনও নীগাহিঁকে আবিষ্কার করেনি? কে জানে। পামরি সাইকেলটা দু'হাতে টেনে নেবার আগে টোকটা পরল মাথাতে তারপর অনিশের দিকে হাত তুলে বলল, চললাম অনিদা। খুব ভাল লাগল। মাকে গিয়ে বলব।

এসো। পারলে আবার এসো। আমিও যাব। দেখি, কবে যেতে পারি।

বেশ।

তারপর ধীরে ধীরে সাইকেল চালিয়ে পামরি মোড় পর্যন্ত গিয়ে বাঁদিকে বাঁক নিল। বাঁক নিতেই বেশ এক সারি কৃষ্ণচূড়ার সতেজ সবুজ ফিনফিনে পাতাদের ভিড়ে হারিয়ে গেল ওর ছিপছিপে ফিগার। বেশ লম্বা হয়েছে পামরি। আর ভারি ব্যক্তিত্বময়ী। ভারি ভাল লাগছিল অনিশের যে পথে ও চলে গেল সে, পথের দিকে চেয়ে।

এখন এগারোটা বাজে। গরম আছে তবে তেমন নয়। হাওয়া রয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা এখানে দূরের বাড়ির মানুষের গলা, পথের শিশুর কণ্ঠস্বর, শালিকের কিচমিচ, ক্বচিৎ ঘুঘুর ডাক এসব এখনও স্পষ্ট শোনা যায়। শোনা যায়। সাইকেলের ক্রিং ক্রি। অনিশদের অফিসে উত্তর চল্লিশ অনেকেই কানে বেশ কম শুনছেন, কারো কারো কানে খুব ব্যথা হচ্ছে, কেউ কেউ কানে যন্ত্রও লাগিয়েছেন, কানের ডাক্তারেরা বলেছেন এসবই নাকি নয়েজ-পল্যুশানের জন্যে।

নীগাহিঁতে কানের বড় আরাম হলো এ কদিন।

রূপার গলার স্বর কানে যখন ঝুমঝুমির মতো বাজছিল তখন পামরি এলো মৌটুসীর স্বর নিয়ে রূপার গলার স্বর আর পামরির গলার স্বর যেন আলাদা আলাদা WATER TABLE! WATER TABLE তাদের মন। অনিশের মনও এক WATER TABLE। জল না সরালে BLACK DIAMOND-এর কাছে পৌঁছনো যাবে না। কত হাজার কোটি বছর ধরে DRIFFT বা IN SETU পদ্ধতিতে কয়লা খাদানে স্তরের পর স্তরে কয়লা জমেছে—কত প্রস্তরীভূত গাছ-গাছালি স্থলজ ও জলজ উদ্ভিদ। ডায়নোসরদের যুগে গাছপালার আকারও তো অতিকায়ই ছিল। কোটি কোটি কোটি টন গাছ-পাতা-উদ্ভিদ-অ্যালগী-ফাঙ্গি সব প্রকৃতির মূক সাক্ষী। কোটি কোটি বছর ধরে নিঃশব্দে জমে রয়েছে এই জয়ন্ত, সিঙ্গরাউলি, গর্বী, আমলোরি, কাকড়ি, ঝিঙ্গুরদা ইত্যাদি খাদানে। বীণা সাগরের মতো কত বীণা সাগরে তাদের বুকের WATER TABLE-এর জলরাশিকে যন্ত্রর সাহায্যে পাম্প করে নিয়ে এসে ফেলছে একবিংশ শতাব্দীর মানুষ বিজ্ঞানের নানা প্রযুক্তির সাহায্যে। কিন্তু রূপা বা পামরি বা অতি বা অনিশের বুকের মধ্যের WATER TABLE-এ যে জলরাশি জমে রয়েছে, তার নাগাল ওরা কেউই পাবে না একে অন্যে। মানুষের বুকের মতো খাদান সম্ভবত প্রকৃতি আর সৃষ্টি করেননি। যদিও এই মহাবিশ্ব মহাকালের প্রেক্ষিতে তার অস্তিত্বটা অত্যন্তই ক্ষণস্থায়ী। হলে কী হয়, বৈচিত্র তো তার কম নয়।

এমন সময়ে ফোনটা বাজল।

হ্যালো।

অতি বলছিরে। ভাল করে খেয়েছিস তো। আমার যে শাশুড়ির ভূমিকাতে অবতীর্ণ হতে হবে তোর জন্যে আগে কি কোনোদিনও ভেবেছিলাম। দেখালি বাবা।

দেখালি তো তুই। বেড়াতে নিয়ে এসে ইচ্ছে করে ঝেড়ে ফেলে খুন করবার মতলবে ছিলি। আর এখন উল্টো চাপ দিচ্ছিস। কেন রে? আমি তোর কোন বাড়া-ভাতে ছাই দিতে গেছিলাম!

হাসল অতি।

বলল, দিসনি এখনও কিন্তু দিবি যে নাইই তার গ্যারান্টিই বা কোথায়?

ফাজিল।

বলেই, হেসে ফেলল অনিশ।

কোত্থেকে ফোন করছিস?

ড্র্যাগ লাইনের টঙে বসে। মোবাইল এ করছি। কেন জানিস?

তার আগে শোন, নাম্বার ওয়ান নিউজ বুলেটিন : রূপা ফোন করেছিল সকালে, প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট কথা বললাম। ভারি বুদ্ধিমতী মেয়ে।

তার মানে...

দাঁড়া এখনও সব বলা হয়নি। নাম্বার টু নিউজ বুলেটিন : পামরি এসেছিল সাইকেল চালিয়ে।

হেলিকপ্টারে আসবে ভেবেছিলি না কি?

তা নয়, পুষ্পক রথেও তো আসতে পারতো।

বাকি কথা বাড়ি গিয়ে হবে। দই-মাংস করতে বলে এসেছি। ছুটকু খুব ভাল করে। জমিয়ে খাব। যে কারণে ফোনটা করা তোকে, একটু আগে মনে মনে একটা কবিতা লিখে ফেলেছি।

কবিতা? তুই? হায় হায় একী দুর্যোগ শুরু হলো। যাকগে! শোনা! খুব বড় নয়তো?

নারে না।

শোন বলি,

'ভালবাসা কাকে বলে জানি না,
কোনোদিন জানতেও চাইনি,
এই মুখ, এই বুক দুটিকে,
কাছে পেলে আর কিছু চাইনি।'

অনিশকে চুপ করে থাকতে দেখে বলল, কীরে! কথা বলছিস না যে। কেমন হলো বল?

দারুণ। তবে আমিও লিখেছি একটা। আমারটাও শোন :

তুই কবে থেকে কবিতা লিখছিস?

আজ থেকে, শোন :

"হলদে সবুজ ওরাং ওটাং
ইট পাটকেল চিৎ পটাং
গন্ধ গোকুল হিজিবিজি
নো অ্যাডমিশান ভেরি বিজি
নন্দী ভৃঙ্গী সারেগামা
নেই মামা তাই কানা মামা
চিনে বাদাম সর্দি কাশি
ব্লটিং পেপার বাঘের মাসি
মুশকিল আসান উড়ে মালি
ধর্মতলা কর্মখালি।"

ওরে টুকলিবাজ! সুকুমার রায়ের ভূত যদি তোর ঘাড়ে চাপেন, এই অসুস্থ শরীরে, পারবি সামাল দিতে?

অতি বলল।

এবারে শোন, একেবারে নিজস্ব। বলেই, অনিশ বলল :

"বারেবার চেয়োনাকো কারো পানে,
প্রতিটি চাহনি জেনো, অজানিতে আসক্তি আনে।"

তারপরই রিসিভারটা নামিয়ে রাখল ক্র্যাডলে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

চাকরিটা যে এমন ভাবে হয়ে যাবে তা কল্পনারও বাইরে ছিল। নর্দার্ন কোলফিল্ডস-এর হেড কোয়ার্টার্স সিঙ্গরাউলিতে অতির কাছে বেড়াতে না গেলে ফিন্যান্স ডিরেক্টর এ. কে. দাস, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের সঙ্গে যোগাযোগও হত না। এখন ম্যানেজিং ডিরেক্টরও বাঙালি—এস কে সেনগুপ্ত। নানা যোগাযোগে এবং অতিরই সুপারিশে অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের একটি সিনিয়র পোস্টে এই পাবলিক আন্ডারটেকিং-এ আমার চাকরিটা হয়ে গেল। কলকাতাতে যা মাইনে পেতাম তার দ্বিগুণেরও বেশি মাইনে, প্লাস নানা পার্কস। আমার এই চাকরি হওয়ার ব্যাপারে ওদের ইউনিয়নের এক পাণ্ডা কবি বিশ্বজিৎ বাগচীরও অবদান ছিল। বিশ্বজিৎদা একটি পত্রিকাও সম্পাদনা করেন। তার নাম দুর্বাসা।

জয়েন করতে হবে আগামি মাসের গোড়াতে সিঙ্গরাউলিতে গিয়ে।

কলকাতাতে আমার কোনো পিছুটান নেই। ভবানীপুরের বিরাট কিন্তু জরাজীর্ণ পৈত্রিক বাড়ি—যাতে আমি থাকি এবং আমার দেখাশোনা করার ছেলেটি, নাম সনাতন, পাথরপ্রতিমাতে বাড়ি, আরও বাসিন্দা আছে। দুটি নেড়ি, একটা মদ্দা আরেকটা মাদী, আর গোটা চারেক বেড়াল। একটা সাদা হুলো আর তিনটে সাদা-কালো বেড়ালনি।

বাড়ির অবস্থাও অতি শোচনীয়। দাদুর বানানো বাড়ি। ফাটাফুটো হয়ে অশ্বত্থর চারা গজিয়ে গেছে। সিঙ্গরাউলি থেকে ফিরে এসে ব্যাঙ্কের সঙ্গে কথা বলতে হবে। লোন টোন নিয়ে বাড়িটিকে মেরামত করে গোটা

চারেক টু বেডরুম এবং সিটিং-কাম ডাইনিং রুম-এর ফ্ল্যাট বানাতে পারলে ভালো ভাড়া পাওয়া যাবে। টলির নালার দিকে খুবই নিরিবিলি পাড়া, বেশি পল্যুশান নেই। এ পাড়াতে বেশি ভাড়া দিয়ে থাকা পাঞ্জাবি ও গুজরাটি ভাড়াটের অভাব নেই। তবে নতুন চাকরিতে বেশ কিছুদিন কাজ করে ফিরে এসে ব্যাঙ্ক, কনট্রাক্টর ইত্যাদিদের নিয়ে বসতে হবে।

চানুদা বলল, শান্তিনিকেতনে যাবি না কি বৃক্ষরোপণ উৎসবে? বাইশে শ্রাবণ থেকে উৎসবের শুরু। চার-পাঁচদিন চলবে। গেছিস কখনও আগে?

শান্তিনিকেতনে গেছি একবার পৌষমেলাতে। অকথ্য ভিড়। কিন্তু বৃক্ষারোপণে যাইনি কখনও।

হলকর্ষণ উৎসবও হয়। সবকিছুই হয় with a style দেখবার মতো সে সব উৎসব।

থাকব কোথায়?

কেন? আমার শ্বশুরবাড়ি।

চানুদার বড়ো শালা নতুন বাড়ি বানিয়েছেন সোনাঝুরিতে। বছর দেড়েক হল। তার পর থেকে চানুদা এমন করে, যেন নিজেই বাড়ি বানিয়েছে। সবাইকে না দেখালেই যেন নয়। বড়ো শালা এম বি এ। আহমেদাবাদ থেকে পাশ করা। ছয় ডিজিটে মাইনে পায়। শালার স্ত্রীর গত বছরের জন্মদিনে বড়ো শালা হারীত একটি নতুন ফোর্ড গাড়ির চাবি দিয়েছে। শ্বশুরবাড়ির অবস্থা আগে ভালো ছিল না। এখন তিনভাই-এরই খুব রমরমা। গরিব থেকে বড়োলোক হবার পরে যে সব বাহ্যিক লক্ষণ প্রকাশ পায় তা পুরোমাত্রায় প্রকাশ পেয়েছে। এবং শ্বশুরবাড়ির প্রতিফলিত গৌরবে মার্কেনটাইল ফার্মের মাঝারি অফিসার সবসময়ই ফুলে থাকে। আমার খুব মজা লাগে চানুদাকে দেখে।

বললাম, চারদিনের জন্যে যেত অবশ্যই পারি কিন্তু পরের বুধবারে আমাকে রওয়ানা হতেই হবে। নতুন চাকরিতে জয়েন করব।

না এলে, খুবই মিস করতাম এই বৃক্ষরোপণের উৎসব। "তিনপাহাড়"-এ বেলা সাড়ে তিনটেতে উৎসব। বড়ো, সুদৃশ্য চাঁদোয়া খাটানো হয়েছে, কলকাতা থেকে একজন বৃক্ষপ্রেমী সাহিত্যিককে আমন্ত্রণ করে আনা হয়েছে বৃক্ষরোপণের জন্য।

বেলা তিনটে নাগাদ ঘন কালো মেঘ করে এল আকাশে এবং সোয়া তিনটে নাগাদ মুষলধারে বৃষ্টি নামল। কিন্তু হলে কী হয়। কত নারী-পুরুষ এবং শিশুরা যে ছাতা মাথায় 'তিন পাহাড়ে' এসে সেই উৎসব প্রত্যক্ষ করার জন্যে উপস্থিত হল তা আর বলার নয়। প্রথমে ছোটো ছোটো মেয়েরা এবং সামান্য কিছু ছেলে শাড়ি ও ধুতি পরে নাচতে নাচতে শোভাযাত্রা করে ঢুকলো। তাদের পেছন পেছন তাদের চেয়ে একটু বড়ো আরেক দল, তাদের পেছনে আরও একটু বড়ো আরেক দল এবং অবশেষে যুবতীরা, মাঠে নাচতে নাচতে। তাদের সঙ্গে সঙ্গে চাঁদোয়ার নিচে দাঁড়িয়ে থাকা সংগীত ভবনের বড়ো মেয়েরা

"মরু বিজয়ের কেতন ওড়াও, উড়াও শূন্যে হে প্রবল প্রাণ।
ধুলিরে ধন্য করো করুণার পুণ্যে হে কোমল প্রাণ॥" গেয়ে উঠল।

যেখানে পাহাড়ের নাম গন্ধ নেই সেই জায়গার নাম তিনপাহাড় কেন হল তা বুঝলাম না। চানুদা একজন স্থানীয় অধ্যাপককে জিজ্ঞেস করে জানল যে রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলাতে এখানে তিনটি কৃত্রিম ছোটো ছোটো পাহাড় ছিল, হয়তো দেবেন্দ্রনাথই শিশুপুত্রর জন্যে বানিয়ে দিয়েছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ এখানে খেলা করতেন। তাই এখনও জায়গার নাম তিনপাহাড়। আমার মনে পড়ল যখন হাজারিবাগে যেতাম

তখন ঝাড়খণ্ডে একটি অখ্যাত ছোট্ট রেল স্টেশন ছিল জানতাম, যার নাম তিনপাহাড়।

তারপরে নাচের সঙ্গে শোভাযাত্রা চলতে চলতেই আবার গান ধরল বড়ো ছাত্রীরা। "আহ্বান আসিল মহোৎসবে পঞ্চভূতের আবাসন।"

এই গানটি আগে কখনও শুনিনি। আমি ছেলেবেলাতে আমার মায়েরই উৎসাহে রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্কুলে কিছুদিন গান শিখেছিলাম। যদিও ডিপ্লোমা পাওয়া অবধি ধৈর্য ছিল না। তবে তিনবছর ওই আবহে থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতি যে এক বিশেষ ভালোবাসা জন্মেছিল তাই-ই নয়, অনেক রবীন্দ্রগানের সঙ্গে পরিচিতও হয়েছিলাম, গাইতে পারি আর নাই পারি।

তারপরে মন্ত্রপাঠ হল। তারপরে বৃক্ষেরই মতো বিপুল এবং গাব্দাগোব্দা সাহিত্যিক বৃক্ষরোপণ করলেন। অত্যন্ত সপ্রতিভ এবং ছোটখাটো চেহারার পণ্ডিত এবং মেধাবী উপাচার্য রজতকান্ত রায়, তাঁর তরুণী এবং সুন্দরী, সুরুচিসম্পন্ন স্ত্রীও হাত মেলালেন। একটি সাদা পলাশ, যার অন্য নাম রুদ্রপলাশ পোঁতা হল। গাছকে মাটি ও জল দেওয়া হল, পাখার হাওয়া করা হল তাকে, যাতে সে সুবর্ধিত হতে পারে।

পুরো অনুষ্ঠানের মধ্যে এমনই এক সুরুচি এবং সুচিন্তিত মনন ছিল যে মুগ্ধ না হয়ে পারা গেল না।

তারপরে গান হলো "আয় আমাদের অঙ্গনে"।

"আয় আমাদের অঙ্গনে অতিথি বালক তরুদল—
মানবের স্নেহসঙ্গ নে, চল আমাদের ঘরে চল॥" ... ইত্যাদি।

তার পরে কবিতাপাঠ হল; মাঙ্গলিক। তার পরে শেষ গান।

"কোন পুরাতন প্রাণের টানে
ছুটেছে মন মাটির পানে॥
চোখ ডুবে যায় নবীন ঘাসে। ভাবনা ভাসে পুব বাতাসে।
মল্লারগান প্লাবন জাগায় মনের মতো শ্রাবণ গানে"।

তারপরে অনুষ্ঠান শেষ।

গান আর গাছের প্রতি আমার আশৈশব দুর্বলতা হাজারিবাগে মামা বাড়ির প্রতিবেশী জিতেন মামার দৌলতে। তাই আমি জানি যে, সাদা

পলাশের অন্য নাম রুদ্রপলাশ। আমার এক বন্ধুর মুখে শুনেছিলাম যে শিবনারায়ণ রায়, যিনি কিছুদিন আগে পরপারে পাড়ি দিয়েছেন, তাঁর বাড়ির নামও ছিল রুদ্রপলাশ। এবং বর্তমান উপাচার্য রজতকান্ত রায় সম্বন্ধেও আমার অনেক কথাই জানা ছিল আমার মামাতো বোন পারমিতার মাধ্যমে। পারমিতা প্রেসিডেন্সিতে রজতবাবুর ছাত্রী ছিল। যদিও ওর অনার্স ছিল ইংরেজিতে ইতিহাসের পাস ক্লাসে তো যেতই। ওর কাছে শুনেছিলাম যে রজতবাবু অত্যন্ত মেধাবী এবং অ্যাবসেন্ট-মাইন্ডেড প্রফেসার ছিলেন। তরুণ অধ্যাপক যখন বাসে করে কলেজে আসতেন তখন বই পড়তে পড়তে আসতেন এবং অনেকেই সময় প্রেসিডেন্সির স্টপেজ ছাড়িয়ে আরও সামনে চলে যেতেন। ছাত্রছাত্রীরা বলত, স্যার। কলেজ এসে গেছে। নেমে পড়ুন।

রজতবাবুকে সকলে এবং বিশেষ করে ছাত্রীরা অত্যন্তই পছন্দ করতেন। তাঁর মেধাই ছিল তাঁর প্রতি আকর্ষণের কারণ। তবে গায়ের রং কালো হলেও চেহারার মধ্যে, বাচনভঙ্গির মধ্যে এমন কিছু ছিল যে তা প্রায় অপ্রতিরোধ্য।

পারমিতার কাছে এও শুনেছি যে উনি বিখ্যাত অশীন দাশগুপ্তর ছাত্র ছিলেন, যাঁর স্ত্রী পরমাসুন্দরী উমা দাশগুপ্তও নিজ পরিচয়েই পরিচিত। উমা নিজেও কম গুণী ছিলেন না। রজতবাবুর সেন্স অফ হিউমার ছিল সুবিদিত। তাঁদের দেশ ছিল অধুনা বাংলাদেশের ঢাকার মানিকগঞ্জ সাবডিভিশনে। তাঁকে এক ছাত্রী জিজ্ঞেস করেছিল, 'স্যর, আপনারা কি বদ্যি?'

উত্তরে উনি বলেছিলেন 'হ্যাঁ। তবে ভেষজ নই।'

রজতবাবু কলকাতা থেকে আসা সেই বৃক্ষর মতো সাহিত্যিকের উপস্থিতিতেই বৃক্ষরোপণের সময়ে হাঁটু গেড়ে বসে সমানে সংস্কৃত স্তোত্র আবৃত্তি করে যাচ্ছিলেন। ওঁরা যখন চন্দ্রাতপের নিচে বসেছিলেন তখন গুন গুন করে রবীন্দ্রসঙ্গীতও গাইছিলেন। আমরা কাছেই ছাতা-মাথে দাঁড়িয়েছিলাম, তাই শুনতে পেলাম, যে কলকাতার সাহিত্যিক রজতবাবুকে শুধোলেন, আপনি কি গান করেন?

খুবই নিচু গলাতে কথা বলেন উনি। জবাবে বললেন 'আমি স্নানাগারের গায়ক'। সেই গাব্দাগোব্দা বৃক্ষের মতো কলকাতা থেকে আসা সাহিত্যিক, অনুষ্ঠানের শেষে আমার আর চানুমামার হিয়ারিং-ডিসট্যান্সের মধ্যে থাকা উপাচার্যকে আবারও জিগগেস করলেন, আপনি এত ভাল সংস্কৃত জানলেন কী করে?

রজতবাবু বললেন, আমার গুরু ছিলেন অশীন দাশগুপ্ত। তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছু বিদ্যাই লাভ করেছি। তবে তাঁর যা দেওয়ার ছিল সব নিতে পারিনি।

আমি চানুদাকে ফিসফিস করে বললাম, চানুদা! ভদ্রলোক বিশ্বভারতীয় উপাচার্য হওয়ার মতো মানুষই বটেন। এখানে এসে শুধু বৃক্ষরোপণ উৎসবই দেখা হল না একজন ব্যতিক্রমী মানুষকেও দেখা হল।

চানুদা বলল, ঠিকই বলেছিস।

এমন সময়ে কলকাতার সাহিত্যিক জিগগেস করলেন, আপনি আমার কোনো বই পড়েছেন?

রজতবাবু চুপ করে রইলেন।

ওঁর সুন্দরী তরুণী স্ত্রী বললেন, উনি রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং শরদিন্দুর পর আর কিছুই পড়েননি।

কলকাতার বোকা-দেখতে মোটা সাহিত্যিক হঠাৎ বুদ্ধিমান হয়ে গিয়ে হেসে উপাচার্য রজতবাবুকে বললেন, উ্য হ্যাভেনট মিসড মাচ।

নিজেকে বে-ইজ্জতির হাত থেকে বাঁচানোর এমন ঐশ্বরিক ক্ষমতা দেখে আমি আশ্চর্য হলাম। চানুদাও। নির্গুণেরও বুঝলাম, কিছু গুণ থাকেই।

বুঝলাম, রজতবাবুর মতো যাঁরা নিজের বিষয়ে পাণ্ডিত্যের শীর্ষে পৌঁছন তাঁরা অন্য বিষয়ে মাথা গলাবেনই বা কী করে? তাঁদের সময় কোথায় সময় নষ্ট করবার?

আবার বহুদিন পরে নামলাম এক সকালে গিয়ে রেনুকোট স্টেশনে। এই ট্রেনের নাম শক্তিপুঞ্জ এক্সপ্রেস। হাওড়া থেকে দুপুরে ছেড়ে পরদিন সকালে দশটা নাগাদ রেনুকোট পৌঁছয়। এই ট্রেন কয়েক বছর হল হয়েছে। গোমো, গুমিয়া, বারকাকানা, রিচুঘুটা, চেটর, হেহেগাড়া, ম্যাকলাস্কিগঞ্জ ('একটু উষ্ণতার জন্য'র পটভূমি), মহুয়ামিলন, টোরী, লাতেহার, চিপাদোহর, ডালটনগঞ্জ তারপর চৌপান হয়ে আরও দূরে যায়। পূর্ব ভারতের নানা কয়লা খাদান থেকে এই পথেই উত্তর ভারতে কয়লা যায়। যাত্রীবাহী ট্রেন কমই আছে। অধিকাংশই মালবাহী এবং কয়লাবাহী ট্রেন। বর্ধমান, আসানসোল, রানিগঞ্জ, ধানবাদ, কাতরাস, বোকারো ইত্যাদি জায়গার কয়লাখনি থেকে কয়লা বোঝাই করে যায় ওইসব মালগাড়ি। একমাত্র শক্তিপুঞ্জ এক্সপ্রেসেই একটি টু-টিয়ার এসি কোচ আছে, কিন্তু খাওয়া দাওয়ার কোনো বন্দোবস্ত নেই। রাতের বেলা একজন বেসরকারি মানুষ নিয়মিত রাতের খাবার নিয়ে ট্রেনে ওঠেন এবং যাঁরা খেতে চান তাঁদের খাওয়ার সরবরাহ করেন। গুমিয়া, বোকারো, ম্যাকলাস্কিগঞ্জ, ডালটনগঞ্জ এবং রেনুকোট-এর যাত্রীই বেশি থাকেন।

স্টেশনে পৌঁছেই দেখলাম, বন্ধু অতি, দাঁড়িয়ে আছে প্ল্যাটফর্ম-এ। স্টেশনের ডানদিকে হিন্দুস্থান অ্যালুমিনিয়াম-এর কারখানা ও রিহান্ড ড্যামের জলাধার, রেনুসাগর। হিন্দুস্থান অ্যালুমিনিয়াম আদিত্য বিড়লা গ্রুপের কারখানা। যার মালিক আদিত্য বিড়লার তরুণ এবং মেধাবী পুত্র কুমারমঙ্গলম বিড়লা, চার্টার্ড এবং ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট।

কুমারমঙ্গলম, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি ফার্ম আর এস লোধা অ্যান্ড কোম্পানির রাজেন লোধার তত্ত্বাবধানে পড়াশুনো শেষ করে বিদেশেও যান। বিড়লা পরিবারের একজনের লেখা একটি বই থেকেই আমি এসব জানতে পারি। সাম্প্রতিক অতীতে অবশ্য এম পি বিড়লার স্ত্রী প্রিয়ম্বদা বিড়লা মারা যাওয়ার পরে রাজেনকেই এম পি বিড়লার সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী করে যান এবং তা নিয়ে বিড়লা পরিবারের অন্যান্য গোষ্ঠীর সঙ্গে রাজেনের বিরোধ বাধে। মামলা সুপ্রিম কোর্ট অবধি যায় কিন্তু তাতে রাজেন লোধাই জয়ী হন। কলকাতার সাউথ পয়েন্ট স্কুল এবং আরও অন্যান্য নামী স্কুল, বেলেভ্যু নার্সিংহোম, প্রিয়ম্বদা বিড়লা চোখের হাসপাতাল এসবই এখন রাজেন লোধার কর্তৃত্বাধীন। দুঃখের বিষয় এই যে রাজেনও কিছুদিন আগে দিল্লীতে হঠাৎই হার্ট অ্যাটাকে চলে যান। তাঁর ছেলে হর্ষ এবং পুত্রবধূ অনামিকাই এখন এত বিপুল সাম্রাজ্যর দেখাশোনা করেন।

স্টেশনের বাঁদিকে কোল ইন্ডিয়ার সাবসিডিয়ারি নর্দার্ন কোলফিল্ডস-এর সাম্রাজ্য।

রেনুকোট স্টেশনের একটাই দোষ। প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরোতে অনেকগুলো সিঁড়ি উঠতে হয়। রেললাইনটি একটি গিরিখাদের মধ্যে দিয়ে গেছে। একবার 'কোয়েলের কাছে' এবং 'কোজাগর' পড়ে উৎসাহিত হয়ে কলকাতার অফিসের কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে বেতলা ন্যাশনাল পার্ক দেখব বলে চিপাদোহরে নেমেছিলাম। চিপাদোহর স্টেশন থেকেও উঁচু সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়।

নর্দার্ন কোলফিল্ডস-এর হেডকোয়ার্টার্স সিঙ্গরাউলিতে। ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং অন্যান্য অনেক ডিরেকটররাই এখানেই থাকেন। বিরাট বিরাট তাঁদের বাংলো তবে যেহেতু পুরো অঞ্চলের নীচেই কয়লা খাদান, যে কোনোদিন বাংলোগুলি ধ্বসে যেতে পারে। অনেকগুলি দারুণ এসি গেস্ট হাউস আছে মান্যগণ্য অতিথিদের জন্যে। একাধিক সি জি এম অর্থাৎ চিফ জেনারেল ম্যানেজারদের হেডকোয়ার্টার্সও এখানে। তবে সিঙ্গরাউলি দেখে খাদান এলাকা সম্বন্ধে কোনো ধারণাই করা সম্ভব নয়।

গতবারে যখন বেড়াতে এসেছিলাম অতির কাছে, তখন ওসব খাদানে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। নর্দার্ন কোলফিল্ডস-এর এ বছরের নেট প্রফিট হয়েছিল হাজার কোটি মতন। পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং-এর নামেই যাঁদের ভুরু কুঁচকে যায় তাঁদের একবার এইসব খাদানে ঘুরে যাওয়া উচিত। সরকারি তত্ত্বাবধানে যে কী বিপুল ক্রিয়াকাণ্ড হচ্ছে সে সম্বন্ধে একটি স্বচ্ছ ধারণা তাঁরা করতে পারবেন।

কয়েকশো বিঘা জমি নিয়ে কারখানা করতে দিতে এতো বাধা যে রাজ্যে, এত হানাহানি, খুনোখুনি, সে রাজ্যের নেতা-নেত্রীদের জানা উচিত, দেখা উচিত কী বিপুল ক্রিয়াকাণ্ড এখানে হচ্ছে। আমার মনে হয় পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ দল-নেতারা কূপমণ্ডুক। অথবা চোখে ঠুলি-পরা। আমরা ভালো জিনিস করব না। ভালো কথা বলব না এবং ভালো জিনিস দেখবও না এইরকমই পণ করেছেন। এতে ক্ষতি হচ্ছে রাজ্যবাসীরই। নিজেদের ইগো, নিজেদের ক্ষুদ্রমন্যতা, নিজেদের ক্ষমতার এবং অর্থের লোভ এবং নিজেদের অহং নিয়ে তাঁরা রাজ্যবাসীদের সর্বনাশ করছেন।

আমি যদি লিখতে পারতাম, যদি চলচ্চিত্রকার হতাম তবে নর্দার্ন কোলফিল্ডস নিয়ে লিখতাম এবং ছবিও করতাম। দুঃখের বিষয়, ঈশ্বর সবাইকে সব গুণ দিয়ে এখানে পাঠান না। তাই মনের মধ্যে নানা চিন্তার উদ্রেক হয়, নানা কথা বলার জন্যে মন আকুলি বিকুলি করে কিন্তু তা প্রকাশ করার ক্ষমতা তো আমার নেই। সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি! তেমনই সকলেই লেখক নন, কেউ কেউ লেখক। যাঁরা লেখক বা সাহিত্যিকও, তাঁদেরও পয়েন্টলেস সাহিত্য না করাই ভালো। যে-সাহিত্য পাঠককে দিগদর্শন করায় না, তাদের জানার পরিধি বাড়ায় না, তাদের মনে গঠনমূলক চিন্তার উন্মেষ ঘটায় না, সে সাহিত্য সমাজ, সংসার এবং দেশের বিন্দুমাত্র উপকার সাধন করে না—সে সাহিত্য সৃষ্টি করা আর না করা সমানই।

আমার বন্ধু এবং লোকাল গার্জেন অতির বাবার নাম ছিল সামান্য রায়। সামান্য রায়ের ছেলের নাম অতি রায়। অতি, খাদানের ড্র্যাগ লাইন

অপারেটর—প্রফেশনে সে মেকানিকাল এঞ্জিনিয়ার। ড্র্যাগ লাইন অপারেটর বলেই অতিকে ওর বন্ধুরা 'অতিকায়' রায় বলে ডাকে। গতবার এসে একবার স্পেশ্যাল পারমিশন করিয়ে আমাকে দিয়ে বন্ড সই করিয়ে অতি আমাকে ড্রাগ লাইন ড্রাইভারের ড্রাইভিং সিট-এ অথবা ককপিটে চড়াবার অনুমতি পেয়েছিল। দুর্ঘটনা রোজ ঘটে না কিন্তু কবে কখন যে ঘটবে তা আগে থাকতে কেই বা বলতে পারে। এখানে বাইরের কারোই, এমনকী পুলিশেরও মাতব্বরি করার সুযোগ নেই। যে সংস্থা দেশকে প্রতি বছর হাজার কোটি টাকার বেশি রোজগার করে দেয় তাকে সবাই সমীহর চোখে দেখে।

যে গাড়ি নিয়ে অতি আমাকে নিতে এসেছিল সে গাড়ি সিঙ্গরাউলি ছেড়ে মিহি কয়লার মেঘের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। আমার কোয়ার্টার অ্যালট হয়েছে আমলোরিতে। আমলোরি নার্দার্ন কোলফিল্ডস-এর অনেকগুলি খাদানের মধ্যে একটা। আমার কর্মক্ষেত্রও আমলোরিতে। কোয়ার্টারও যেহেতু আমলোরিতেই আমাকে আগে নতুন কোয়ার্টার নিয়ে যাবে অতি, দেখাতে।

অতি যেহেতু ব্যাচেলার, ও লিখেছিল আমাকে, যে তুই তো আমার কোয়ার্টারেই থাকতে পারিস। আমার তো দু বেডরুম কোয়ার্টার। গতবারে তো তুই আমার এখানেই উঠেছিলি। অসুবিধা তো নেই, তোর খরচও কম হবে আলাদা এসটাব্লিশমেন্ট না করলে। জবাবে আমি ওকে লিখেছিলাম, আমি একা থেকেই অভ্যস্ত। তা ছাড়া, কোম্পানি যখন কোয়ার্টার দিচ্ছেই তখন আলাদাই থাকব। তোর খিতমদগার ছুটকুর রান্না ও ব্যবহার চমৎকার কিন্তু... তুই আশা করি আমার ওই ব্যক্তিস্বাধীনতার ব্যাপারটাকে ভুল বুঝবি না। পারলে, আমার জন্যেও ছুটকুরই মতো কারোকে জোগাড় করে দিস। যতদিন না পাওয়া যাচ্ছে নিজেই রান্না করে নেব। আমি তোর মতো ওয়েল অফ্‌ফ্‌ ফ্যামিলির ছেলে নই যে নিজে ফ্রিজ থেকে বোতল বের করে জল গড়িয়েও খেতে পারি না। সবকিছুই করা আমার অভ্যেস আছে। নিজে রান্না করেও খেতে পারব। তোকে নেমতন্ন করে খাওয়াতেও পারব। আর কাজের দিনের দুপুরে নিশ্চয়ই

অফিসে বা সাইটে ক্যান্টিন-ট্যান্টিন একটা থাকবেই, সেখানেই খেয়ে নিতে পারব।

অতি লিখেছিল, তুই যা ভালো বুঝিস। তবে তোর কাজ তো অফিসেই হবে। সাইটে গিয়ে স্টেপল ফুড-এর মতো কয়লা খেতে হবে না তোকে। আর বিভিন্ন অফিসের ক্যান্টিন যথেষ্ট ভালো। এই খাদানের পরিবেশও। তাই তোর সিদ্ধান্তটা ভালোই।

কোয়ার্টার দেখেই ভারি ভালো লেগে গেল আমার। নানা গাছের সারির মধ্যে দিয়ে পিচের পথ চলে গেছে। দুপাশে সব কোয়ার্টার এ বি সি ডি ই এফ এবং তারপরেও এক থেকে কুড়ি অবধি নাম্বার দেওয়া। সামনে একফালি লন, একটি গারাজ, তারপরে টু-বেডরুম লিভিং ডাইনিং রুম-এর কোয়ার্টার। একতলায় একটা। দোতলাতে আরেকটি। একতলাতে যেহেতু লন আছে দোতলাতে বারান্দা আছে বড়ো। লনের অভাব পুরোতে। কোম্পানি সাধারণত চেষ্টা করে ব্যাচেলরদের একই বাড়িতে অ্যাকোমোডেট করতে। না পারলে, অগত্যা ম্যারেডদের সঙ্গেই এক বাড়িতেই দিতে হয়। কোয়ার্টারটা যে বাংলোতে সেই বাংলোর দোতলাতে নরেশ বেদি নামের একজন হিমাচল প্রদেশের মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার থাকেন তাঁর শিক্ষিতা স্ত্রী দীপিকা এবং একমাত্র ছেলে প্রাণকে নিয়ে। অতির কাছে শুনল যে প্রাণ-এর বয়স দশ বারো—পড়াশুনোয় খুব ভালো এবং ক্রিকেট পাগল। চাইলে অনিশ ওর সঙ্গে ছুটির দিনে ক্রিকেট খেলতে পারে। প্রাণ-এর ক্রিকেট প্রীতির জন্যেই লন-এর সুবিধা পাবে বলেই ওঁরা একতলার ফ্ল্যাটটিতে চলে এসেছেন সেটা ফাঁকা হওয়ার পরেই। আমাকে দোতলাটা ছেড়ে দিয়েছেন।

দোতলাতে উঠে আমার চোখ জুড়িয়ে গেল চারধারের গাছগাছালির শোভা দেখে। একটু দূরে একটা পার্কও আছে। জগিং ট্যাক, বাচ্চাদের জন্যে স্লিপ এবং দোলনা। একটা ছোটো টডলার'স পুল—জলের নিচে নীল রং করা।

খুবই খুশি হলাম ফ্ল্যাট দেখে।

এখন মালপত্র রেখে চল ফ্ল্যাটে চাবি দিয়ে। আমার ওখানে যাবি ত? খিদে পায়নি? এই পোড়া ট্রেনে তো খাওয়া দাওয়া পাওয়া যায় না কিছুই।

অতি বলল।

তারপর বলল, কাল রবিবার, পরশু তোর জয়েনিং ডেট। আজ রাতটা আমার ফ্ল্যাটেই কাটিয়ে কাল সকাল থেকে দুজনে হাত লাগিয়ে তোর ফ্ল্যাটটা ঠিকঠাক করে, কো-অপ থেকে বাজার, মানে প্রভিশানস, কিনে ওয়েল-ইকুইপড্ করে দেওয়া যাবে। কাল রাত তোর নিজের ফ্ল্যাটেই কাটাস। পরশু সকালে ব্রেকফাস্ট করে অফিস যাস। আমিই নিয়ে যাব মোটর সাইকেলে। তারপর একটা সাইকেল কী মোটরসাইকেলের বন্দোবস্ত করতে হবে। অ্যামেরিকাতে যেমন মানুষের পা মানেই গাড়ি—যে বাড়িতে যতজন মানুষ ততগুলো গাড়ি—বিলাসের জন্যে নয়, —অ্যাজ অ ম্যাটার অফ নেসেসিটি—এখনেও পা মানে সাইকেল বা মোটরসাইকেল। অবশ্য গাড়ি যারা অ্যাফোর্ড করতে পারে তারা গাড়িই চড়ে।

বললাম, সাইকেল দিয়েই আরম্ভ করি। মোটর সাইকেলের শব্দটা ভীষণ ডিসটার্ব করে আমাকে। তাছাড়া, গতবারে তোর মোটর সাইকেল থেকে আমাকে ফেলে দিয়ে যা প্রাণসংশয় ঘটিয়েছিলি। সেই থেকে ভয় ঢুকে গেছে।

অ্যান অ্যাকসিডেন্ট ইজ অ্যান অ্যাকসিডেন্ট। একবার ঘটেছে বলে কি রোজই ঘটবে না কি! যত্ত আতুকিপনা তোর।

তারপর বলল, তবে তুই মনে হয় অফিস যাওয়া-আসার জন্যে ট্রান্সপোর্ট পাবি। মানে, গাড়ি, তুই তো উঁচু পোস্টে জয়েন করেছিস।

ছুটকু খুব খুশি হল আমাকে দেখে। বলল, আজ তো দোপহরমে হাটিয়া লাগেগি আমলোরিমে। চলিয়েগা না হাটিয়ামে?

অতি বলল, যাব রে বাবা, সকলেই যাব। তার আগে দুপুরে কী রেঁধেছিস বল?

মিহিরবাবু রেনুসাগরসে মছলি লেকর আয়ে থে। ঔরভি এক চিজ। কিসিকো বাতানে মানা কিয়া?

—কেয়া?

—আপলোগ যিসকা কাঠা কহতা হ্যায়।

অতি হেসে বলল, কাঠা নেহি কাউঠ্যা।

—সে তো বেআইনি। অনিশ বলল।

—মিহিরদার কাছে যা বেআইনি তাই আইনি।

—মিহিরদা কে?

—মিহিরদা মানে, আমাদের বিশ্বজিৎদার ভায়রাভাই রে। তোর সঙ্গে তো আলাপও হয়েছিল যখন এসেছিলি এখানে।

—তা মিহিরবাবু কাউঠ্যা পেলেন কোথায়?

—আরে মিহিরদা জিনিয়াস লোক। নিজে যত না খেতে ভালোবাসেন, অন্যদের খাইয়ে তার চেয়েও বেশি আনন্দ পান। অন্ধকার থাকতে উঠে কোথায় না কোথায় চলে যান কচুর লতি, কচুর শাক, হিঞ্চে শাক, পাবদা মাছ, কই মাছ, আড় মাছ, চিতল মাছ সব জোগাড় করে আনতে। সত্যি এইরকম এপিকিউরিয়ান মানুষ আজকাল বড়ো একটা দেখি না।

খেতে বসে অতি ছুটকুকে জিজ্ঞেস করল, কেউ ফোন করেছিল?

হ্যাঁ। একটা ফোন এসেছিল।

কে করেছিলেন?

পামরি দিদিমণি।

'সেই বার্তা ক্রমে ক্রমে রটি গেল গ্রামে
মৈত্র মহাশয় যাবেন সাগরসঙ্গমে।'

—মানে?

—দ্যাখ, তুই যে এখানে সবে এলি আর দ্যাখ, ইতিমধ্যেই ফোন এসে হাজির। পামরি জেনে গেছে।

অনিশ চুপ করে রইল। এখানে আসার কথা ওই যে পামরিকে জানিয়েছে সে কথা গোপন করে গেল।

তারপর অতি, সর্ষে দেওয়া রাঁধা আড় মাছ ভাতের সঙ্গে মাখতে মাখতে বলল, চাকরি অনেকেরই থাকে, পামরি তো সকলের থাকে না।

মনে মনে খুব খুশি হলেও মুখে বলল, ইয়ার্কি করিস না।

ইয়ার্কির কী আছে?

তারপর বলল, রেবামামিমার একটা স্ট্রোক হয়েছিল তুই চলে যাবার পরই। উনি অনুরোধ করা সত্ত্বেও তুই যে ওঁর সঙ্গে দেখা করিসনি তাতে উনি নাকি খুবই আহত হয়েছিলেন।

—তাই?

দুঃখিত গলায় বলল অনি।

আসলে, এত অল্পদিন ছিলাম। পিকনিকটাও হল না, হলে, পামরির সঙ্গেও কিছু কথা হতে পারত। পামরি যখন আমার অ্যাকসিডেন্টের পর দেখা করতে এসেছিল তখন তো পাঁচ মিনিট ছিল।

এবারে একটু গুছিয়ে নেবার পরে অবশ্যই যাস একদিন রেবামাসিদের বাড়ি।

তোরা খবরাখবর করিসনি?

—শুধু আমি কেন? এখানের সবাই খোঁজ করেছিলেন। ওঁদের, সুন্দর

সম্ভ্রান্ত ব্যবহার এবং আত্মসম্মান জ্ঞানের জন্যে সকলেই ভালোবাসে। সম্মানও করে।

—কী বললেন পামরিদিদি ছুটকু?

—কিছু বললেন না। জিগগেস করলেন, আপনি কোথায়?

—তুই কী বললি?

—বললাম, আপনি অনিশবাবুকে আনতে স্টেশনে গেছেন তারপর অনিশবাবুর নতুন ফ্ল্যাট হয়ে বাড়ি ফিরবেন।

—ওদের ল্যান্ডলাইন নেই। পামরি কদিন আগে একটা মোবাইল নিয়েছে। ওর নাম্বারটা আমার মোবাইলে স্টোর করা নেই। এবারে করব। তোর মোবাইলেও করে নিস।

—আমার মোবাইল নেই। কোম্পানি ল্যান্ডলাইন দেবে না?

তা দেবে। দিন তিনেকের মধ্যেই লাগিয়ে দেবে কোম্পানির লোক। এখানে তোদের কলকাতার ভি এস এন এল-এর মতো আঠারো মাসে বছর নয়। তাছাড়া, কোম্পানির কোনো কাজে একটুও গাফিলতি ঘটলে, কোনো নালিশ গেলে, এখানে ভি এস এন এল-এর বড়োসাহেব শুদ্ধ নড়েচড়ে বসবেন। দশ হাজার কোটি নেট প্রফিট শুধু কোম্পানির একার জন্যেই হয় না, প্রত্যেকেরই সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। প্রত্যেকেরই অবদান আছে। এসব কথা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের নেতা-নেত্রীরা যে কবে বুঝবেন তা তাঁরাই জানেন।

অতি বলল, চল, খেয়েদেয়ে তোর অফিসটা দেখিয়ে নিয়ে আসি—তোর বস-এর সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দেব। তোর চেম্বারও দেখে আসবি। জ্যামখিন্দিকার নামের একটি মারাঠি ছেলে আছে। ও এস ই সি এল-এ চলে যাবে, অন প্রমোশন।

এস ই সি এলটা কোথায়?

এস ই সি এল মানে হচ্ছে সাউথ ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড। যার হেড কোয়ার্টার্স মধ্যপ্রদেশে, এখন ছত্তিশগড়ের বিলাসপুরে। ঐ কোম্পানিও কোল ইন্ডিয়ার একটি সাবসিডিয়ারি। নর্দার্ন

কোলফিল্ডস-এর মতো এতো না হলেও এস ই সি এল এবং মহানদী কোলফিল্ডসও ভালো প্রফিট করে।

মহানদী কোলফিল্ডস কোথায়?

ওড়িশাতে। সম্বলপুর এবং বুড়লার কাছে। মহানদীর উপরের হীরাকুদ ড্যামের পাশে। ওদের পারফরম্যান্সও খুব ভালো।

তারপর বলল, একটা গুজব খুব জোর শোনা যাচ্ছে। শিগগিরই নাকি কোল ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান হবেন পার্থ ভট্টাচার্য। একজন বাঙালি। ওঁর খুবই সুনাম আছে কাজে। সুদক্ষ প্রশাসক। যদি সত্যিই তিনি হন, তবে খুবই ভালো হবে। অনেকেই দড়ি টানাটানি ল্যাং-মারামারি আছে তো—বুঝবি আস্তে আস্তে। তাই, না আঁচালে বিশ্বাস নেই।

খাওয়া দাওয়ার পর আধঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে অতি তার মোটরসাইকেলের পিছনে চড়িয়ে অনিশকে নিয়ে গেল আমলোরির অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসে। দেখে খুবই ভালো লাগল।

অনিশের বস এস এন নাগবেকার, মারাঠি, নাগপুরের মানুষ। সুপ্রিম কোর্টের জজ সিরপুরকার সাহেবের, যিনি পশ্চিমবঙ্গের প্রধান বিচারপতি ছিলেন সুপ্রিম কোর্ট-এ যাওয়ার আগে, সঙ্গে নাগবেকার সাহেবের কীরকম এক আত্মীয়তা আছে। তাঁর কথা উঠল, কারণ তাঁর স্ত্রী বাঙালি এবং তিনি নাগপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট— খুব ভালো প্র্যাকটিস। সিরপুরকার সাহেব নাকি মহিলার বাবার জুনিয়র ছিলেন। উনিও পরিষ্কার বাংলা বলতে পারেন--মানে, সিরপুরকার সাহেব। নাগবেকার সাহেবও ছেলেবেলাতে বেশ কিছুদিন কলকাতায় কাটিয়েছেন। তাঁর বাবা ইনকাম ট্যাক্সের কমিশনার ছিলেন। উনিও একটু একটু বাংলা বলতে পারতেন।

নগাবেকার সাহেব হেসে বললেন, জ্যামখিন্দিকার চলে গেলে আমার ডিপার্টমেন্টে শুধু দুজন ছাড়া আর প্রায় সকলেই বাঙালি। মীনাক্ষীসুন্দরম আর চিদম্বরম—এই দুই তামিলিয়ান ছাড়া।

জ্যামখিন্দিকারের চেহারাটি ভারি সুন্দর। খুব স্মার্টও। মুম্বইতেই পড়াশুনো, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি শুদ্ধু। ভালো টেনিস খেলে। ওর বদলি

হওয়াতে এখানে টেনিস অনুরাগীরা মুষড়ে পড়েছে। আজই আমলোরি ক্লাবে ওর ফেয়ারওয়েল পার্টি আছে। কেসকে কেস হুইস্কি আর বিয়ার আসছে সেখানে। জয়ন্ত, বীণা, নীগার্হি এবং আরও নানা খাদান থেকে মানুষে আসবেন। সিঙ্গরাউলি থেকেও। অনিশ আর অতিকেও নেমন্তন্ন করল ওরা। ক্লাবটা অতির ফ্ল্যাটের কাছেই।

জ্যামখিন্দিকার বলল, সন্ধের পরে চানটান করে চলে আসুন। ডিনার খেয়ে তারপরে যাবেন। উলহাস কাশালকার গানও গাইবেন। তিনি এসেছেন, এখানে এবং রেনুকুটে গাইবার জন্যে কলকাতা থেকে। এই অঞ্চলে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সমঝদার অনেকই আছেন।

আমি বললাম, গতবারে যখন এসেছিলাম তখনও কলকাতা থেকেই উস্তাদ রাশিদ খাঁও এসেছিলেন। তাঁর গানও শুনেছিলাম। খুবই ভালো গেয়েছিলেন।

অতি বলল, অনিশ সেন তো আজ সকালেই এল। ওর ফ্ল্যাট গোছাতে অনেক সময় লাগবে। ও তো আপনার মতো ফ্যামিলি ম্যান নয়, ব্যাচেলর। তাই আমরা এতো শর্ট নোটিস-এ হয়তো আসতে পারব না। এলেও, গান শুনতে আসব, খেতে হয়তো পারব না। আমাদের এক জায়গাতে নেমন্তন্নও আছে।

অনিশ একটু অবাক হয়ে তাকাল অতির মুখে। কিন্তু কিছু বলল না।

নাগবেকার সাহেব বললেন, কাজ নিয়ে কোনো চিন্তা নেই। আমার এখানে সব স্ট্রিমলাইন করা আছে। তবে নাগপুর থেকে অডিটরেরা আসছেন আগামী সপ্তাহ থেকে। এ বছর থেকে ইনকাম ট্যাক্সের রিটার্ন দেওয়ার সময় তো এগিয়ে গেছে। তাছাড়া অনলাইন-এ রিটার্ন জমা দিতে হচ্ছে গতবছর থেকে। অডিটরেরা যতদিন থাকবেন ততদিন রাত আটটা নটা অবধি থাকতে হতে পারে, তবে হবেই যে, তার কোনো মানে নেই। সিঙ্গরাউলির সেন্ট্রাল অ্যাকাউন্টস অফিসে সারা বছরই গভীর রাত অবধি কাজ হয়। সব জানালাই কাচের বলে রাতের বেলা দূর থেকে দেখা যায় আলো ঝলমল করা মালটিস্টোরিড অফিসটা। রাত না দিন তা বোঝা যায় না। ফিন্যান্স ডিরেক্টর নিজেও থাকেন।

তারপর বললেন, বুঝলেন সেন, কাজ ব্যাপারটা একটা সংক্রামক রোগের মতো। এই রোগে যদি সহকর্মীরা ভোগেন তাহলে আপনারও না ভুগে উপায় নেই। স্নেহ যেমন নিম্নগামী, তেমনই উপরের মানুষে কাজ করলে সাবর্ডিনেটসদের করতেই হয়। তবে সকলে মিলে কাজ করার মতো আনন্দও নেই। এন.সি.এল-এ কাজ একটা ট্র্যাডিশন। আমরা কাজকে ভালোবাসি, ভয় পাই না। এবং এটা কোল ইন্ডিয়ার সকলের কাছে সুবিদিত। দশ হাজার কোটি নেট প্রফিট তো আকাশ থেকে পড়তে পারে না। উই আর্ন এভরি রূপী বাই টয়েলিং। সো, জয়েন আস ফ্রম মানডে অ্যান্ড বী ওয়ান অফ আস।

থ্যাঙ্ক উ্য স্যার। আই সার্টেনলি উইল।

তুমি সি. এ. করেছ কোন ফার্ম থেকে?

আর্নস্ট অ্যান্ড ইয়াং।

বাঃ। খুব ভালো ফার্ম। আমার একবার ওঁদের সিনিয়র পার্টনার রাহুল রায়-এর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। ব্রিলিয়ান্ট মানুষ।

তারপর সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওরা ফিরল। অনিশের কোয়ার্টারের নাম্বার নাগবেকার সাহেব নিয়ে নিলেন। সকাল নটাতে গাড়ি যাবে ওকে তুলতে। সোমবার।

বাইকে উঠে অতি বলল, এবারে কোথায়? পামরিদের বাড়িতে যাবি নাকি? নাকি লাইব্রেরিতে? পামরি এখন লাইব্রেরিতেই থাকবে।

'হ্যালো' করেই আজ চলে আসব। রেবা মাসিমাকে রবিবার দেখতে যাব সকালে। সারাদিন থাকব। গতবারে একদিনও না যাওয়াটা খুবই অন্যায় হয়েছে। অনিশ বলল।

চল। বলে, অতি ওর দু'চাকার গাড়ি স্টার্ট করল।

—দেখিস। গতবারের মতো গাড্ডায় ফেলে আমার প্রাণ বিপন্ন করিস না। হেলমেট তো আজও নেই।

—আরে চলই না। অ্যাকসিডেন্ট কি রোজই হবে।

পামরির লাইব্রেরিতে পৌঁছে ওরা দেখল, ঝিমলি আছে। বসে বই পড়ছে। পামরি নেই।

অতি, গিয়েই ওর বেণী ধরে একটা টান লাগাল। গতবারেও যেমন করেছিল।

—উঃ। লাগে না? কী ব্যাপার বলো তো অতিদা? আমি যেদিনই বিনুনি করব তুমি ঠিক সেদিনই এসে বেণী ধরে টান মারবে। আমি কি ছোটো আছি? সকলে কী মনে করে বলো তো?

—আর যাই মনে করুক তোর সঙ্গে আমার প্রেম আছে এ কথা মনে করবে না। প্রেমের সম্পর্ক থাকলে কেউ বেণী ধরে টান মারে না।

—তোমার সঙ্গে প্রেম করতে আমার বয়েই গেছে।

—এ্যাই দ্যাখ। গতবারেও যে এসেছিল, অনিশ, আমার সেই বন্ধু।

ঝিমলি বলল, ভালো আছেন?

—এবারে বেড়াতে আসেনি, এখানে চাকরি করতে এসেছে। কোয়ার্টারও পেয়ে গেছে। মেম্বারশিপের ফর্ম দে একটা। ও আমার মতো আনপড় নয়, খুবই সাহিত্যভক্ত। বাংলা ইংরেজি সব বইই গোগ্রাসে গেলে। তুইই কি এখন লাইব্রেরিয়ান?

—না। লাইব্রেরিয়ান পামরিদিই আছে। আমি অ্যাসিস্ট করি। মাইনেও পাই। আমার ডেজিগনেশান অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান।

—বাঃ। তাই? কংগ্রাচুলেশানস।—দে ফর্মটা দে। ফিলআপ করে আজই টাকা দিয়ে দেবে। ফোন নাম্বার এখনও জানা নেই। ফোন লাগলেই তোকে জানিয়ে দেবে। লাইব্রেরির ফোন আছে তো?

—তা আছে। তবে মোবাইলেও করতে পারেন।

—মোবাইল তো তোর প্রেমিকদের ফোন করার জন্যে। মোবাইল নাম্বার কি তুই সবাইকে দিস নাকি?

—প্রেম অত সস্তা জিনিস নয়। তুমি সস্তা ভাবো বলেই তো তোমার আজ অবধি প্রেমিকা হল না একটিও।

—আরে প্রেমিকা হলেই তো কিছুদিন পরে বউ হয়ে যাবে। সেই সর্বনাশ যতদিন ঠেকিয়ে রাখা যায় তারই চেষ্টা করছি আর কি।

যখন ফর্ম ভর্তি করে টাকা দিচ্ছে অনিশ পার্স খুলে, অতি, ঝিমলিকে জিজ্ঞাস করল, পামরি আসেনি কেন রে?

—রেবা মাসিমার শরীর খারাপ হয়েছে। স্ট্রোক হয়েছিল, জানো তো?

—তা জানি। সে তো অনেকদিন আগের কথা।

—হ্যাঁ। তারপর থেকেই শরীর ভালো থাকে না। তার উপরে হাইলি ডায়াবেটিক।

—পামরির মোবাইল নাম্বারটা দিবি?

—না।

—কেন?

—মানা আছে। যাকে তাকে মোবাইল নাম্বার দেওয়া মানা।

—আচ্ছা আমাকে না দিলি, অনিশকে তো দিতে পারিস। অনিশ ওদের পরিবারের পুরনো বন্ধু। হাজারিবাগ কানেকশান।

—না। তাও পামরিদিকে জিজ্ঞেস না করে আমি দিতে পারব না।

—আমার লাগবে না অতি। আমার মোবাইল ফোন নেই। তোকে তো আগেই বলেছি।

—সে কী রে। তুই তো প্রাগৈতিহাসিক জন্তু। সেলফোন নেই এমন কেউ এখন আছে নাকি? পানওয়ালা, বিড়িওয়ালা, বাড়ির কাজের লোক, সকলেরই তো সেলফোন আছে।

—আমি পানওয়ালা বিড়িওয়ালা বা কারো বাড়ির কাজের লোক নই বলেই নেই।

—ইয়ার্কির কথা নয়। সত্যিই নেই? বলিস কি রে? অনেক সময়ে আপদে বিপদে খুবই কাজে লাগে।

—আগে আপদ বিপদ হলে কী করত মানুষে?

—এখন তো আর আগের দিন নেই।

অতি ঝিমলিকে বলল, ঠিক আছে, বাড়ির ঠিকানাটা অন্তত ওকে লিখে দে। সব জায়গাতেই তো আমি ওকে ঘাড়ে করে নিয়ে যেতে পারব না। সেবারে বেড়াতে এসেছিল অন্য কথা ছিল, এখন ও এখানে অফিসার। অফিসের গাড়ি ওকে নিয়ে যাবে নিয়ে আসবে। কম ভাড়াতে পার্সোনাল কাজেও পাবে গাড়ি। এবারে ও নিজেই ওর গার্জেন—আমি আর লোকাল গার্জেন নই।

—ঠিকানা লিখে দিচ্ছি। তবে লাইব্রেরিতে সন্ধেবেলাতে ফোন করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে তারপরে ভালো হয়।

—ঠিক আছে। তাই যাব।

অতি বলল, পামরি যে এত ফর্মাল তা তো জানা ছিল না।

পামরিদি তো চিরদিনই ফর্মাল। আপনি কতদিন চেনেন পামরিদিকে?

—তা অবশ্য বেশিদিন চিনি না। সত্যি কথা বলতে কি, যাকে চেনা বলে তেমন আজও চিনি না। কিন্তু অনিশ যে ওর খুবই ঘনিষ্ঠ।

—ঘনিষ্ঠ কী না, তা আমার জানার কথা নয়। পামরিদিই জানবে। আপনার পক্ষে ভালো হবে একটা চিঠি আমাকে লিখে দিন। আমি আজই বাড়ি যাবার আগে পৌঁছে দেব। এই নিন প্যাড।

এত কথা বলতে বলতেই কিন্তু নানা সদস্যর বই রিসিভ করা, নতুন বই রিকুইজিশান স্লিপ দেখে ইস্যু করা সবই করছিল ঝিমলি। খুব এফিসিয়েন্ট আছে মেয়েটি।

ভাবছিল, অনি।

খাম-টাম নেই খোলা চিঠিতে বেশি কী আর লিখব, লিখল অনি।

কল্যাণীয়াসু পামরি,

আমি গতকাল এসেছি। আগামিকাল নতুন চাকরিতে জয়েন করব। আমলোরির অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসের অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে। বাড়ির ফোন আসেনি। অফিসের ফোন নাম্বারও এখন পর্যন্ত জানি না, কাল জানব। বাড়ির ঠিকানা দিলাম। তোমাদের বাড়ির ঠিকানা নিলাম। আমার ফ্ল্যাট লাইব্রেরি থেকে কাছেই। এখনও কাজের লোক পাইনি। পাব কি না জানি না। অতি বলেছে, জোগাড় করে দেওয়ার চেষ্টা করবে। যতদিন না পাচ্ছি নিজেই রেঁধে খাব। অবশ্য একবেলা, রাতে। দিনে, অফিসের ক্যান্টিনেই খেয়ে নেব। অতির কাছে শুনেছি ক্যান্টিনের খাওয়া ভালো।

রেবা মামিমার অসুস্থতার কথা জানলাম ঝিমলি দেবীর কাছ থেকে। গতবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারিনি বলে এখনও অপরাধী হয়ে আছি। অবশ্য আমার যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল তা তো তুমি জানোই।

হাসপাতাল থেকে অতির বাড়ি ফেরার পরে তুমি একদিন পাঁচ মিনিটের জন্য আমাকে দেখতেও এসেছিলে। মনে আছে?

শুনলাম, রেবা মামিমার শরীর আজকে খারাপ হয়েছে। তুমি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলে যত তাড়াতাড়ি পারি যাব তোমাদের বাড়ি। রেবা মাসিমাকে বোলো। এখন তো আমি আমলোরিরই বাসিন্দা হয়ে গেলাম। আশা করি, প্রায়ই দেখা হবে।

—ইতি শুভার্থী অনিশ সেন।

এইটুকু লিখে, তারিখ দিয়ে, নিচে বাড়ির ঠিকানা লিখে দিল ও।

চললাম, ঝিমলি।

বলে, অতি, আরেকবার জোরে ঝিমলির বেণী টেনে দিল।

ঝিমলির লাগেনি যদিও তবুও কাপট্যর সঙ্গে বলল, উঃ।

তারপর বলল, এবারে আমি সত্যিই থানায় গিয়ে ডায়েরি করব আপনার নামে।

প্লিজ করো। সুইটি পাঈ।

অতি বলল, একটুও ভয় না পেয়ে।

লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে অতির মোটর সাইকেলের পেছনে উঠতে উঠতে অনিশ বলল, সত্যি! তুই ইনকরিজিবল।

তারপর বললাম, কত লোক ছিল লাইব্রেরিতে, কত নারী ও পুরুষ। সকলের সামনে এরকম বেণী-টানাটানি কি ভালো দেখায়?

—অন্যে কে কী ভাবল তাতে আমার বয়েই গেছে।

—বলেই, অতি গান ধরে দিল "লোগোঁ তো কহেগা, লোগোঁকো যো কেহনা, ও ছোড়ো বেকার বাঁতে...."

তারপরেই বলল, মেয়েটিকে কেমন লাগে তোর?

—অত্যন্ত ভালো মেয়ে এবং অত্যন্ত সপ্রতিভও। অত্যন্ত সুন্দরীও।

—আর নিমকিনও বটে। কী বলিস?

—তা তো বটেই।

—ওর মা-বাবা নেই?

—অবশ্যই আছেন।

—তোকে তাঁরা চেনেন?

—অবশ্যই চেনেন।

—ও যদি সত্যিই থানাতে গিয়ে ডায়েরি করে?

—করলে করুক না। কদিন না জেলই খাটব। কিন্তু ও যে সারাজীবন আমার জেলে কাটাবে।

—মানে?

—ওকে আমি বিয়ে করব।

—ও তো বাচ্চা মেয়ে। এ তো শিশুবধ হবে।

—কোনো মেয়েই বাচ্চা নয়।

—ও তোকে বিয়ে করলে তো? তুই তো ওর তুলনাতে একটা বুড়ো।

—তুই মেয়েদের কিছুই জানিস না। চুপ করে থাক।

—কী প্রকাশ ভালোবাসার! সকলের সামনে বেণী ধরে টানাটানি।

—ও আসলে খুবই পছন্দ করে বেণী ধরে টানা।

—জানি না বাবা।

—জানিসই তো না।

—তারপর বলল, ভাবছি, বিয়েটা আগামী শীতেই সেরে ফেলব। ভালোই হল, তুই এখানেই থাকবি তখন, কলকাতা থেকে না-আসার মিথ্যে বাহানা করতে পারবি না। বরযাত্রী যাবি তো? কী রে?

—আগে তো জেলটা খেটে আয়। তারপর ভাবা যাবে।

ক্লান্ত হয়ে অফিস থেকে প্রায় সাতটার সময়ে রাতে ফিরতেই অনির কোয়ার্টারের একতলাতে যাঁরা থাকেন, সেই এঞ্জিনিয়ার নরেশ বেদী, তাঁর স্কুল শিক্ষিকা দীপিকা এবং ছেলে প্রাণ, তাঁরা ডাকলেন আমাকে দোতলার সিঁড়ি দিয়ে ওঠার আগেই। একটি চিঠি এবং একটি ক্যাসারোলও দিলেন।

বললেন, একজন এসে দিয়ে গেছেন।

তারপর বললেন, আপনি তো একা থাকবেন। খাওয়া দাওয়ার কী হবে? সকালের ব্রেকফাস্ট এবং রাতের ডিনার আমরাই পাঠিয়ে দেব যদি কিছু না মনে করেন। আপনার ফ্যামিলি কলকাতা থেকে এসে গেলে তো তখন আপনার অসুবিধা হবে না।

অনি হেসে বলেছিল, আমি ব্যাচেলর। আপাতত ফ্যামিলি আসার কোনো সম্ভাবনা নেই। প্রতিদিন আপনাদের উপরে এই অত্যাচার করা যাবে না।

নরেশ বেদি বললেন, আমরা অবশ্য নিরামিশাষী। হিমাচল প্রদেশের লোক আমরা। রোজ রোজ নিরামিষ খেতে আপনার কষ্টও হবে।

সেটা কোনো ব্যাপার নয়। তবে অনেকেই ধন্যবাদ। কলকাতাতেও আমি একাই থাকতাম। মা বাবা ভাই বোন কেউই নেই আমার। তবে রান্না করা এবং দেখাশোনা করার জন্য একটি বাচ্চা মেয়ে ছিল। এখানেও কেউ জুটে যাবে। আপনাদের খোঁজে কেউ থাকলে জানাবেন।

ওঁরা বললেন, নিশ্চয়ই জানাব।

দোতলাতে উঠে ক্যাসারোলটি খাওয়ার ঘরের টেবিল-এ রেখে বন্ধ চিঠিটি খুলল অনি।

মিস্টার অনিশ সেন,

আপনাকে কী বলে সম্বোধন করব বুঝতে পারছি না। তাই আপাতত মিস্টার অনিশ সেন বলেই ডাকছি। যদি প্রয়োজন হয়, তবে পরে সম্বোধন বদলে নিলেই হবে। তবে আপনার বন্ধু অতিকায়বাবু যে কিম্ভূত-কিমাকার স্বভাবের মানুষ তাই, আপনিও যে কী প্রকার বেরোবেন তা নিয়ে আমার এখনও সন্দেহ আছে।

সেদিন উনি এত জোরে আমার বেণী ধরে টেনেছিলেন যে আমার মাথা এখনও ব্যথা হয়ে আছে। নেহাৎ পামরি দিদির বিশেষ পরিচিত বলেই কিছু বলি না তেমন। কেন যে বলি না, তা আমি নিজেও বুঝে পাই না।

আপনার রান্নার লোক নেই। প্রথম দিন অফিস থেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরে কী খাবেন তা ভেবে মাংস দিয়ে মুগ-মুসুরি মেশানো খিচুড়ি আর আলু-পটল ভাজা গরম গরম আপনার জন্যে পাঠালাম। যদি অনুমতি করেন, তাহলে রোজই পাঠাব। পাঠাতে আমার কোনো অসুবিধা নেই।

পামরিদি আপনার সম্বন্ধে অনেক ভালো ভালো কথা বলেছেন আমাকে। আপনার বন্ধুও যদি আপনারই মতো হতেন!

অতিকায় তো নয় একটি অতিকায় জন্তু। যাচ্ছেতাই।

—ইতি ঝিমলি দেবী।

পুনশ্চ : আমাকে আজ অবধি দেবীজ্ঞানে কেউই দেখেনি। আপনার বন্ধু কিম্ভূত-কিমাকার—কিন্তু আপনিও অদ্ভুত।

কাল আমার লোক সকালে গিয়ে বেদি সাহেবদের কাছ থেকে ক্যাসারোলটা নিয়ে আসবে। রোজই পাঠাব কি না, জানাবেন।

চান করে উঠে ক্যাসারোলটা খুলে একা ঘরেই বললাম, আঃ। খুব সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছে। একটি আলাদা প্যাকেটে আমুল মাখনের দুটি ছোটো চৌকো প্যাকেট এবং দু টুকরো লেবুও দিয়ে দিয়েছে। একটু কাঁচা পেঁয়াজ আর কাঁচা লঙ্কা। খিদেও পেয়েছিল খুব। নাগবেকার সাহেবের সঙ্গে জয়ন্ত-এ গেছিলাম। হাঁটাহাঁটিও হয়েছে ভালোই। খেয়ে উঠে

ক্যাসারোলটি ভালো করে ধুয়ে ব্যাগ থেকে রাইটিং প্যাড বের করে লিখলাম :

ঝিমলি দেবী, মাননীয়েষু,

তোমার চেহারা এবং ব্যক্তিত্ব যেমন সুন্দর তোমার হাতের রান্নাও। আমার বউ থাকলেও আমার জন্যে এতখানি ভাবত না। আজকালকার বউ তো!

আমি তোমার কে? যে, তুমি রোজ আমার জন্যে এমন কষ্ট করবে? কোরো না। করলে বড়ো বিব্রত ও লজ্জিত বোধ করব।

আমার কিম্ভূতকিমাকার বন্ধুর মুখোশ দেখে মুখ বলে ভুল করো না। ওর মতো খাঁটি মানুষ এই দুনিয়াতে কমই হয়। তোমাকে ও ভীষণই ভালোবাসে।

একটা কথা তোমাকে বলা প্রয়োজন। তাই বলছি। সকলের ভালোবাসার প্রকাশ একরকম হয় না। কেউ চুমু খেয়ে ভালোবাসা প্রকাশ করে আর অতির মতো, কেউ বা বেণী টেনে। এ বিষয়ে পরে তোমার সঙ্গে বিস্তারে কথা বলব। শুধু বলব যে, "ভুল কোরো না, ভুল কোরো না, ভুল কোরো না ভালোবাসায়।"

—ইতি মিস্টার অনিশ সেন।

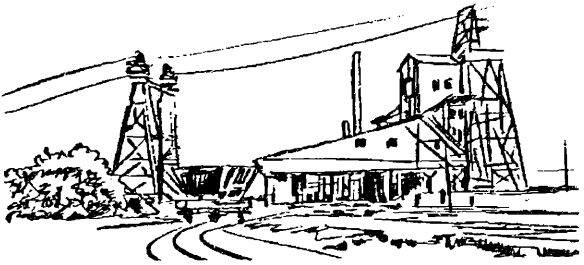

নতুন জায়গা। প্রথম রাতে ঘুম হয় না ভালো, সে ট্রেনের কামরাই হোক কী পরবাস-এর বাড়ি। গতবারে এবং এবারেও অতির বাড়িতে রাত কাটিয়েছিলাম। ঘুম হয়েছিল। আমার এই কোয়ার্টারের প্রথম রাত। এখানের শব্দ গন্ধ সবই অচেনা। মায়, পথের কুকুরদের ডাকও।

ঘুম আসছিল না। দোতলার বারান্দাতে এসে বেতের চেয়ার টেনে বসলাম। দু'পাশে হ্যালোজেন আর মার্কারি ভেপার ল্যাম্পের আলোর সারি আর নানা গাছও। গাছগুলি বেশ বড়ো হয়ে গেছে। কী কী গাছ আছে একদিন দিনের বেলা হেঁটে হেঁটে দেখতে হবে। মধ্যে দিয়ে চকচকে পিচের রাস্তা চলে গেছে সোজা। অ-নে-ক দূর। এত খরচ করেও, কর্মচারীদের সুখ সুবিধা, স্বাস্থ্য, ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্যে এত টাকা খরচ করার পরেও যে কোম্পানি দশ হাজার কোটি টাকা নেট প্রফিট করে তার গর্বিত হবারই কথা। হাসপাতালগুলিও যে কলকাতার হাসপাতালের চেয়ে অনেকই ভালো তা নিয়ে গতবারে অ্যাক্সিডেন্টের পরে থাকাতে, জানার সুযোগ হয়েছিল। মুগ্ধ করেছিল ডাক্তার এবং নার্সদের আন্তরিকতাও।

নর্দার্ন কোলফিল্ডস-এর একটি খাদানের নাম যে "গর্বী" হবে তাতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে?

ঝিমলি আর পামরির কথা ভাবছিলাম। ঝিমলি অতির থেকে প্রায় দশ বারো বছরের ছোটো হবে বয়সে। আগেকার দিনে হতো, কিন্তু আজকালকার দিনে স্বামী-স্ত্রীর বয়সের পার্থক্য এত হয় না। হলে, হয়তো অনেক সুবিধাও হয়। আগেকার দিনের অধিকাংশ দম্পতিকেই তো সুখীই দেখতাম এবং স্ত্রীদের বয়স অনেক কম হওয়াতে হয়তো মান্যতার

ব্যাপারও থাকত। "হাম কিসিসে কম নেহি" ব্যাপারটা কম থাকত। স্ত্রীরা স্বামীর উপরে অর্থনৈতিক ভাবে নির্ভরশীল হতেন এবং স্বামীরাও বহু ব্যাপারেই স্ত্রীদের উপরে নির্ভরশীল হতেন। মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে যান বলেও হয়তো পুরুষরা অনেকদিন পর্যন্ত স্ত্রীসঙ্গ ভোগ করতে পারতেন। দুজনের মধ্যে এত মতপার্থক্যও ঘটত না। অধিকাংশ সংসারই সুখের হত।

থাকগে সে সব, যদি সত্যিই এদের বিয়ে হয়, তবে অতি আর ঝিমলিই বুঝবে।

পামরির কাছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যেতে হবে। গতবারে রেবা মাসিমার কাছে না যাওয়াটা অকৃতজ্ঞতা হয়েছে। পামরি আর রেবা মাসিমার কথা মনে এলেই হাজারিবাগের কথা মনে পড়ে যায়। তখন আমার নব যৌবন। তখন সবসময়েই আনন্দের ফোয়ারার মধ্যে থাকতাম। পৃথিবীতে যে দুঃখ, কষ্ট, নীচতা, বঞ্চনা, ঈর্ষা এবং যন্ত্রণা আছে সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণই অনবহিত ছিলাম। হাজারিবাগে ছিল আমার মামাবাড়ি। কানহারি হিল-এর কাছে। হাজারিবাগের তিন দিকে তিন পাহাড়ের প্রহরা ছিল। কানহারি, সিলওয়ার আর সীতাগড়া। মামারা সকলেই ঘোর বিষয়ী এবং অবস্থাপন্ন ছিলেন। মামাবাড়ির পাশেই ছিল বিজিতেন মামার বাড়ি। তিনি ছিলেন হাজারিবাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট পোস্ট মাস্টার। আমার মামাদের বিপরীত মেরুর মানুষ। অতি সাধারণ আর্থিক অবস্থার একজন অসাধারণ মানুষ। অরণ্য ও বৃক্ষপ্রেমী, অধ্যয়নশীল, সন্ন্যাসীপ্রতিম। ওঁদের বাড়িটি ছিল জরাজীর্ণ, জঙ্গলে ঘেরা। পৈত্রিক বাড়ি। আমার বড়লোক বড়মামার স্ত্রী বড়োমামিমা বলতেন সন্ধের পরে ওদিকে যাসনি অনিশ। বাঘে ধরবে।

তখনও কানহারি পাহাড়ে মাঝে মাঝে বাঘের খবর মিলত। তবে বড়ো বাঘ নয়, চিতাবাঘ।

গাছগাছালি, সে বড়ো গাছই হোক কী ছোটো ফুলের ঝোপ, সে বাড়িতে বেঁচে থেকে যেন খুব খুশি হত। আর মামাবাড়িতে ছিল কেয়ারি-করা ফুলের বাগান। দুজন মালি তার পরিচর্যা করত। একটা জিপ ও একটা কার ছিল। দুজন ড্রাইভার। বড়োমামা ঠিকাদারি করতেন আর

ছোটো মামা এম. ভি. আই। প্রচুর কাঁচা পয়সা ছিল তাঁর। প্রতি রাতে এক বোতল করে থ্রি-এক্স রাম আর একটি করে তন্দুরি চিকেন খেতেন উনি। মামাবাড়ির আবহে আমি হাঁফিয়ে উঠতাম বলেই দিনে ও রাতের অধিকাংশ সময়েই আমি বিজিতেন মামার বাড়িতেই কাটাতাম। রেবামামিমার পরনে অধিকাংশ সময়েই ছেঁড়া শাড়ি থাকত কিন্তু মুখে একটি অনির্বাণ মিষ্টি হাসি। রেবা মাসিমা ও তাঁর ছেলেমেয়েদের দেখেই আমি ছেলেবেলাতেই শিখেছিলাম যে, দারিদ্রের মধ্যে কোনো লজ্জা নেই, দারিদ্র লুকিয়ে রাখার মধ্যেই লজ্জা আছে। ছেঁড়া ব্লাউজ, রং-চটা শাড়ি তাঁর মুখের সদা-নির্মল হাসির ঔজ্জ্বল্যকে কখনও ম্লান করতে পারত না। পুরো পরিবারই সাহিত্য ও গানের খুবই ভক্ত ছিলেন। রেবামামিমার মেজো ছেলের নাম ছিল পাদপ এবং ডাকনাম বিটকেল। বড়ো ছেলে পান্থ তখন কোডারমাতে, ঝুমরি তিলাইয়ার কাছে সামন্তদের এক অভ্র কোম্পানিতে কাজ করত। ছুটি-ছাটাতে আসত। স্কুল ফাইন্যাল পাশ করেই চলে গেছিল। যতখানি না নিজের ইচ্ছায়, তার চেয়ে বেশি সাংসারিক প্রয়োজনে। পরে সে একটি সাঁওতাল মেয়েকে বিয়ে করে কোডারমার কাছের ঝুমরি-তিলাইয়াতেই থেকে যায় ক্রিশ্চান কোম্পানিতে কাজ পেয়ে। বিজিতেন মামা ও রেবা মামিমার পান্থদার স্ত্রীকে গ্রহণ করতে কোনো আপত্তি ছিল না কিন্তু তাঁদের পরিবারের অন্য আত্মীয়রা তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছিলেন বিয়ের পরে, একবার যখন এসেছিল।

বিটকেলের চেয়ে এক বছরের ছোটো ছিল তার বোন পামরি। আর সবচেয়ে ছোটো ছিল পান্থপাদপ, যার ডাকনাম ছিল পাপু।

পান্থপাদপ নামের মানে বোঝাতে বিজিতেন মামাই অনিকে বাগানে নিয়ে গিয়ে একটি গাছ দেখিয়ে বলেছিলেন, অ্যাই দ্যাখো অনিশ, পান্থপাদপ। বড়ো কষ্টে বাগানের এক কোনায় একে বাঁচিয়ে রেখেছি। বাগানের পাঁচিলটা ভেঙে গেছে। পাশের বাড়ির হাজারি সিংয়ের বাড়ির গোরু ছাগল কুকুর বেড়াল ইচ্ছেমতো ঢুকে পড়ে বাগানের ছোটো গাছগুলো তছনছ করে দেয়।

বিজিতেন মামাকে জিজ্ঞেস করেছিল অনিশ, পামরির নামটা এত খারাপ রাখলেন কেন?

—ওর অন্নপ্রাশনের সময় শুধু কলমটাকে হাতে তুলেছিল ও। আর সব খাবার ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলেছিল তাই ওর নাম রেখেছিলাম পামরি। আমিই ওই নামে ডাকতাম। তোমার মামি ডাকতেন পারমিতা বলে। কিন্তু দেখা গেল আমার দেওয়া নামটাই শেষপর্যন্ত টিকে গেল।

অনির এখনও স্পষ্ট মনে আছে, তারপরে বিজিতেন মামা বলেছিলেন, নামে কী এসে যায় রে! শেক্সপিয়ার বলেছিলেন না হোয়াটস ইন অ নেম? ইংরেজি উচ্চারণ দারুণ ছিল বিজিতেন মামার—হাজারিবাগের সেইন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে পড়াশোনা করেছিলেন। তারপরেও কলেজে।

বিজিতেন মামা, বড়ো মামিমার চিঠি থেকে বহুদিন আগে জেনেছিলাম যে, গত হয়েছেন। সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন।

তখন এতরকম ব্যাধিকেও জানতও না মানুষে। অসুখ ধরবার এতরকম যন্ত্রপাতিও আসেনি এ-দেশে। অসুখ ভালো হোক কী নাই হোক বড়োলোকদের টাকা যাতে জলের মতো খরচ করানো যায় তারই প্রতিযোগিতাতে নেমেছে এখন ডাক্তারেরা আর নার্সিংহোমেরা। আর মেডিক্লেম-এর দাক্ষিণ্যে সরকারকে ফতুর করে ডাক্তার আর নার্সিংহোমেরা মোচ্ছব শুরু করেছেন।

গরিবরা তখনও মারা গেলে বলা হত 'সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন,' আজও তাইই হয়।

কিন্তু পামরি আমাকে পরে একটি চিঠিতে জানিয়েছিল যে, বাবার প্রকৃতিপ্রেম-এর জেরেই বর্হি রোডে রাজডেরোয়া অভয়ারণ্যে এক দুষ্প্রাপ্য ফুল গাছের খোঁজ করতে গিয়ে বাবা সাপের কামড়ে মারা গেছিলেন। সঙ্গে দুজন গাছ-প্রেমিক সহকর্মীও ছিলেন। বন বিভাগের চেকনাকাতে বলে, অভয়ারণ্যে ঢোকেননি তাই বনবিভাগ ঝামেলা করতে পারে এই আশঙ্কাতে বাবার দেহ বয়ে নিয়ে, তাঁদেরই এক পরিচিতর গাড়ি করে নিয়ে আসেন হাজারিবাগে। তখন মেজদা ব্যাপারটা জানাজানি যাতে না হয়, তাই সন্ন্যাস রোগের গল্প ফেঁদেছিল।

বাবার সহকর্মীরা জানিয়েছিলেন, প্রকাণ্ড এক শঙ্খচূড় সাপে কামড়েছিল নাকি। সর্পাঘাতের পরে সামান্যক্ষণই বেঁচে ছিলেন।

তখনও পামরি মাসে মাসে চিঠি লিখত অনিকে। অন্নপ্রাশনের দিনে ওর ছোট্ট মুঠিতে কলম তোলাটা ওর বিফল হয়নি। যেমন সুন্দর হস্তাক্ষরে ও চিঠি লিখত আর তেমনই ছিল সে সব চিঠির ভাষা। এবং বক্তব্যও। অনিও উত্তর দিত। ও যদি লেখালেখি করত, তবে একজন নামী লেখক হতে পারত, তবে আজকালকার নামী লেখিকাদের মতো ব্রা বা প্যান্টির কিসসা ওর দ্বারা লেখা হয়তো হত না।

বড়ো মামিমার চিঠিতে জানতাম যে ওরা তো গরিব ছিলই, কিন্তু বিজিতেন মামার মৃত্যুর পরে পেনশনের সামান্য টাকাতে আর চলছিল না। আমি তখন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি পড়ি। রোজগার শুরু করতে অনেকেই দেরি। তাছাড়া, রেবামামিমা আর পামরিকে যতটুকু জানতাম তাতে কারো কাছ থেকেই কোনো সাহায্য গ্রহণ করতে তাঁরা নিশ্চয়ই রাজি হতেন না।

বড়ো মামিমা লিখেছিলেন, বিটকেল নাকি জলের ট্যাঙ্কের কাছে পার্ল মোটর কোম্পানির অফিসের সামনে একটি সাইকেল টায়ার সারাইয়ের দোকান দিয়েছিল। পড়াশোনা সে ক্লাস এইটে উঠেই ছেড়ে দিয়েছিল। পান্থদাও পড়াশোনাতে ভালো ছিল না, বিটকেলও নয়। তবে পান্থদা স্কুল ফাইন্যাল পাশ করেছিল। ছোটো ভাই পাপু গয়া রোডে ট্রাক চাপা পড়ে মারা গেছিল বিজিতেন মামা থাকতে থাকতেই। তবে ওরা বিজিতেন মামা ও রেবামামিমার মতো হয়নি কেউই, একমাত্র পামরি ছাড়া। তাঁর মৃত্যুর পরে পরেই হাজারি সিং জলের দামে 'বাঙ্গালিবাবুর' জঙ্গলভরা জরাজীর্ণ বাড়িটি কিনে নেয়। তখন অবশ্য হাজারিবাগে জায়গা-জমির দাম খুব কমই ছিল। বাড়ি বিক্রি হয়ে যাবার পরে পামরিরা একটি খোলার চালের ঘর ভাড়া নিয়ে চলে যায় পাগমল-এর দিকে। পামরি দুটি সেলাই কল কিনে একটি নিজে চালিয়ে এবং অন্যটি একটি মেয়েকে দিয়ে চালিয়ে মেয়েদের পোশাক বানিয়ে দিন-গুজরান করত। পামরি কিন্তু ওই দুর্যোগের মধ্যেই বিএ পাশ করেছিল ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে। দুর্দশা

যতই থাকুক লাইব্রেরির সভ্যপদও ছাড়েনি। মা ও মেয়ের বই পড়ার অভ্যাস আগের মতোই ছিল।

পামরিরা তারপরে যে কোথায় হারিয়ে গেল সে খোঁজ বড়োমামিরাও রাখেননি। কারণ, ব্যবসা আরও বড়ো হওয়াতে বড়োমামা ধানবাদে চলে যান। আর এম. ভি. আই ছোটোমামাও রিটায়ার করে রাঁচির ডুরাণ্ডাতে প্রকাণ্ড বাড়ি বানিয়ে সেখানেই গিয়ে সেটল করেন। পামরিদের সঙ্গে অনির আর কোনোই যোগাযোগ থাকে না। পামরি তারপরে আর চিঠিও লেখেনি অনির কাছে। তবে অনির মনের মধ্যে পামরি আর রেবামামিমার জন্য অনেকখানি জায়গা শূন্যই ছিল।

মাঝরাতে আমলোরির ওই কোয়ার্টারের দোতলার বারান্দাতে বসে অনেকদিন আগের হাজারিবাগে চলে গেছিল অনি। যে সময়ের কথা ভাবছিলেম, তখন অনির বয়স ছিল পনেরো-ষোলো আর পামরির তেরো-চোদ্দো। জীবনের ওই বয়সটাই বোধহয় প্রত্যেক ছেলেমেয়ের জীবনে সবচেয়ে রোমাঞ্চকর, সবচেয়ে রহস্যময়। সবচেয়ে স্মৃতিমেদুর।

কাছেই নাইট-ওয়াচম্যানদের গুমটি। এই যন্ত্রনির্ভর আধুনিক পৃথিবীতেও মাঝরাতে ঢং ঢং করে পেটা ঘড়িতে বারোটা বাজল।

হঠাৎই যেন ঘুমে ভরে এল দু'চোখ। সকালে ঠিক নটাতে গাড়ি আসবে ওকে তুলতে। তারপরে চিদম্বরমকে তুলে নিয়ে অফিসে যাবে। তাকেই আগে তুলবে গাড়ি তাই দেরি করার উপায় নেই।

অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম এই ডি চিদম্বরমের কীরকম দূর সম্পর্কের আত্মীয়। এ কথাটা আমলোরির অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের সকলেই জানে। মানুষটা ভালো এবং Mean নন, তবুও প্রথম দিনই লক্ষ্য করেছে অনি, যে অন্য সকলেই নিজ নিজ স্বভাবদোষে তাকে বিশেষ খাতির করে চলে।

তাই, যে-গাড়িতে চিদম্বরম যাবে সে গাড়িকে বসিয়ে রাখা যায় না।

অতির মোটর সাইকেল থেকে গতবারে ছিটকে যাওয়ার পর মোটর-সাইকেল চড়তে ভয় হত খুব। একটি হিরো সাইকেল কিনে নিয়েছে অনি। তাতেই কাজ চলে যাচ্ছে। দূরে কোথাও যেতে হলে তো কারও না কারও গাড়ি মোটর সাইকেল পেয়েই যায়।

আমলোরিতে কাজে যোগ দেওয়ার পরে সাতদিন কেটে গিয়েছে।

আজ রবিবার। এক কাপ কফি বানিয়ে খেয়ে একটি আপেল খেয়ে সাইকেলে চেপে পামরিদের বাড়ির দিকে রওনা হল অনি। আমার কোয়ার্টার থেকে বেশি দূরে নয়। এতখানি যে কাছে, তা পৌঁছেই বুঝলাম।

যখন একটি মস্ত শিরিষ গাছের নিচে পামরিদের বাড়িতে গিয়ে উঠলাম তখন বাড়িতে রেবামামিমা একা বারান্দার ইজিচেয়ারে শুয়ে ছিলেন। বিজিতেন মামা যেমন হাজারিবাগের বারান্দাতে শুয়ে থাকতেন।

সাইকেলটা বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে রেখে রেবামামিমাকে প্রণাম করল। রেবামামিমা শোয়া অবস্থা থেকে উঠে বসলেন। মুখে সেই হাসি। এত ঝড়ঝাপটা সত্ত্বেও মুখের হাসিটি একটুও ম্লান হয়নি।

এতদিনে সময় হল ছেলের?

রেবামামিমা বললেন।

অনি অপরাধীর মতো বলল, খুবই অন্যায় হয়ে গেছে এতদিন আসতে পারিনি বলে। গতবারেও অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যাওয়াতে আসতে পারিনি। এখন কেমন আছেন মামিমা?

—এখন চলে গেলেই হয়। মেয়েটার ঘাড়ে বোঝা হয়ে থাকতে আর ভালো লাগে না বাবা।

—পামরি কোথায়?

—টিউশনিতে গিয়েছে। রবিবারে সকাল-বিকেল তিনটে টিউশনি করে। সপ্তাহের অন্যদিন দিনে সেলাই আর সন্ধে থেকে লাইব্রেরি।

একটি ছোটো মেয়ে আমার গলা শুনে বাইরে এল। বছর চোদ্দো-পনেরো বয়স হবে। স্থানীয় মেয়ে।

মামিমা বললেন, কী খাবে বাবা? তুমি রান্না আর কাজের লোক পেলে? না হাত পুড়িয়েই খাচ্ছ?

—পাইনি, তবে পেয়ে যাব।

—দুপুরে তো শুনলাম অফিসের ক্যান্টিনেই খাও। রাতেও তো ঝিমলির পাঠানো খাবার খাবে না বলে দিয়েছ। খাও কী তবে?

—অনেকদিন ক্যান্টিন থেকে ক্যাসারোলে করে কিছু নিয়ে আসি, ফলটল খেয়ে থাকি। মুড়ি খাই জল দিয়ে। খাওয়াটা তো বড়ো ব্যাপার নয় মামিমা। শরীর ধারণের জন্যে যা কিছু একটু খেলেই হল।

—তুমি কি বৃদ্ধা বিধবা আমার মতো, যে মুড়ি আর জল খেয়ে রাত কাটাবে বাবা। এখন থেকে রোজ রাতে আমাদের বাড়িতেই খাবে। যতদিন না ভালো কাজের লোক পাচ্ছ। অফিস থেকে ফিরে সাইকেল নিয়ে চলে আসবে। আমরা যা দু-মুঠো খাই তাই খাবে। খেয়েদেয়ে, ফিরে যেও কোয়ার্টারে।

তারপর বললেন, একা মানুষের কোয়ার্টারে থাকার দরকারই বা কী? আমাদের এখানেই তো থাকতে পারো। বাড়তি ঘর তো আছেই একখানা।

বলেই বললেন, কী রে মুন্নি, বাবুকে কিছু খেতে দে।

অনির দিকে মুখ তুলে বললেন, লুচি আর ঝাল-ঝাল আলুর তরকারি কি খাবে? কাঁচালঙ্কা কালোজিরে দিয়ে রাঁধা? যেমন তরকারি তুমি খেতে ভালোবাসতে আমাদের বাড়িতে। হাজারিবাগে।

ওই আলুর তরকারির কথাতেই অনির স্মৃতিতে হাজারিবাগ যেন ঝলমল করে উঠল।

বলল, হাজারিবাগের কথা মনে করাবেন না মামিমা। মন বড়ো খারাপ হয়ে যায়।

আমার আর মন খারাপ হয় না বাবা। পুরনো কথা সব ভুলেই গেছি। সব বর্তমানই একদিন অতীত হয়ে যায়। আজকের আলো-ঝলমল সকালটাও একদিন অতীত হয়ে যাবে।

—বানায় গা লুচি ঔর আলুকা সব্জি?

ছটফটে মুন্নি বলল।

—বানা রে বাবা, বানা। অতিথি কি নিজে মুখে বলবে যে খাবো? কেমন ধারা মেয়ে তুই? তবে লুচি এখুনি ভাজিস না। দিদি তো একটু পরেই ফিরবে। সেও তো এক কাপ চা খেয়েই বেরিয়েছে। ফিরলে, তখনই গরম গরম ভেজে দিস দু'জনকেই।

ঠিক হ্যায়।

বলল, মুন্নি।

অনি শুধলো, তুমহারা ঘর কাঁহা?

মুলুক?

হাঁ।

সিধি।

তুম ছুটকু জানতা? অতিবাবুকো দেখভাল করতা হ্যায় যো ছুটকু?

বলতেই, মুন্নি হেসে উঠল। ওর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

বলল, জি হাঁ।

রেবামামিমা বললেন, সে ছেলে তো প্রায়ই দুপুরবেলা মুন্নির সঙ্গে গল্প করতে আসে। কখনও কখনও দুজনে মিলে আমলোরির হাটেও যায় সাজুগুজু করে। খুবই ভাব তো দুজনের।

তাই?

অনি বলল, বহতই আচ্ছা লেড়কা হ্যায় ছুটকু। ম্যায় যব থা অতিবাবুকো ঘরমে, হামারা বহুতই খিতমদগারি কিয়া। খনা ভি পাকাতা বঁড়িয়া।

উসসে ম্যায় ঔরভি বঁড়িয়া পাকাতা হ্যায়।

আচ্ছা? ঠিক হ্যায়। খা কর বাতায়গা।

তারপর অনেকক্ষণ রেবামামিমার সঙ্গে নানান কথাবার্তা হল। জানা গেল, ছেলেরা দুজন মায়ের খোঁজ কেউই রাখে না। সব দায়িত্ব পামরি একাই নিজের কাঁধে নিয়েছে।

স্বগতোক্তির মতো মামিমা বললেন, কবে যে আমি মেয়েটার ঘাড় থেকে নামব। আমার জন্যে ও বিয়েও করতে পারছে না। এদিকে সাঁইত্রিশ বছর বয়স হয়ে গেল।

—সাঁইত্রিশ বছর আজকাল কোনো বয়সই নয় মামিমা।

তারপরেই বলল, পাত্র কি ঠিক করা আছে?

খুব ভয়ে ভয়েই প্রশ্নটা করল। এই প্রশ্ন করতে ওর বুক কেঁপে উঠল।

—না, ঠিক করা নেই। মাসিমা বললেন।

শুনে, আশ্বস্ত হল অনি।

—তবে কত ছেলেই তো ওকে পছন্দ করে। মেয়ে তো আমার খারাপ নয়। কিন্তু মেয়ে বলে, মা ওরা আমাকে করুণা করে, আমাদের অবস্থা দেখে দয়াপরবশে অমন উৎসাহ দেখায়। ওই বোধকে ভালোবাসা বলে না।

তারপরে রেবামামিমা বললেন, আমি বলি, ভালোবাসা তো একসঙ্গে থাকতে থাকতেই হয়। আমাদের কি বিয়ে হয়নি? বিয়ের আগে তোমার বিজিতেনমামাকে কি আমি চিনতাম? বলো, বাবা অনি?

—আজকাল দিনকাল বদলে গেছে মামিমা। তা ছাড়া, পামরির মতো আত্মসম্মানজ্ঞানী মেয়ে অন্যের দয়া নেবেই বা কেন?

—তা বলে এত ছেলের মধ্যে ওর যোগ্য কি কেউই নেই? তবে জানি না, মনে মনে বিশেষ কারোকে ও পছন্দ করে কি না! আমি মা, আমার কাছেও যদি কথা লুকিয়ে রাখে তবে আর কী বলি বলো। সে কেবলই বলে, আমার জন্যে যে প্রতীক্ষা করে আছে সেই এসে ধন্য করবে আমাকে। 'শেষের কবিতা' আওড়ায়। শেষের কবিতার দিন কি আর আছে বাবা? তুমিই বলো?

—আপনি চিন্তা করবেন না মাসিমা। ওর নজর খুব উঁচু, রুচিও খুবই ভালো। ওর খুবই ভালো বিয়ে হবে। দেখবেন। আপনি কোনো চিন্তা করবেন না।

—চিন্তা না করেই বা কী করি! ভাবলাম, এবারে যখন স্ট্রোক হল, তখন বুঝি চিরদিনের মতো ছুটি হয়ে যাবে। তা হল কই? মেয়েমানুষের প্রাণ বড়ো কঠিন, অত সহজে কি তা যেতে চায়। অথচ এই মেয়েটার মায়া ছাড়া আর কিই বা আছে এখনও পড়ে থাকার মতো।

এমন সময়ে পামরি তার লেডিজ সাইকেলটা ঠেলতে ঠেলতে ভিতরে ঢুকে সাইকেলটা জায়গা মতো রেখে, হেসে বলল, কী ব্যাপার মিস্টার অনিশ সেন? পথ ভুলে?

অনেকক্ষণ পামরির মুখে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে ওর শরীর মনের পূর্ণতাতে বিহ্বল হয়ে রইল অনি। কথা বলতে পারছিল না কোনো। একটি সাদা খোলের উপরে কালো ডুরে শাড়ি। মাথায় খোঁপা। তাতে একটি সাদা চাঁপা ফুল গোঁজা। চোখে কাজল। সেই কাজল যেন তার দু'চোখকে অতলান্ত করে দিয়েছে।

পামরিও দীর্ঘক্ষণ ধরে দেখল, জিনস আর খয়েরি-কালো একটি হাফ হাতা গেঞ্জি পরা অনিকে।

পথ ভুলে নয়, পথ চিনতেই তো এলাম! চিনলে না হয় পথ ভুলব। পথই যে চিনতাম না।

অনি বলল।

তারপর বলল, অনি 'মিস্টার অনিশ সেনটা'ও কি 'ঝিমলিদেবী'র দান করা সম্বোধন?

—তাই-ই। 'ঝিমলি দেবী'টাও যেমন তোমার দেওয়া।

—ভারি ভালো মেয়েটি। অতির ভাষায়, 'নিমকিন'।

—'নিমকিন'? সেটা আবার কী জিনিস?

—ও তুমি বুঝবে না। ওটা পুরুষদের ভোকাবুলারি।

—তা হবে। তবে অতিদাকে কিন্তু সত্যি সত্যিই ঝিমলি এবারে হাজতবাস করাবে আবারও যদি দশজনের সামনে ওর বেণী ধরে টানে।

—তুমি অনেক জানো কিন্তু সব জানো না। ওদের দু'জনের মধ্যে গভীর প্রেম।

—হাঃ। কী যে বলো। প্রেম! ঝিমলি তো অতিদার মেয়ের বয়সী।

—প্রেমের কোনো বয়স নেই। পিসির বয়সি কারও সঙ্গেও যেমন প্রেম হতে পারে, মেয়ের বয়সির সঙ্গেও হতে পারে। তা ছাড়া, অতির মন আমি পড়তে পারি কিন্তু তুমি কি ঝিমলির মন পড়তে পারো? ওকে ভালো করে নেড়েচেড়ে দেখো, ওর, মনের গাছ থেকে কী ফুল ঝরে।

—সত্যি বলছ তুমি?

—মিথ্যা বলার তো কোনো কারণ নেই।

—লুচি ক্যা ভাজেগা আভ্‌ভি মাইজি?

মুন্নি মাঝে পড়ে এই প্রেমতত্ত্বের গভীর আলোচনার মধ্যে হঠাৎ বেরসিকের মতো বলে উঠল।

—কীসের লুচি?

পামরি অবাক হয়ে বলল।

—রেবামামিমা বললেন, হাজারিবাগের মতো কাঁচালঙ্কা আলু কালো জিরের তরকারির সঙ্গে লুচি খাবে বলেছে অনি।

—তাই?

তারপরই মুন্নিকে রাগ করে বলল, তুই ডোবাবি। তোর কিছু করতে হবে না, আমিই করছি। আসছি দাঁড়া।

বললাম, আমার কাছে কিন্তু ওই আলুর তরকারি আর লুচির চেয়েও তোমার আর রেবামামিমার সঙ্গ অনেক দামি। তুমি যদি রান্নাঘরেই থাকবে তাহলে আমি এলাম কেন?

তা হোক। না খেয়ে থাকো তা কি আমরা জানি না! লুচি-তরকারি খেতে খেতেও সঙ্গ করা যাবে। দুই যুগ পার করে এলে তার আবার আদিখ্যেতা।

—তাতে কী হল! এই মহাকালের প্রেক্ষিতে দুটি যুগ তো কোনো সময়ই নয়, মোর তরে যে প্রতীক্ষিয়া রবে সেই ধন্য করিবে আমাকে। ভুল বললাম, না?

পামরি একটা হোঁচট খেল যেন। তারপরই কপট রাগের সঙ্গে রেবামামিকে বলল, মা! তুমিই অনিদাকে এ সব কথা বলেছ নিশ্চয়ই ...।

—আরে আমি কি অনির কথা বলেছি। তুই যা বলিস সে কথাই বলেছি।

—পামরি আর অনি দু'জনেই লজ্জা পেয়ে মুখ নামিয়ে নিল।

অবাক হল, এখনও লজ্জা পায় বলে।

পামরি বলল, অনিদা তুমি মায়ের সঙ্গে গল্প করো। আমি লুচি-তরকারি নিয়ে আসছি। তারপরে আমিও গল্প করব।

তারপর বলল, আজ তো আমলোরির ক্যান্টিন খোলা নেই। আজ হাত পুড়িয়ে খেতে হবে না। এখানেই খাবে আজ দুপুরে।

বললাম, ভাবছিলাম, অতির কাছে যাব। ও আমার জন্যে এত কিছু করে, সাতদিন হল দেখাসাক্ষাৎ নেই, আমাকে অকৃতজ্ঞ ভাববে।

—আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতার কোনো প্রশ্ন যদিও নেই, কিন্তু দু'যুগ আর এক সপ্তাহ কি এক হল? অতিদা কি এতই ইনকনসিডারেট?

—তা নয়। অতিও তোমাদের খুবই পছন্দ করে। তোমাদের সব কথা তো আমি ওর কাছ থেকেই জানতে পাই।

যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়ে মুখ ঘুরিয়ে পামরি বলল, আমাদের সব কথা মানে কী? আমাদের অসহায়তা, আমাদের দারিদ্র এই সবই তো?

অনি একটু রাগতস্বরে বলল, তোমাদের দারিদ্র তো কোনো নতুন কথা নয় পামরি। ভুলে যেও না বিজিতেনমামার কাছ থেকেই অতি অল্প বয়সেই আমি শিখি যে, দারিদ্রের মধ্যে কোনো লজ্জা নেই, তা লুকিয়ে রাখার মধ্যেই লজ্জা আছে। একদিকে আমার মামাবাড়ি আর অন্যদিকে হাজারি সিং-এর নগ্ন বৈভবের মধ্যে বিজিতেন মামা তাঁর শেয়ালে রঙা ছেঁড়া র‍্যাপার গায়ে আর ধুতি পরে এক মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করে মাথা উঁচু করে বেঁচেছিলেন। তোমাদেরও ওইভাবেই বাঁচতে শিখিয়েছিলেন।

তারপরে ক্ষুব্ধ গলায় বলল, না, অতি তোমাদের দারিদ্রর কথা বলেনি আমাকে। বলেছে, বৈভবের কথাই, যে-বৈভব আমার মামাদের বা হাজারি সিং-এর বৈভব নয়, যা সাধারণ মানসিকতার মানুষদের চোখে কোনোদিনই পড়ে না।

পামরি কথা না বলে ভিতরে চলে গেল।

আজ পিকনিক হবে। নর্দার্ন কোলফিল্ডস-এর চাকরির দু'মাস হয়ে গেল। মাঝে পামরির সঙ্গে অনির দু'বার লাইব্রেরিতে দেখা হয়েছিল।

এনটিপিসির পাওয়ার প্ল্যান্ট যে জায়গাটাতে, রেনুকুট স্টেশন থেকে সিঙ্গরাউলি আসার পথে, সেই জায়গাটার নাম শক্তিনগর। তারই কাছে সিঙ্গরাউলির পথ আর এনটিপিসি যাবার পথের মোড়ের নাম ওডি মোড়। সেখানে রোজই সকালে আনাজের বাজার বসে। বিশ্বজিৎদা মানে, বিশ্বজিৎ বাগচী, ট্রান্সপোর্ট ম্যানেজার। তারই অধীনে সব গাড়ি। সকালে গাড়ি পাঠিয়ে ভালো করে বাজার করিয়েছিলেন আর আমলোরির ক্যান্টিন ম্যানেজার সুধীনবাবু, সুধীন কর, ডিপফ্রিজে রাখা বড়ো কাতলা মাছ সরবরাহ করেছিলেন। তারপর দুটি গাড়ি আর চারখানি মোটর বাইকে করে ওরা আজ সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছিল।

আজ গাড়োরিয়া বনবাংলোতে পিকনিক হবে। ওই বাংলোরই কাছে দুটি প্রাচীন বৌদ্ধ গুম্ফা আছে। দুপুরের খাওয়ার আগে সকলে মিলে দেখতে গেছিল। রাবণমারা গুম্ফাও আছে। মারা গুহা।

অতি, বিশ্বজিৎদা, মিহিরদা, মিহির চ্যাটার্জি বিশ্বজিৎদার ভায়রা, সবাই সস্ত্রীক, আমি পামরি, ঝিমলি, ছোটু (মুন্নিকে রেখে আসতে হয়েছিল রেবামামিমাকে দেখাশোনা করার জন্য) কবি, সবজান্তা লাহিড়ী এবং আরও কেউ কেউ। সবাইকে চিনি না আমি।

সকলে মিলে খুব মজা হল। গান, কবিতা, হাসির গল্প, অন্ত্যাক্ষরী, আরও কত কী। যাঁরা রসিক তাঁদের জন্যে হুইস্কি, রাম, বিয়ার ইত্যাদিও

নেওয়া হয়েছিল। মহিলাদের মধ্যে দুজন বেশ ভালো মদ্যপান করেন। অন্যদের জন্যে কোক, স্প্রাইট, থাম্পস-আপ।

এই গাড়োরিয়া বাংলোটি ছোটো, বাংলোর হাতাও ছোটো, তাতে নানা গাছের প্ল্যানটেশনও করেছে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট। বিশেষ করে নলি বাঁশের, সেগুনের, শালের, শিরিষের। সঙ্গে, তাঁর নিজের গাড়িতে করে সুরিবালি সিং, নর্দার্ন কোলফিল্ডস-এর একজন ডিএফও-ও গেছিলেন। তাঁর কোয়ার্টার নীগাহিঁতে। খুব মজার মানুষ। তাঁর স্ত্রী নিজে আসেননি কিন্তু পিকনিক পার্টির সদস্যদের জন্যে মস্ত এক ক্যাসারোল ভর্তি রিকমচ্ দিয়ে দিয়েছিলেন। রিকমচ্ ব্যাপারটা কী তা ছুটকিই বুঝিয়েছিল আগেরবার।

ঝিমলি বলল, 'ধোকা' জানেন তো? ডাল বেটে আমরা যে ধোকা বানাই, এখানের ভাষাতে তাকেই বলে রিকমচ্।

তাই? বাঃ।

ঝিমলি দশজনের সামনে অতিকে অ্যাভয়েড করছে। অতি একবার ওর খুব কাছে গিয়ে প্রায় কানে কানেই বলল, একবার বেণীটা টানি।

—ভালো হবে না কিন্তু।

বলেই, লাফ মেরে হরিণীর মতো সরে গেল ঝিমলি।

ভাবলাম, অতি যে বলে নিমকিন তা ঠিকই বলে। ঝিমলির মধ্যে নবযৌবনের এমনই এক অনুকরণীয় ঝলক আছে যাকে 'নিমকিন' বললেই সবচেয়ে মানানসই হয়।

অতি বলল আমাকে, ফিসফিস করেই, ও আসলে আমি বেণী টানব বলেই রোজই বেণী বাঁধে। অন্য যে সব মহিলা এসেছেন তাঁদের মধ্যে কেউই কি বেণী বেঁধে এসেছেন?

—না।

—ও বই বোঝ।

—তবু এখানে আর ওকে জ্বালাস না। বিয়েই যখন করবি বলে ঠিক করেছিস, বিয়ের পরে যত খুশি বেণী টানাটানি করিস। কেউ দেখতে আসবে না।

—ফুঃ। আর একবারও টানব না। ওকেই যখন কোলে টানব, বেণী টানতে যাব কী করতে।

এই বাংলোতে একরকম নলি বাঁশ দেখাল পামরি অনিকে। বলল, এমন গাছ হাজারিবাগে তো দেখিইনি, একবার বিলাসপুর থেকে অমরকণ্টকে গেছিলাম—পথে অচানকমারের জঙ্গল পড়ে, সেখানেও দেখিনি। পাতাগুলো চওড়া চওড়া। হলদে-সবুজ পাতা। সুরিবালি সিং সাহেবও নাম বলতে পারলেন না। বললেন, শুনেছি কোনো ইয়াং ডায়রেক্ট রিক্রুট অফিসার—ফরেস্ট সার্ভিসের কোথাও থেকে এনে এই গাছ লাগিয়েছিলেন। সেই ভদ্রলোক এখন কোথায় পোস্টেড অথবা কী তাঁর নাম কিছুতেই বের করতে পারিনি। শুনেছি, গাছটি ফিলিপিনস-এর গাছ।

সুরিবালি সিং প্রোমোটি অফিসার। নানারকম গ্যায়েলহারী গান, এবং আশপাশের নানা জায়গা সম্বন্ধে সকলকে বলছিলেন। ব্যায়রান সম্বন্ধেও। যে দুর্ভেদ্য, সাংঘাতিক শ্বাপদে ভরা পর্বতময় অরণ্যে রেওয়ার মহারাজা দাগী ক্রিকিনালদের নির্বাসন দিতেন। সেখানে হয় তেষ্টাতে, নয় জংলি জানোয়ারের হাতে, নয় দুরোরোগ্য অসুখে তারা মারা যেত। এ স্থলভূমির আন্দামান।

বলছিলেন, এই মারা গুহা বৌদ্ধ গুম্ফা হলেও এর মধ্যে দুর্গামূর্তি আছে। লাঞ্চের পরে চলুন দেখিয়ে আনব।

রেওয়া মানে, সাদা বাঘের রেওয়া?

অনি বলল।

হ্যাঁ ঠিক তাই। চলুন, দেখাব ভূতালি নালা, তারপরে মাছবান্ধা নালা, ঝিঙ্গাঝিরিয়া নালা, বিন্দুল। তারপরে ব্যায়রান, পারশুনা, হুটার, রজমিলান, তারপর নইনগর। যদিও ও সব দূরের জায়গা দেখা যাবে না।

তারপর বললেন, যে কোনো উঠতি জায়গাতে একটি করে নইনগর থাকবেই। নইনগর অবশ্য ওই জঙ্গলের মধ্যে নেই তবে নীগাহিঁর কাছে একটি আছে।

অতি সঙ্গে সঙ্গেই একটি শায়েরি আবৃত্তি করল :

'নীগাহ যায়ে কাঁহা সীনে যে উঠকর।
হুঁয়া তো হুসনোকো দওলত গড়ী হ্যায়।"

অতির এই শায়েরি শুনে পুরুষেরা হায় হায় করে উঠল। আর মেয়েরা, যাঁরা শায়েরিটির মানে বুঝলেন, লজ্জাতে অধোবদন হলেন।

অনি বোকার মতো, মতো কেন? অনি তো বোকাই, বলল, মানে কী হল?

অতি ব্যাখ্যা করল, মানে হল, চোখ, মেয়েদের বুক ছেড়ে আর অন্য কোথায় যাবে? ওখানেই তো খোদা তাঁদের সব দৌলত গড়ে রেখেছেন।

কথাটা একশোভাগ সত্যি হলেও মেয়েদের সামনে অতি না বললেও পারত। অতিকুমার রায় যা ওর সহকর্মীদের দেওয়া নাম, অতিকায় রায় আদৌ বোকা নয়। ও ইচ্ছে করেই এই বাঁদরামোগুলো করে।

পামরি আর বিশ্বজিৎদার স্ত্রীর উপরে মাংস রান্নার ভার পড়েছিল আর মিহিরদার স্ত্রীর উপরে পড়েছিল মাছ রান্নার ভার। সকলেই উমদা উমদা করে খেলেন। কালাকাঁদও আনানো হয়েছিল সিঙ্গরাউলি থেকে।

এসে পৌঁছনো হয়েছিল সাড়ে দশটা নাগাদ। আসার পরে পামরির রেঁধে আনা হাজারিবাগী আলুর তরকারি দিয়ে গরম গরম লুচি খাওয়া হয়েছিল। বোঁদে সহযোগে।

যখন পিকনিক শেষ করে ফেরার জন্যে বেরোল ওরা, তখন বিকেল প্রায় পাঁচটা বাজে।

আসতে বেশ খানিকটা সময় লাগবে।

আমলোরির কাছাকাছি পৌঁছে পামরি বলল, অতিদা আজ আমাদের বাড়ি চলুন। তুমিও চলো অনিদা। আজ শুক্লা ত্রয়োদশী। চমৎকার চাঁদের আলো থাকবে। আমাদের বারান্দাতে শিরিষ গাছের ফাঁক দিয়ে আলো এসে পড়ে। ঝিরঝির করে ছায়া কাঁপে আলোর মধ্যে। চমৎকার লাগে। জোর আড্ডা মারা যাবে। সকলের সঙ্গে আড্ডা মারা যায় না। আমি অন্তত পারি না। লাইব্রেরিতে আজ আমি কিংবা ঝিমলি কেউই যেতে পারব না, গদাধর মিশ্রকে চার্জ দিয়ে এসেছি। আজকে তিনিই সামলে

নেবেন। তবে ওঁকে পিকনিক-এর কথা কারোকেই বলতে মানা করেছি। মেম্বারেরা জানলে আমাদের মুণ্ডপাত করবেন।

আমি বললাম, তোমাদের বাড়িতেই যাবে যদি তাহলে ঝিমলিকেও ডেকে নাও ও গাড়ি থেকে।

পামরি বলল, ও তো সুরিবালি সিং সাহেবের গাড়িতে আসছে। সে গাড়ি তো এতক্ষণে নীগাহিঁর দিকে মোড় নিয়েছে। কখন ফিরবে তা ওই জানে।

সেই গুঁফো, পেট-মোটা মানুষটার সঙ্গে ওর কীসের এত লদকা-লদকি?

পামরি বলল, ওর বেণী আছে বলেই তো গোঁফের প্রতি অত আসক্তি। আপনি ওকে দেখলেই চটকা-চটকি করতে চান। তাই তো ও আপনাকে এড়িয়ে চলে।

—তাই? একা গেছে সুরিবালি সিং-এর সঙ্গে?

—একা নয়, একা নয়। সঙ্গে মিহিরদা আর ওঁর স্ত্রীও আছেন।

অতি বলল, তাও ভালো। তবে আবারও হয়তো রিকমচ খাওয়াবে। এত বাজে ধোকা জীবনে খাইনি। না হয়েছে সেদ্ধ, না কড়া করে ভেজেছে, নুন তেল পর্যন্ত ঠিক হয়নি। ওইরকম রাঁধুনি বউ-এর হাতের রান্না খেয়েই যদি ওই বপু হয় তাহলে পামরি, এমনকী আমার ছুটকুর রান্না খেলে তো সিং সাহেব ফেটে যেতেন।

ওরা সকলেই হেসে উঠল।

যখন আমরা আমলোরির কাছাকাছি এসেছি তখন বিশ্বজিৎদা বললেন, ভুলেই গেছিলাম আমার একবার বীণাতে জয়সোয়ালের বাড়ি যেতে হবে। ওর দাদা কাল বিকেলে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন। ব্যাচেলর ছিলেন, ওর সঙ্গেই থাকতেন। ভারি ভালোমানুষ ছিলেন। খবরটা শোনার পর থেকে একবারও যেতে পারিনি। খুবই অন্যায় হয়ে গেছে।

অতি বলল, ঠিকই তো। আমরাও তো যাওয়া উচিত। ভদ্রলোক আমাকেও খুবই পছন্দ করতেন।

—ব্যাচেলর মানুষেরা সচরাচর ভালই হন। আমি বললাম।

—আর তুই? তুইও তো ভালই!

অতি ফুট কাটল।

—তাহলে তোকে নামিয়েই দিয়ে যাই তোর কোয়ার্টারে। কী রে অনি?

—কোয়ার্টারে নামালে হবে না। আমার সাইকেলটা আছে পামরিদের বাড়িতে।

—তাহলে দুজনকেই, পামরি তোমাদের বাড়িতেই নামাই।

একটু পরেই বিশ্বজিৎ বাগচী পামরিদের বাড়ির সামনে আমাদের দুজনকেই নামিয়ে দিলেন।

আজকে পূর্ণিমা। ভাদ্রর পূর্ণিমা। কাল থেকেই বৃষ্টি একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। চাঁদ এখন স্বমহিমায়।

ওরা দু'জনে বীণাসাগরের পাশে একটি পাথরের উপরে পাশাপাশি বসে আছে। আমলোরি থেকে দুজনেই যে যার সাইকেলে এসেছিল। যদিও একসঙ্গেই।

পামরির সাইকেলের হ্যান্ডল-এর সঙ্গে যে বেতের ঝুড়িটা আছে তাতে ফ্লাস্কে করে কফি এবং ডিমের স্যান্ডউইচ বানিয়ে এনেছিল পামরি। একজোড়া পেয়ালা পিরিচ, দুটি ন্যাপকিন।

আসতে কষ্ট হয়নি কম। বেশ দূর তো! কিন্তু এখন বীণা সাগরের জলের পাশে বসে সব ক্লান্তি অপনোদিত হয়ে গিয়েছে।

এই আসাটা, সমস্ত পৃথিবীকে ত্যাগ করে, এসে দুজনের কিছু কথা বলাবলির প্রয়োজন ছিল। এই প্রয়োজনটা দুজনেই তীব্রভাবে অনুভব করেছে বেশ কিছুদিন হল। শহরে, সে কলকাতাই হোক, কী জয়ন্ত বা নীগার্হি কী আমলোরি, সব জায়গাতেই অগণ্য ইনকুইজিটিভ মানুষের ভিড়। অনেকের কাছেই শুনেছে যে পশ্চিমি দেশে এমনটি কদাপি হয় না। অন্যের ব্যাপারে মাথা গলানো ওদের সংস্কৃতিতে নেই। টিউব-স্টেশনে প্রেয়সীর মুখটিকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বারেবার চুম্বন করলেও কেউই কোনো ঔৎসুক্য দেখায় না। পাশ দিয়ে চলে যায়। কে কার বাড়িতে এল বা গেল, কার বাড়িতে কী রান্না হল, এ নিয়ে গবেষণা করে কারোরই নষ্ট করার মতো সময় নেই।

এ পথে গাড়িও খুব কমই যায়। দিনে হয়তো যায় কিছু কিন্তু রাত নামলে তার সংখ্যাও খুবই কমে যায়। আধঘণ্টা হলো ওরা এসেছে। মাত্র তিন-চারটি গাড়ি, দু'দিক মিলিয়ে গেছে এসেছে।

—আসা তো হলই, খাওয়া-টাওয়া তো হল এবার কিছু বলো। কী জন্যে আমাকে এখানে আসতে বলা।

অনি বলল।

—তোমার কী মনে হয়?

—মনের কথা মনেই থাক। তুমি মুখেই বলো না।

—আসলে তোমার কাছে আমার একটা ভিক্ষা চাইবার আছে।

পামরি বলল।

—ভিক্ষা?

—একটু চুপ করে থেকে অনি বলল, যদি না-মঞ্জুর করি।

—না-মঞ্জুর, করলে আর কী করব? বীণা সাগরের জলে ডুবে আত্মহত্যা করতে হবে। আমার বেচারি মাকে ভাসিয়ে দিয়ে। তারপর এখানে পেতনিদের সঙ্গে জলের তলাতে ডাংগুলি খেলব।

তারপর বলল, বীণা সাগরে এখানে যে অনেক পেতনি আছে তা বুঝি শোনোনি তুমি? রাতের বেলা এদিকে কোনো মানুষই আসে না। যদি এদিকে কেউ আসেও তবে গাড়ি করেই আসে এবং দ্রুতবেগে গাড়ি চালিয়ে চলেও যায়। ভুলেও এখানেও গাড়ি পার্ক করে দাঁড়ায় না। তাই তো নাকি কথা হচ্ছে যে, পুরো বুণা সাগর জুড়েই সম্ভবত অ্যামিউজমেন্ট পার্ক গড়ে তোলা হবে। নানারঙা আলো ঝলমল করবে পুরো এলাকা জুড়ে। ওয়াটার গেমস, ইত্যাদি ইত্যাদি।

—হতেই পারে। নর্দার্ন কোলফিল্ডস-এর পয়সা তো কম নেই।

—আসলে এখনকার মানুষ, শুধু এখানকার মানুষই নয়, সব জায়গার মানুষই, বড়ো হুল্লোড়ে হয়ে গিয়েছে। নির্জনতার মধ্যে যে শান্তি, যা মানুষকে মানুষ হয়ে উঠতে সাহায্য করে, সেই সব উপলব্ধি করার বোধই ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যদি অ্যামিউজমেন্ট পার্ক হয়, উঁচু গ্রামে ইংরেজি বা হিন্দি ছবির গান বাজে, ঝিং-চ্যাক সব হিন্দি ফিল্ম দেখানো হয়, তখন আমার বা তোমার মতো মানসিকতার মানুষ তো এখানে আর আসবে না।

—না। তা আসবে না।

—এখন ভিক্ষার কথাটা কী বলবে?

অনি একটু অসহিষ্ণু হয়েই বলল।

—মুখে কি বলতেই হবে? তুমি কি বোঝনি এতদিনেও?

পামরি একটু চুপ করে থেকে বলল, হাজারিবাগে আমাদের জরাজীর্ণ বাড়ির বাগানমুখো বারান্দাতে শীতের দুপুরে যখন আমরা সকলে মিলে আসন করে একসারিতে খেতে বসতাম, বড়ো বড়ো কাঁসার থালাতে যখন বিসপাতিয়া আর মা আমাদের গরম গরম মসুর ডালের খিচুড়ি, মুসুর ডালের বড়া, কড়াইশুঁটির চপ এবং কখনও কখনও বড়া মসজিদের কাছের হানিফ কসাইয়ের দোকান থেকে আনানো খাসির কষা মাংস পরিবেশন করতেন তখন কি তুমি বোঝোনি যে আমি তোমার কে?

অনি একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমি তো বুঝেই ছিলাম, তুমি বুঝেছিলে কি? বুঝেই যদি ছিলে, তবে আমার সঙ্গে সব যোগাযোগ ছিন্ন করলে কেন? তুমি তো আমাদের কলকাতার ঠিকানা জানতেই। ভবানীপুরের সেই ঠিকানার তো কোনো রদবদল হয়নি। তবুও কেন একটি পোস্টকার্ড ফেলে তোমার ঠিকানাটা আমাকে জানালে না? কতগুলো বছর! তোমার কি কোনো ধারণা আছে কী মনোকষ্ট তুমি আমাকে দিয়েছ? আমি যে আমার ভালোবাসার রদবদল করতে পারিনি আমার কৈশোর থেকে।

পামরি অভিমান ভরা গলাতে বলল, আমরা কি এই খাদানে স্বেচ্ছাতে এসেছি নাকি? কত ঘাটের জল খেয়ে শেষে এখানে এসেছি তা তুমি জানো? তা ছাড়া, আমাদের ঠিকানা দিইনি কারণ সে সব ঠিকানা দেওয়ার মতো ছিল না। তা ছাড়া, সেই সব দিনে তোমাকে ঠিকানা জানানোটা ভিক্ষা পাওয়ারই নামান্তর হত। তুমি আমার দিকটা বোঝার চেষ্টা করো।

তারপর বলল, তুমি ভালোবাসা বলতে কী বোঝো তা আমি জানি না অনিদা। কিন্তু আমার কাছে ভালোবাসার মতো মহান বোধ আর দুটি নেই। এই সম্পর্কে তোমার অধীত বিদ্যা অ্যাকাউন্ট্যান্সি এক ভ্রষ্ট বিজ্ঞান। এর মধ্যে দেনা-পাওনার, ট্রায়াল ব্যালান্স বা ব্যালান্স শিট এর কোনো ভূমিকা নেই। জানি না, বোঝাতে পারলাম কী না!

অনি চুপ করে থাকল।

তারপর বলল, পুরনো কথা থাক। আজকের কথা বলো। আজকে

তুমি কেন ডেকে নিয়ে এসেছ আমাকে? বলো, আজকে তুমি আমার কাছে কী ভিক্ষা চাও?

পামরি বলল, ভিক্ষা একটাই।

কী?

তুমি আমাকে কোনো ভিক্ষা দিও না।

তারপর বলল, আমি জানি যে রোগে দারিদ্রে আমার নিজের মাও চরিত্রভ্রষ্ট হয়েছেন। উনি হয়তো তোমার ভিক্ষাগ্রহণ করবার জন্যে আজ উন্মুখ কিন্তু আমি, অনিদা শুধু তুমিই কেন? পৃথিবীর কারও কাছ থেকেই কোনো ভিক্ষা নেব না। কোনোদিনও।

স্তব্ধ হয়ে বসে রইল অনি। অনেকক্ষণ।

তারপর বলল, একটা সত্যি কথা বলবে?

—বলো, কী কথা?

—তোমার শরীর কি কখনও আমার শরীরকে চায়নি?

—মিথ্যা বলব না। অবশ্যই চেয়েছে। শুধু আজই নয়, সেই হাজারিবাগের দিনগুলি থেকেই, যখন আমি ত্রয়োদশী।

তবে?

কিন্তু যা কিছুই দয়ার দান হিসাবে পাওয়া হয় সে তো ভিক্ষারই ধন। তার মধ্যে গরিমা কোথায়? আমি হতভাগ্য অনিদা, প্রতি মুহূর্তে শরীরে মনে তোমাকে চেয়েও তোমাকে পাওয়ার অধিকার আমি অর্জন করিনি।

তারপর বলল, এখানকার সি. এম ডি.-র সঙ্গে কথা বলেছি। এখানকার মেয়েদের জন্যে একটি ইনস্টিটিউট অফ টেইলরিং সেট-আপ করার কথা হচ্ছে। যদি সেটা মেটেরিয়ালাইজ করে তবে আমি তার প্রিন্সিপাল হব। তখন তোমাকে আমি আমার শরীর-মনে গ্রহণ করার জন্যে তৈরি থাকব।

তারপর বলল, অনেক নোংরামোর মধ্যে দিয়ে আমি এসেছি অনিদা কিন্তু কোনো নোংরামিকেই আমি আমার শরীর বা মনকে স্পর্শ করতে দিইনি। তোমারই জন্যে আমি আজও আমাকে অনাঘ্রাত এবং পবিত্র রেখেছি। আমি আজকালকার অধিকাংশ মেয়ের মতো শরীরসর্বস্বী নই। নই বলেই, এত বছর এত ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যে দিয়ে এসেও তোমার যোগ্য করে রেখেছি নিজেকে, পবিত্র করে।

আমি এখন কী করব? আমি তো তোমার মতো মহৎ নই। যাত্রার বিবেকের মতো শ্বেতশুভ্র সত্তাতে আমি আরও কতদিন অপেক্ষা করব তোমার জন্যে, বলো? আমার যৌবনও তো অনন্তকালের নয়, পামরি।

শোন, অনিদা, আমরা সাধারণ নই। আমাদের যৌবন অনন্তকালীন। অনেকদিন তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা করেছ আর সামান্য কটা দিন করতে পারবে না? প্লিজ করো। আমাদের মিলন যখন হবে তখন স্বর্গমর্ত্য পাতালের সব দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করবেন। তুমি দেখো।

বলেই, আমার মুখটিকে নিজের বুকের মধ্যে চেপে ধরল পামরি।

অস্ফুটে বলল, বাবা বলতেন, "শুভায়ু ভবঃ। শুভায়ু ভবঃ। শুভায়ু ভবঃ। বলতেন, আনন্দম্। আনন্দম্। আনন্দম্। আনন্দম্ খল্বিমানি।

অনির চোখের জলে পামরির সুগন্ধি স্তনসন্ধি ভিজে গেল।

এমন সময়ে, বীণা সরোবরে পাশ দিয়ে হেডলাইট জ্বলিয়ে চলে যেতে যেতে একটা গাড়ি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল।

অতি, বিশ্বজিৎদার গাড়ি থেকে নেমে পড়ে বলল, শাল্লা! বেণী ধরে টানলে আমার দোষ হয়, আর তুমি এখানে কী করছ এখন?

তারপর বলল, স্বর্গের প্রেমিক-প্রেমিকা সাইকেলে এসেছ, চাঁদের আলোতে ভেসে ভেসে সাইকেলেই ফিরে যাও। আমি চললাম। তোমাদের জন্যে শিবকালী ভটচাজ-এর ক্বাথ বানিয়ে রাখছি, দুজনকেই গেলাব।

পামরি বলল, ছিঃ ছিঃ।

অতি আমাকে বলল, অনেক ঊর্ধ্বলোকে বিচরণ হয়েছে দোস্ত এবার মাটিতে নেমে এসো।

বলেই, বিশ্বজিৎ বাগচীকে বলল, বিশ্বজিৎদা, বাড়িতে পাঁজি আছে? নিয়ারেস্ট বিয়ের তারিখটা আজই বাড়ি পৌঁছে জানাবেন আমাকে। রেবা মামিমা থাকতে থাকতে এদের মিলিয়ে দিতে না পারলে মহাপাতক হব।

তাঁর কৈশোর-যৌবনে শিকারি এবং এখনও অরণ্যচারী বুদ্ধদেব গুহ পূর্ব ভারতের এক ব্যস্ত ও সম্মানিত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসেবে গণ্য ছিলেন, বিশেষ করে প্রত্যক্ষ কর সংক্রান্ত বিষয়ে। সারা ভারতবর্ষ এবং পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই তাঁকে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। তবে এখন যতটা সময় 'জীবিকার' জন্য, তার চেয়ে বেশি জীবনের' কাজে ব্যয় করছেন।

তাঁর ছবির প্রথম অ্যালবাম প্রকাশিত হয়েছে চারবছর আগে। প্রথম অডিও ক্যাসেটও ওই সময়েই প্রকাশিত হয়। বাংলা পুরাতনী গান-এর, যদিও রবীন্দ্রসঙ্গীতই তাঁর 'প্রাণের গান'। তার পরে সি. ডি, প্রকাশিত হয় পুরাতনী গানের, হিন্দুস্থান রেকর্ডস থেকে।

উপন্যাস, ভ্রমণোপন্যাস, আত্মজীবনী, ছোটগল্প এবং তাঁর সুবিখ্যাত অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিগুলিতে (খজুদা' কাহিনি) তিনি সমান উজ্জ্বল এবং অননুকরণীয়।

জীবনের বিভিন্ন সময়ে বুদ্ধদেব কেন্দ্রীয় রাজস্ব বোর্ড (প্রত্যক্ষ কর) কর্তৃক সংগঠিত পশ্চিমবঙ্গ আয়কর দপ্তরের উপদেষ্টা পর্ষদের সদস্য, চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড-এর (পূর্বাঞ্চল শাখার) সদস্য এবং কলকাতার আকাশবাণীর অডিশন বোর্ড-এরও (রবীন্দ্রসংগীত) সদস্য ছিলেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'নন্দন'-এর উপদেষ্টা বোর্ডের এবং বন্যপ্রাণী উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য। বঙ্গভূমে একই মানুষের মধ্যে এমন পরস্পরবিরোধী সত্তার সংমিশ্রণ সম্ভবত আজ অবধি আর দেখা যায়নি। শুধুমাত্র সাহিত্য জগতেই নয়, বঙ্গসংস্কৃতির সামগ্রিক জগতেও সুরসিক, মজলিসী বুদ্ধদেব গুহ এমনই একটি নাম, যা আজ গভীর শ্রদ্ধা এবং বিস্ময়ের সঙ্গে উচ্চারিত হয়।

বুদ্ধদেব এর স্ত্রী সম্ভ্রান্ত রবীন্দ্রসংগীত গায়িকা শ্রীমতী ঋতু গুহ।

Price : ₹ 60.00
ISBN : 978-81-7267-106-8
9 788172 671068
www.nirmalsahityam.com